স্বনির্বাচিত গল্প

আবু রুশ্‌দ্‌

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৪৮৯

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হাশেম খান
মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

SWANIRBACHITA GALPA
[Stories Selected by the Author]
By Abu Rushd

Cover design : Hashem Khan
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca—I
Bangladesh.

উৎসর্গ

আমার বড় ভাই আবু জামাল আবু তৈয়বকে
এই বিশ্বাসে যে পুণ্যের মার নেই।

ভূমিকা

বিশেষ কিছু বলবার নেই। গত চল্লিশ বছর ধরে যে-সব গল্প লিখেছি তার থেকে বাছাই করে এই সংকলন। 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' থেকে কোন গল্প দি নি, কারণ গ্রন্থটি বাজারে এখনও চালু আছে। আমার প্রথম দুই গল্প-গ্রন্থ 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৮) ও 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮) থেকে যথাক্রমে পাঁচটি ও আটটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। বাকী নয়টি গল্প গত দশ বছরে নানা সাময়িক-পত্রিকায় বেরিয়েছে, তবে সংকলিত হল এই প্রথম।

এই চড়া দরের (এবং বইয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত) বাজারে বইটি বের করে মুক্তধারার নির্বাহী পরিচালক চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ পাঠক-সমাজ যদি একেবারে বাতিল না করে দেন তবে লেখক হিসেবে আমি নিজেকে খুশনসীব মনে করব।

৩১ ডি তোপখানা রোড আবু রুশদ্
ঢাকা—২

সূচীপত্র

মেঘাবৃত চাঁদ

মালেকা যতই খুশী হবার ভান করুক, এটা সে অনেকদিন থেকেই বুঝেছে যে সে অসুখী। অথচ অসুখী হওয়ার কোন কারণ নেই। রউফ খুব সুশ্রী না হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে মালেকার মনে কদাপি আফসোস্ জাগেনি। হতে পারে, রউফের বুদ্ধি খুব প্রখর নয়—সেটা কিছু না। আর তাদের আর্থিক অবস্থাও এখন এত খারাপ হয়ে পড়েনি যাতে সে সম্বন্ধে তাদের মন খুব শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে। না, সে-সব কিছু নয়। রউফ যথার্থই অত্যন্ত ভদ্র ছেলে ও তাদের আর্থিক অবস্থা রীতিমত সচ্ছল। তবুও ·

নারী-পুরুষের মনের কামনায় এমন এক সূক্ষ্ম রহস্য আছে যা গোপন ও অনির্দেশ্য। অর্থের অজস্র প্রাচুর্য, যশের অপরিমাণ পরি-বৃদ্ধি এবং রূপ-গৌরবের জাজ্জ্বল্যমান মহিমা কোনটাই সে শিথিল অথচ গূঢ় কামনাকে শৃঙ্খলিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে মালেকার পক্ষে কি কারণে যে এ-ভাবটা ক্রমেই কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে, কেন সে অসুখী, তা সে নিজেই জানে না। যেখানে অসুখী হবার সামান্য সুবিধা নেই, অসুখী হওয়া যেখানে অবান্তর, অশোভন ও পরিমাণহীনভাবে বিস্ময়কর, সে-ক্ষেত্রে অসুখী হওয়ারও কয়েকটা বিরক্তিকর দিক আছে। অস্বস্তির উদ্ধত পরিব্যাপ্তি যুবতী মালেকার কামনা-অন্ধ মনকে নিরন্তর বিব্রত ও বিমূঢ় করছে। এক এক সময়ে তার মনে জাগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-উর্মির উন্মাদ আলোড়ন, মন দুরন্ত তীব্রতায় ঝঞ্ঝাসভ কুটিলতায় হয়ে ওঠে অশাসনীয়, হৃদয়ারণ্যের প্রতি পুষ্প ও মুকুলে, আকাঙ্ক্ষা-রুদ্ধ প্রতি গোপন স্তরে অতৃপ্ত কামনার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ভীতিপ্রদ উত্তাল বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। চঞ্চলবিহারী পৃথিবী যৌবনের মাতাল গরিমায় শরাহত হয়ে যখন কুহক-মুগ্ধ আবেশে

শিথিলিত, যুবতী মালেকা তখন তার নিরুদ্ধ আবেগকে কি করে শান্ত রাখতে পারে? হে অনন্ত আকাশ! মদির আনন্দের মায়াস্পর্শে লীলারসোচ্ছল ধরণী মহিমময়ী, কিন্তু মালেকার মনে এ কি ব্যথার গুঞ্জরণ!

মফঃস্বল শহরের অনেক রকম অসুবিধার মধ্যে এটা অন্যতম প্রধান যে, এখানে বেড়াবার জায়গা কম। সময় সময় নির্জনতা রউফের মন্দ লাগে না, কিন্তু নীরবতা ও নির্জনতায় বিরামহীন ভাবে তার মন জর্জরিত। রউফ বার্নাড শ' বা সলোমন না হলেও সে এ-কথা চমৎ-কার বোঝে যে বিবাহে মালেকা সুখী নয়। কেন নয় তা রউফ-এর কাছে এক আশ্চর্য রহস্য। সুতরাং সে নির্জনতা না পেতে চাইলেও নির্জনতা তার সখ্য কামনা করে। স্তূপীকৃত নীরবতা রউফের সক্রিয় কর্মচঞ্চল মনকে ক্রমশ পঙ্গু করছে।

নদীর দিকে রউফ বেড়াচ্ছিল। আশ্বিনের মাঝামাঝি। সন্ধ্যা আসন্ন। বিবাহের পর থেকে একটা নিতান্ত অস্বস্তিকর ভাব রউফের মনকে অভিভূত করে আসছে। স্পষ্টত রউফ এ কথা নির্বিবাদে মানে যে মালেকাকে সে ভালবাসে। প্রতিদানে মালেকার সামান্য ভালবাসা পেলেও সে নিজকে ধন্য মানবে। বিবাহের প্রথম রাত থেকেই ধরা যাক্ না কেন। অবশ্য তাতে বোঝা যাবে না, মালেকা রউফের প্রতি এত নিদয় কেন। বিবাহের বিরুদ্ধে বিবিধ বিভ্রান্তকারী বাক্যের বাণ ছেড়ে আমরা আকাশে আগুন ধরাতে পারি, কিন্তু মনের নিভৃততম কামনায় এটা আমরা মানবই যে একেবারে বিয়ে না করার চেয়ে বিয়ে করে অসুখী হওয়াই বরং ভাল। অতএব বিবাহের যে একটা অনাস্বাদিত ও স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে তা সর্বথা স্বীকার্য। তাই রউফ যদি বিয়ের প্রথম রাতে নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে খানিকটা হৃদ্যতা করবার চেষ্টা করে থাকে, আমরা তাকে দোষতে পারি না। কিন্তু রউফের সে একান্ত স্বাভাবিক প্রয়াস করুণ অধ্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল মাত্র। যে কামনা স্বতস্ফূর্ত তা কৃত্রিমতার অনুশাসনে কক্ষভ্রষ্ট হতে পারে না। হৃদয়ের-উচ্ছল মাধুরী মালেকার শীতল কঠোরতায় প্রতিহত হয়ে রউফকে ব্যথিত করেছিল। মানব-মনের গতি বিচিত্র—বিচিত্রতর প্রেমের গতি। মালেকা যে খুশী হতে পারছে না সে-দোষ নিশ্চয়ই রউফের নয়। বরং বিপরীত। কিন্তু মালেকা নিজের যৌবনকে ব্যর্থ করছে কেন? রউফের প্রতি মালেকার এমন কি অপরিসীম করুণা থাকতে পারে যাতে সে

তার নিজের সুখকেও সমাধি দিতে কুণ্ঠিত নয়? রউফ একটা কসম খেয়ে বলতে পারে, মালেকা নিজের সুখের পথ বেছে নিলে সে দুঃখিত হলেও রুষ্ট হবে না। মালেকার সুখেই তার সুখ। এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে না যে একটা মেয়ে তোমাকে ভালবাসতে না পারলেও ভালবাসবে। এ-কথা বুঝবার মত বুদ্ধি রউফের আছে যে ডাকাতি করে কারও হৃদয় জয় করা যায় না। তবে এটা হাস্যকর যে মালেকা তাকে না ভালবাসলেও তার ঘর করবে, কোন কোন রাতে একই বিছানায় শুয়ে দাসীদের সাথে কথা বলে মাঝে মাঝে তাদের ধমকাবে প্রেমের বাহ্যিক একটা কৃত্রিম আবরণে নিজের মনের ক্ষুব্ধ কামনা সব রাখবে আবৃত। এমন দুঃসহ কষ্টদায়ক কৃত্রিমতার কুটিল তরঙ্গ যদি ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতায় নিত্যই তাদেরকে আঘাত করতে থাকে, তবে একদিন রউফ নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে।

সংশয়হীনভাবে এ-কথা বলা যেতে পারে, রউফ ও মালেকা কেউ এ-বিবাহে সুখী হতে পারছে না। দীর্ঘ তিন বৎসর পারস্পরিক প্রবঞ্চনার কুহেলিকায় কেটে গেছে। এখনও কাটছে এবং মনেতে দুঃখ হয়, হয়ত এমনি করেই তাদের জীবনের হবে যবনিকাপতন—ব্যর্থতার শুষ্কতায়, যৌবনের করুণ অপমৃত্যুতে, অতৃপ্তির সীমাহীন হাহাকারে।

অবশ্য এমন নয় যে নিত্যই তাদের ঝগড়া হচ্ছে। যেখানে প্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় নয় সেখানে বিবাদ হয় কুচিৎ। বা রউফ পৌরুষের বর্বর শাসনে মালেকাকে নিপীড়িত করেছে। মনে মনে মালেকা তার প্রতি রউফের বিস্ময়কর কোমলতার কথা উপলব্ধি করে অভিভূত, বিমূঢ় ও শঙ্কিত হয়। রউফের আশ্চর্য বিবেচনা-বোধ মালেকার মানসিক অশান্তিকে নানা-ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। তবুও বাইরে থেকে দেখলে এটা বোঝা যাবে না যে তারা অসুখী। সামাজিক প্রয়োজনের চাপে মাঝে মাঝে তাদের এমন জায়গায় এসে পড়তে হয়, যেখানে ভালবাসার অভিনয় করা অপরিহার্য এবং সংসারে থাকতে হলে আরও বিবিধ আনুষঙ্গিক অনুশাসন তো আছেই।

অত্যন্ত নবীন উকিল বলে রউফের ওপর কোন মামলা-মকদ্দমার ভার ছেড়ে দিতে অনেকেই ভরসা পায় না। যে দু'একটা পায় তা সময়ের অর্থহীন প্রাচুর্যকে পূরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে এমন কোন লোকের সাথে রউফের জানা শোনা নেই যাদের বন্ধু বলা যেতে পারে। আর আড্ডা দিতে ভালও লাগে না রউফের। কিন্তু

যে অখণ্ড অবসর এখনও রউফকে পীড়া দিচ্ছে তা রসে, লীলায় ও যৌবনোচ্ছল কামনায় ভরপুর হয়ে উঠতে পারত, যদি···তবে মানব-জীবনে 'যদি'র স্থান নেই। তাই রউফের ও-কথা নিয়ে আফসোস্ করা শোভা পায় না যে মালেকা তার প্রেয়সী নয়। তথাপি রউফ তার জীবনের এ বৃহৎ দুঃখ নিয়ে সব সময় দুঃখাভিভূত হয়ে থাক্‌তে পারে না। আচম্বিতে তার মন এক-এক সময় অযথা খুশী হয়ে ওঠে—মনের চাপা আনন্দ আকস্মিক আশ্রয় পেয়ে দিগ্বিদিকে সুতীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এমন হয়। অকারণ পুলকের গাঢ়চ্ছন্দে মন নাচতে থাকে। টুক্‌রো টুক্‌রো রঙ্ মনের সর্বত্র একটা মদির-মোহ জাগিয়ে তোলে। ইচ্ছে হয়, লুকিয়ে গান করবে। আর গোপনে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। পরিব্যাপ্তিহীন আনন্দের তরঙ্গ ঝলকে ঝলকে রূপান্তরিত হয়ে মনে জন্ম দেয় এক অর্ধ-করুণ বিভ্রম। এ-কারণেই সহস্র দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও মানব-জীবন এত অসম্ভবভাবে অপরূপ। রউফের মনের সে পরিমাণহীন সুখ উত্তাল হয়ে উঠলো সন্ধ্যার দিকে। কি এক উৎসব উপলক্ষে রউফের কোন এক আত্মীয় তাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। মালেকা সেজে গুজে এল। মালেকার সাজসজ্জার নিপুণ ভঙ্গিমা রউফকে বিস্মিত, অভিভূত, বিমুগ্ধ করে তুলল। পশ্চিমের আকাশে তখন রঙের আগুন লেগেছে। রঙের বিচিত্র সমারোহ ঘন-সন্নিবিষ্ট শ্যামল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-পল্লবে চিত্রিত হয়ে এক বিভ্রান্তকারী শোভার সৃষ্টি করেছে। বিলীয়মান সূর্যরশ্মির সুরঞ্জিত তির্যক গতি মালেকার শাড়ীতে চোখে ঠোঁটে গালে ও কেশের মধুর হিল্লোলে প্রতিফলিত হয়ে রউফের মনকে অদম্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত করছে। মালেকার কি পরিমাণ-জ্ঞান নেই ? এ কি কৌতুক ? রউফ আজকে সুখী—পরিপূর্ণ নিবিড় একান্তভাবে সুখী।

করুণাময়ীর মত মিষ্টি হেসে মালেকা বলল: —অমন করে তাকিয়ে আছ যে! যাবে না?

—নিশ্চয়ই! মিনিট দশেক দাঁড়াও, এ—বান্দা এখনই এসে হাজির হবে। বলে রউফ বিসদৃশ এক দ্রুত ভঙ্গিতে চলে গেল।

ঘোড়ার গাড়ীতে। যে-গতিতে গাড়ীটা চলছে তাতে মনে হয় না, ঘণ্টাখানেক আগে নির্দিষ্ট জায়গায় তারা পৌঁছতে পারবে। নীরবতা। জানালা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে মালেকা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য। আড় চোখে মালেকার দিকে চেয়ে রউফ দেখল,

সমস্ত বিশ্বের নির্লিপ্ততা যেন তার মুখে। কিন্তু রউফ পুরুষ, সেও কঠিন হতে জানে। বাইরের দিকে চেয়ে মালেকা বুঝি কিছু একটা সঙ্কল্প ঠিক করছিলো।

হঠাৎ নিষ্কম্প চোখ রউফের দিকে চেয়ে মালেকা বল্লে ঃ তুমি আমার থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাক কেন? কে তোমায় বলেছে যে তোমায় আমি ভালবাসি না বা তোমায় কোনও ভালবাসতে পারব না?

চারদিকে যে মধুর পারিপার্শ্বিকতা মোহিনী মায়ায় কোমল ও মৃদু হয়ে আছে, তার মাঝে, [illegible], সুন্দরী মালেকার এই মায়া-স্মিত অভিযোগের কেমন বিচিত্র ব্যঞ্জনা। রউফ খানিকক্ষণের মত হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু মালেকার স্বরে এমন এক শীতল অনসিক্ত, এমন এক অথর্ব ঢং আছে যে রউফ সহসা হেসে ওঠে। — তাই তো, কে বলেছে আমাকে যে তুমি আমায় ভালবাসো না! তাই তো! রউফের মুখ কৃত্রিম বিস্ময়ে [illegible]। রউফের গুণ অনেক, তবে অভিনয়ে সে পটু নয়। কিন্তু তাকে নিয়ে মালেকা ছিনিমিনি খেলবে — গ্র্যানসাড! মালেকা হাজার হলেও স্ত্রীলোক। [illegible] ভালবাসার যথার্থ অধিকার মালেকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাই বলে সে রউফকে এমন করে অমান্য করতে পারে না। মালেকা ভুলে গিয়ে ভাল করেনি যে তার সমস্ত সুখ ও সম্মান রউফের করুণার উপর নির্ভর করছে। ইচ্ছে করলেই রউফ তার জীবনকে ক্রুর শাসনে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। তার মান, সুখ সমৃদ্ধি সব কিছু সে নিজের হাতের ঘাতে করে দিতে পারে বিধ্বস্ত। সে পারে।

ফেরবার পালায়। এত রাতে মফঃস্বল শহরে গাড়ী পাওয়া যায় না। তাদের বাসা অবশ্য মাইল খানেকের বেশী হবে না। সুতরাং হেঁটে ফিরে আসতে এমন কিছু অসুবিধার কথা নয়। হেঁটে হেঁটে তারা এগিয়ে চলেছে। আকাশে চাঁদ নেই। চারদিকে নিবিড় আঁধার। সুউচ্চ বৃক্ষের শাখায় শাখায় দু'পাশে, গভীর খাদে নিস্তব্ধ নিশীথের নিরন্ধ্র আঁধারের [illegible]। টর্চের আলো ফেলে পথ চিনে নিতে হয়, মনে হয় কোন বিপন্ন ধূমগ্রহ আকাশ থেকে বিপুল বেগে খসে পড়ে তার বিরাট আঁধারের নিদারুণ চাপে ধরিত্রীকে এসে শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছে। পাঁচগজ দূরের জিনিস দেখা যায় না। সর্বত্র দিকচিহ্ন-হীন তমিস্রার অন্তহীন পরিব্যাপ্তি। আঁধারে ভয় পেয়েই হয়ত মালেকা রউফের একান্ত সন্নিকটে সরে এল। এত কাছে যে সচকিতা মালেকার

ভীরু মৃদুশ্বাস রউফের মনে এক উষ্ণ শিহরণ জাগিয়ে তোলে। কি পরিপূর্ণ নির্ভরতা মালেকার এ করুণ অসহায়তার মধ্যে ফুটে উঠেছে! চারদিক স্থির নিষ্কম্প। কেউ কোথাও নেই। খালি রউফ আর মালেকা। চন্দ্রহীন রাত্রির নিরন্ধ্র তমিস্রা যৌবনচঞ্চলা ধরিত্রীকে সমাধি-ভূমির বীভৎস গোপনতায় সমাহিত করছে। আর সে-ধরিত্রীর কর্কশ বুকে বিচরণ করছে মাত্র দু'টা মানুষ—রউফ আর মালেকা। খালি মালেকা—যে মালেকা রউফকে ভালবাসে না। হঠাৎ রউফের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। আচ্ছা, এখন যদি সে মালেকাকে বুকে পিষে ধরে' অজস্র চুম্বনের বন্যায় তার ঠোঁট পুড়িয়ে দেয়, নির্দয় দস্যুর মত মালেকার শরীরের সমস্ত সৌরভ কলঙ্কিত করে দেয়—পারবে মালেকা তার সে বর্বর শক্তি প্রতিরোধ করতে? পারবে? মালেকার দেহ নিয়ে রউফ এখন ছিনিমিনি খেলতে পারে। পারে। পারে তো? অলবৎ পারে। কিন্তু মালেকা এ-কথা কি বোঝে? উত্তেজনার চাঞ্চল্যে রউফ লক্ষ্য করবার সময় পায়নি, স্টেশনটা কাছে এসে পড়েছে। বাসা আর তিন মিনিটের রাস্তা। মালেকা রউফের তার অত কাছে ঘেঁষে নেই। সিগন্যালের লাল সবুজ হলদে রঙের তীক্ষ্ণ প্রখরতা চারদিকের গাঢ় আঁধারকে রহস্যাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

বছর দেড়েক এমনি করেই কাটল। এ-সময়ের ব্যবধানে সহস্র-ভাবে মালেকা রউফকে ভালবাসবার চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি। ফলে মালেকা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে রউফও। যৌবনের অপরিমিত ক্ষুধা গোপনে গোপনে বহির্মুখী হয়ে উঠেছে। এমন অপরিবর্তিত কৃত্রিমতায় যদি অবস্থার স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, তবে তা নিশ্চিতভাবে কেলেঙ্কারীর স্তরে পর্যবসিত হবে। হতে বাধ্য।

সেদিন হাসি হাসি মুখে মালেকার কাছে এসে রউফ বলল:-একটা সুখবর আছে, আন্দাজ করতে পার?

—আমি গণক নই! মালেকার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—অবশ্য এ-খবরে তোমার সুখী হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আমার মন 'নাচিছে আজিকে ময়ূরের মত নাচিছে।'

—বলেই ফেল খবরটা। দেখি এ-সুখবর শুনে আমার মনও ময়ূরের মত নেচে ওঠে কিনা।

ব্যাপারটা হল এই: আমার এক বাল্যবন্ধু—না হল না, আমার

এক অভিন্নহৃদয় শ্রেষ্ঠবন্ধু দীর্ঘ বার বৎসর পরে এ অভাগার গৃহে খুব শীঘ্র শুভাগমন করছে। ছেলেটা অদ্ভুত, এখনও বিয়ে করেনি। আসামে ইঞ্জীনিয়ার—রউফের স্বর ক্রমেই ভাবোদ্দীপক হয়ে উঠছে—আচ্ছা, এটা ভাবতে তোমার মজা লাগছে না যে যার সাথে এককালে আমার সবচেয়ে বেশী ভাব ছিল তাকে এ বারো বৎসর না দেখেও আমার দিন সুখেই কাটছিল—অথচ এখন সে আসবে বলে আমার মনে খুশী উপ্‌চে পড়ছে। সত্যি সত্যি আজকাল সকলের সাইকলজি পড়া উচিত।

কিন্তু রউফ উৎসাহের প্রাবল্যে যদি অনর্গল কথা না বলে যেত, তা'হলে সে দেখতে পেত, মালেকার মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে ওঠে রাগরক্তিম প্রখরতায় ঝল্‌সাচ্ছে। এবং তা'হলে নিশ্চয়ই সে অবাক্ হবার সময় পেত।

রউফ বলে যেতে লাগল :—ছেলের নাম মফিজুল। কম বজ্জাত ছিল ছোটবেলায়! লালমনিরহাটে থাকতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে কি বিপদেই না ফেলেছিল।

কথা বলার মাঝখানে যদি রউফ একবার মালেকার দিকে চেয়ে দেখত, সে আবার দেখতে পেত, মালেকার মুখ পাষাণের মত স্থির অস্বাভাবিক।

মালেকার ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসি শাণিত তীক্ষ্ণতায় ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে। স্বামীর বন্ধু অনেক দিন পরে কি এক কাজে এখানে আস্‌ছে, তাতে মালেকার খুশী হবার বাস্তবিকই কি থাক্‌তে পারে? মফিজুল হল রউফের অভিন্নহৃদয় শ্রেষ্ঠবন্ধু। নয় মালেকার।

মনোবিচ্ছেদের এ-কাহিনী যে সর্পিল গতিতে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে, তাতে একটা জিনিস সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় আমরা পাইনি। মালেকার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মূলভিত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে মালেকার কোন স্পষ্ট ধারণা না থাক্‌লেও আমরা অন্তত আংশিক-ভাবে তা অনুমান করতে পারি। সংক্ষিপ্ত কথায় : কিশোর বয়সে মালেকা একবার প্রেমে পড়েছিল। তার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের আগ্রহের বিষয় নয়। তবু মালেকার মনের অশান্তির সঙ্গে এ অতীত-প্রেম এক সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত, এমন এক সংশয় আমাদের মনে ছায়া-পাত করা অন্যায় হবে না।

যে-বয়সে সবেমাত্র পৃথিবী অজস্র ইঙ্গিতে ধ্বনিত হয়, রূপরস-গন্ধের নিটোল সমারোহ ধরিত্রীকে মর্মরিত করে, ছায়াস্বপ্নে মানুষের

মন মদির আকুলতায় হয়ে ওঠে আবেশমুগ্ধ, ধরণী যখন সঙ্কেতময় সঙ্গীতময় অপরূপ, মালেকা তার কিশোর হৃদয়ের সমস্ত সুধা উজাড় করে একজনকে ভালবেসেছিলো তখন।

—আমাদের মফিজুলকে।

তবে মালেকাকে যদি প্রশ্ন করা হয়ঃ মফিজুলকে তুমি এখনও ভাল-বাস কিনা, ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনাই তোমার অসুখী হওয়ার কারণ কি? মালেকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেঃ না। সে যে সুখী হতে পারছে না তার কারণ নয় সে অতীত-প্রেম। অন্তত মালেকা তা কিছুতেই মানবে না। মফিজুল সম্বন্ধে তার সমস্ত দুর্বলতা এখন মৃত, নির্জীব।

সুতরাং এ-কাহিনী যে বিরক্তিকর মনোবিচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটা ভীতিপ্রদ রূপ নেবার অপেক্ষায় ছিল তা আকস্মিক পরিবর্তনের আঘাতে একটা স্বতন্ত্র গতি বেছে নিচ্ছে। মালেকার জীবনে এসেছে বসন্ত—এসেছে আকাশকে রক্তিম দ্যুতিতে রঞ্জিত করে, বাতাসকে নিগূঢ় মাধুর্যে উজ্জীবিত করে, হৃদয়ের নবোদ্গত মুকুলকে পুষ্পসৌরভে আকুল করে। হোক সে ক্ষণিক। সমুদ্রের বুকে সাইক্লোনের ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি ক্ষণিক হলেও বিপজ্জনক।

অবশেষে মফিজুলের আসার দিন আসন্ন হয়ে এল। দিন সাত পরেই সে আসবে আশা করা যায়। বাসার বাগানে বেড়াতে বেড়াতে রউফ মালেকাকে প্রশ্ন করলঃ—যাঃ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে একেবারে ভুল হয়ে গেছে। মফিজুল এখানে আসবে বলে তোমার তো কোন অসুবিধা হবে না?

—অর্থাৎ? মালেকার ভ্রূ দুটো প্রশ্নের শরনিক্ষেপ করল।

—মানে, একটা অপরিচিত লোক এখানে থাকবে, এতে তুমি খানিকটা অস্বচ্ছন্দ্য বোধ করলেও তো করতে পার।

—কোন ভদ্রলোকের বাসায় একজন ভদ্রলোক এলে কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্কোচ হওয়ার কথা নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কথ্য-ভাষার ওপর মালেকার দখল যথার্থই লক্ষ্যযোগ্য।

—আই বেগ ইওর পার্ডন! রউফ যেন লজ্জিত।

শীতকালের দ্বিপ্রহরে। শীতল বাতাসের শন শন ধ্বনি নারকেল গাছের পাতাগুলোতে দোল দিচ্ছে। বহু উর্ধ্বে দিগন্তব্যাপী আকাশে পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। মুক্ত বন্য অপ্রতিহত তাদের গতি। মফিজুলকে

আন্‌তে রউফ স্টেশনে গেছে। ঘরে মালেকা একা। জান্‌লা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। শ্রান্তির আবেশে মালেকার শরীর শিথিলিত। মন তার ফাঁকা।

সহসা মৃদু শীতল বাতাস চাপা সংকেতের শিহরণে মালেকার শরীর বিদীর্ণ করে তার হৃদয়ের সমস্ত ভীরু রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে। মর্ম-নিহিত আনন্দের কুণ্ঠিত স্পন্দনে তার প্রাণ কাঁপ্‌ছে ভীরু পায়রার মত। কাঁপ্‌ছে কাঁপ্‌ছে। মৃদু সঙ্গীতময়। অনেক দূরে ঝাপসা রেখার ছায়া বরণে যেন দেখা যায়, কোন নারীর চুম্বন-শিথিল ওষ্ঠ কাঁপ্‌ছে, প্রিয়তমের দিকে চেয়ে প্রণয়িনীর মায়াকাজল চোখে যেন লেগেছে পুলকের প্রলেপ। সূক্ষ্ম গোপন অব্যক্ত আনন্দের গতিচ্ছন্দ। এবং মালেকা তার কম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মফিজুলের মুখ!

আমরা জানি না, মালেকাকে দেখে মাফিজুলের মন কেমন করেছিলো—সে বিবরণ আমাদের কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত। তবে মফিজুল সম্বন্ধে আমরা এতটা ধারণা করতে পারি। মফিজুল সে শ্রেণীর লোক, যাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। প্রেমের মধ্যে যারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে, অথচ প্রেম-পথ যদি বাধাসঙ্কুল হয়, তারা বুঝতে পারে না। তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। যদিও মালেকাকে রউফের স্ত্রী হিসাবে দেখবার প্রত্যাশা মাফিজুল [illegible] করেনি, তথাপি এ-আবিষ্কার তার পক্ষে এমন-কিছু নয় যাতে একটা রোমান্টিক সম্ভাবনা কাউকে মাতিয়ে তুল্‌তে পারে।

চায়ের জলসায়।

মাফিজুল বলল ঃ—[illegible] এখানে এসে মনে আনন্দ অনুভব করতেও ভয় হয়। এ-প্রাচীনতা সত্যিই চমৎকার।

রউফ আচমকা প্রশ্ন করলে ঃ—তোমার বয়স কম-সে-কম ত্রিশের কোঠায়। অতএব এখনও তোমার বিয়ে না করাটা আশ্চর্য ব্যাপার।

চোখ নীচু করে শান্তস্বরে মফিজুল বলে ঃ বিয়ে করার আকর্ষণ এখনও টের পাচ্ছিনে। যখন দেখবো, বিয়ে করাটা আমার পক্ষে খুব দরকারী হয়ে উঠেছে, তৎক্ষণাৎ বিয়ে করে ফেলব।

মালেকার মাথায় বিদ্ঘুটে খেয়াল আসে। দুঃসাহসী কণ্ঠে বলল ঃ—যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি।

—বলুন! মফিজুলের স্বর অবিচলিত।

—কখনও কোন মেয়েকে আপনি ভালবেসেছিলেন?

এ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে খানিকক্ষণের মত মফিজুল স্তব্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে সামলিয়ে নিয়ে বলল ঃ—ব্যবহারিক দিকটা আমার মধ্যে এত নিবিড় যে আমার পক্ষে প্রেমে পড়া কন্‌স্টিটিউশানালী অসম্ভব।

—ওঃ! মালেকা যেন ক্ষুব্ধ হয়েছে।

শহরের যে দিকটায় নদী, ওখানে যারা থাকে না, তারা কয়েক দিন সেদিকে বেড়িয়ে আনন্দ পেতে পারে। সেদিকেই রউফ, মফিজুল আর মালেকা যাচ্ছিল। আজকের সন্ধ্যা মিষ্টি। শীতের হাওয়া তীক্ষ্ণ হয়নি। রঙের প্রদীপ্ত বৈচিত্র্যে আকাশ রক্তিম, মনোহর। কোথায়ও রেডিওতে গান হচ্ছে। শীতের মৃদু বাতাসে সে মাধুর্যের প্রলেপ। নানারকমের পাখীর বিচিত্র ধ্বনি চিত্তহারী। শীতকালে এমন স্বচ্ছ মধুর সন্ধ্যা সচরাচর দেখা যায় না।

—মফঃস্বল শহরে এসে খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া আর ফ্রী এয়ার নেওয়া মনের পক্ষে বাস্তবিকই স্টিমুলেটিং! নীরবতা ভেঙে মফিজুল বলে উঠল।

—মাস দুয়েক থেকে যাও, দেখবে এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য তোমার মন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। রউফের ঠাট্টা করবার একটা সরল ভঙ্গী আছে।

—আপনার মত কি? মালেকার দিকে আড়চোখে চেয়ে মফিজুল জিজ্ঞেস করে।

মালেকা মৃদু হেসে জবাব দিল ঃ—এ মফস্বল শহরে একটানা আমি আট বৎসর ধরে আছি। তাই আপনার কথার ঠিক জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ছোট বেলায় "স্বাস্থ্যশিক্ষা"য় যা পড়েছি, সে-বিচারে আপনার কথাটা নিখুঁতভাবে সত্যি।

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মফিজুল বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করল।

এবার নির্দয়ভাবে মালেকা খোঁচা দেয়ঃ কয়েকটা এমন এলেমেন্ট্রি কথা আছে যা বোঝাতে গেলেই বরং গোলোযোগ হয়ে পড়ে।

প্রত্যাগমন। ইতিমধ্যে কখন পৃথিবীর বুকে গাঢ় হয়ে আঁধার নেমে এসেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ধ্বনি। চলতে চলতে এমন জায়গা এল যেখানে দুপাশে ঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা খুব সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে। যেতে যেতে মালেকা তার আনত চোখ তুলে মফিজুলের দিকে সহসা চায়। তার মনে হল, কোন এক নিপুণ শিল্পী একটা কঠিন শীতল ভাব মফিজুলের মুখে খুদে খুদে বসিয়ে দিয়েছে। আর কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণ! হয়ত মালেকা ঠিক দেখেনি। অথবা আঁধার সেখানে নিঃসীম বলেই হয়ত মালেকার এ সাময়িক বিভ্রম। কে জানে! তার পর খানিকদূর গিয়ে বিস্মিত মালেকা বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওপরে চেয়ে দেখে শীতের ধূসর সবুজ আকাশে সোনালী চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো মেঘ চাঁদকে ছেয়ে ফেলল। পাণ্ডুর চাঁদ। নিষ্কম্প। মলিন। বেদনার বিসর্পিত নীল। কঠিন ব্যথার দুঃসহ আঘাতেই হয়ত এ পাণ্ডুর; কিন্তু মালেকা জানে, চাঁদের এ মলিন আবিলতা ক্ষণস্থায়ী, কিছুক্ষণ পরেই চাঁদের শুভ্র সোনালী দ্যুতি এই ক্ষণিক মলিনতা দূর করে ধরণীর সব-কিছুকে আনন্দোজ্জ্বল মাধুর্যে ঝলমলে করে তুলবে। কি আশ্চর্য! মালেকা কিন্তু জানে না, সে মফিজুলকে ভালবাসে কি না। প্রেম? প্রেম। কি ও? ভালবাসা, মফিজুল; রউফ। ফুস।

কালকে ভোরে মফিজুল আসামে ফিরে যাবে। যে নিরতিশয় মধুর উচ্ছ্বাস মালেকার হৃদয়কে এ কয়দিন উদ্বেলিত করে আসছে, কালকে তার অপমৃত্যু। মালেকার জীবনে যে ক্ষণবসন্ত সুপ্রচুর আনন্দ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, আর ঘণ্টা কয়েক বাদে তার আকস্মিক পরিসমাপ্তি। তার হৃদয়ে যে অঙ্কুর এতদিন মুকুলে রূপান্তরিত হয়ে পুষ্পপল্লবের অপেক্ষায় ছিল, ঘনঝন্‌ঝা তাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

মাঝরাতে মালেকার ঘুম ভেঙে যায়। পাশে চেয়ে দেখে, রউফ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মালেকার মন ধীরে ধীরে বিপজ্জনকভাবে উন্মাদ হয়ে উঠছে। মালেকা এ-কথাটা এখন অভ্রান্তভাবে বুঝেছেঃ মফিজুল

তার মন, হৃদয়, সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করছে। বিবাহ-অবধি যে-সুখের সামান্য ছোঁয়াচ তার মনে লাগেনি, এ কয়দিন এসে মফিজুল সে তুলনারহিত সুখের প্রখর প্রবাহে তার মনকে উদ্দাম করে তুলেছে। মালেকা এটা নিশ্চিতভাবে জানে যে মফিজুলও তাকে ভালবাসে। চিরকালের ভীরু মফিজুল এখনও তাকে আগেকার মতই নিবিড়ভাবে কামনা করে। সন্দেহ নাই, পরস্পরের প্রতি তাদের প্রেম এখনও অম্লান। তবু এ কি অদ্ভুত, তারা মিলিত হতে পারছে না! তাদের মাঝখানে একি দুস্তর বাধা? মালেকা স্পষ্ট অনুভব করছে: দুর্বল-হৃদয়, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সদা-সঙ্কুচিত মফিজুল তাকে না পাওয়ার সান্ত্বনাহীন দুঃখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হচ্ছে। কাঁদছে খোকার মত, শিশুর মত। অবোধ বোকা শিশু মফিজুল!

বিদ্রোহের নিরুদ্ধ কামনা মালেকার মনকে আবেগের কঠিন প্রতিঘাতে দুর্দমনীয় করে তুলছে। হঠাৎ মালেকার দুর্বার ইচ্ছা হয় বারান্দায় টহল দিতে। ইংরেজী নভেলের বইয়ে সে পড়েছে, এমন অবস্থায় এমন সময় বারান্দা-পরিভ্রমণ করলে আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের দেখা পাওয়া যায়। পালিয়ে যাবে তারা এখান থেকে অনেক দূরে, কোন্ অদৃশ্য ছায়ালোকে—যেখানে বনকুঞ্জ পাখী ফুল নদী আর তারা দু'জন! কিন্তু অপরিসীম আলস্যে মালেকার শরীর ও মন দুই ভেঙে পড়েছে। মালেকার সামর্থ্য নেই সাড়া দেবার। মালেকা প্রাণহীন [illegible]।

এত গভীর রাতেও আকাশ আশ্চর্যভাবে নীল। আকাশ থেকে নীল ধারে গলে পড়ছে যেন। আকাশস্থিত অজস্র তারা দিগ্বিদিকে একটা বিভ্রমকারী শোভার সৃষ্টি করেছে। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যেন অগণিত সাদা ফুল! মালেকা অবাক্ হয়। নিজের নিরুপম সৌন্দর্যে আকাশকে নিতান্তই সীমায়িত করবার এ কি লজ্জাকর নিবিষ্টতা! কেউ বোঝে না, কি এ শোভার অর্থ!

মফিজুলকে বিদায় দিতে রউফ স্টেশনে গেছে। ইচ্ছে করেই মালেকা যায়নি। বিদায় দিতে গিয়ে কেঁদে লাভ আছে? এত ভোর যে আকাশ এখনও ঠিক করে রাঙেনি। দূরবর্তী বৃক্ষরাজির নিবিড় শ্যামলতায় ঈষৎ রক্তাভ আভা লেগেছে মাত্র। স্টেশনটা খুব কাছে। ট্রেন আসার ঘণ্টা পড়ল। ক্রমে পূর্বদিক লাল টকটকে হয়ে সূর্য উঠছে। ট্রেনটা এসে পড়ল। তখন বহুদূরের গাছের সারি দেখা

যাচ্ছে—স্বচ্ছ আকাশ ধীরে ধীরে প্রভাতের প্রথম বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত হচ্ছে। সহসা-উদিত সূর্যের দিকে চেয়ে মালেকার চোখ জলে ভরে ওঠে। ...

তোমার রংগরক্তিম বদনের দিকে চেয়ে যদি কোন কলঙ্কিনী বধুর আনত চোখপল্লব ভাবাবেশে মিছিমিছি কেঁপে ওঠে বা তার নিষ্ঠুর প্রেমিকের কথা মনে করে কোন হতভাগিনীর বুক কেঁপে ওঠে এমনিই, তা'হলে হে মোহিনী ঊষা, তাদের চোখে বুকে তোমার মায়া-স্নিগ্ধ মমতা বুলিয়ে দিও!

তৃতীয় ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করল। গতি ক্রমেই বাড়ছে। আচ্ছা এটা কি অদ্ভুত নয়, যখন পৃথিবীময় নূতন আশার স্পন্দন, তখন তার চোখে জল কেন? মালেকা কি জানে! অনেক দূরে চলে-যাওয়া ট্রেনের ক্ষীণ শব্দ যখন একেবারে মিলিয়ে গেল, পাখীর কলরবে তখন চরাচর মুখরিত হয়ে উঠেছে।

হতভাগ্য

গ্রাম্য বালক ফজলু—অশিক্ষিত; অল্পবয়সী। মা-বাপ তাহার কবে মারা গিয়াছিল তাহা সে বলিতে পারিবে না—যদিও বড়বোন মনজানের মৃত্যুস্মৃতি তাহার মনে আবছাভাবে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। পৃথিবীতে কাহারও মা-বাপ বোন বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে তাহা ফজলুর নিকট একটি মহাবিস্ময়ের বিষয়। মাত্র একজন দূর-সম্পর্কীয় মামু তাহার এখনও বাঁচিয়া আছে। মামুকে ফজলুর কিন্তু একেবারে ভাল লাগে না মেজাজ তাহার অত্যন্ত খিট্‌খিটে, ভারিক্কী। সেই মামু একদিন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল, চাকরিও একটি জুটাইয়া দিল। শহরে ফজলু এই প্রথম আসিয়াছে। কলিকাতা তাহার সংখ্যাতীত আকর্ষণের লৌহ-বন্ধনে গ্রাম্য বালকের অবোধ চিত্তকে করিল বন্দী, লুব্ধ করিল। ফজলু তাহার কাজ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে করিতে লাগিল—যাহাতে এ বিশাল শহরের একাংশে তাহার আশ্রয় স্থায়ী হয়। হোক না তাহার একটু কষ্ট, খানিকটা বাধা সে সহ্য করিলই বা, কলিকাতায় তো সে থাকিতে পারিবে - এই পরী-কাহিনীর শহরে, যেখানে গ্রাম্য বালকের জন্য অলিতে-গলিতে সঞ্চিত রহিয়াছে রূপকথার বিস্ময়।

ফজলু মিঞার বয়স হইয়াছে এখন বারো। কলিকাতায় সে তিন বৎসর ধরিয়া কাজ করিতেছে। এই তিন বৎসরে দুনিয়ার কত দিক কত রকমে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহারই পরিমাণ করিয়া অশিক্ষিত বালক ফজলুর জীবনেও আসিয়াছে নূতনত্ব। বদলাইয়াছে তাহার মনের সুর, মনের কোনো কোনো জায়গায় লাগিয়াছে রঙের ছোপ। তবে ইতিমধ্যে ফজলু অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়াছে। তাহার মামু মনুমিঞাকে সে সর্বদাই বিষ-দৃষ্টিতে দেখিত। বর্তমানে তাহার সম্বন্ধে ফজলুর রোষ আরও

গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। চাকরি করিয়া ফজলু মাসে চারিটাকা করিয়া মাহিনা পাইত। কিন্তু মন্নু মিঞা ফজলুর সমস্ত মাহিনা দখল করিয়া বসিত—একটি পয়সাও তাহাকে দিত না। ব্যাপারটা ফজলুর নিকট এত অন্যায় বলিয়া মনে হয় যে তাহার ক্ষুদ্র দেহেও এক এক সময় রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠে। যদি তাহার শক্তি থাকিত তাহা হইলে তাহার মন্নুমামুকে একবার দেখিয়া লইত সে! অচ্ছে করিয়া পিটাইয়া সমঝাইয়া দিত যে জোর যার মুলুক তার নহে। কিন্তু ফজলুর রাগ মনের মধ্যেই গুমরাইতে থাকে, তাহার কিছুই করিবার নাই। মন্নু মিঞার দৌরাত্ম্য তাহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। মনের দুঃখে ফজলু কোন কোন লোকের নিকট গান গাহিয়া বেড়ায়; খুশী হইয়া অনেকেই দুই এক পয়সা তাহাকে দেয়। তাহার গলা বেশ ভাল। আর নাচিবার কায়দাও ফজলুর চমৎকার আয়ত্তে ছিল—নটরাজরূপে নাচিত, রাধানৃত্য করিত, দশ বৎসরের ছেলে বিনাইয়া বিনাইয়া গান গাহিয়া লীলা-রসকে নাচের ছন্দে অভিব্যক্ত করিত। এই উপায়ে মন্নুর অজ্ঞাতে ফজলু বেশ কয়েক পয়সা জমা করিতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া ফজলুর 'টকী'র প্রতি মোহ জন্মিয়া ছিল। অর্থোপার্জনের এই নূতন পন্থা তাহাকে 'টকী' দেখিবার পথ বাৎলাইয়া দিল। টকীতে কেমন মানুষে কথা কয়, একজন মানুষ কি আশ্চর্য শক্তিতে সহস্র সহস্র লোককে নিহত করিতে থাকে, তেতলার ছাদ হইতে পিঠ ঘুরাইয়া লাফ মারিয়া কি সুন্দর ভঙ্গীতে নায়ক ঠিক ঘোড়ার পিঠের উপর পড়ে এই সব 'অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার ফজলুর নিকট দুর্বোধ্য হইলেও তাহার খুব ভাল লাগিতে লাগিল। সেও বাহা-বা করিয়া তালি দেয়, সমঝদারের মত শির নাড়ে। নায়ক যখন নায়িকাকে বাগানের একটি নির্জন জায়গায় আনিয়া তাহার গণ্ডে চুমা আঁকিয়া দেয়, তখন সে বিজ্ঞ-জনোচিত ভঙ্গীতে—ওয়াহ্‌ কিয়া বাৎ—করিয়া উঠে। এই 'টকী' দেখিবার স্পৃহার জন্যই তো সেদিন ফজলুর সহিত তাহার মন্নুমামুর খুব ঝগড়া হইয়া গেল। 'টকী' দেখিয়া ফজলুর মনে বীরত্ব-রস ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। মন্নুর কাছে দাপট করিয়া খুব বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলঃ আমায় চার আনা পয়সা দাও তো? মন্নু বিস্মিত হইয়াছিল কম নহে। ফজলু যে তাহার নিকট পয়সা চাহিবার মত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবে তাহা

মন্নুর নিকট কল্পনাতীত ছিল। চোখ কুঞ্চিত করিয়া মন্নু বলিল ঃ কিসের পয়সা ?—আমার নিজের পয়সা। ফজলু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল।—তোর নিজের পয়সা কি রে হারামজাদা! তোকে এত বড় করল কে? খাওয়াল-দাওয়াল কে? বেট্টা আবার বলে নিজের পয়সা! অসহায় ক্রোধে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ফজলু। বলিল ঃ দিবে না ?—না! দাঁত খিঁচাইয়া মন্নু এইবার উত্তর করিল। ফজলুর মাথায় অপরিমিত ক্রোধ জমিয়া উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে ঃ তোমার বাবার পয়সা যে আমায় দেবে না? তুমি চোর আছ, শয়তান আছ—তুমি আমার শা-লার মামু। বলিয়া মহাবীর নেপোলিয়ানের মত পদ-ভরে মেদিনী কাঁপাইয়া ফজলু ঝট্‌কা দিয়া চলিয়া গেল।

কলিকাতার সংখ্যাতীত আকর্ষণ গ্রাম্যবালক ফজলুর নিকট স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। একদিন সে হঠাৎ শহর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজ গভর্নমেণ্টের রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া সে গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল একা। কিন্তু পদ্মা পার হইয়া চাঁদপুর পৌঁছিবার সুযোগ তাহার আর হইয়া উঠিল না। একটি পাঞ্জাবী টিকিট-কালেক্টার তাহার বিনা-পয়সায় যাত্রা করিবার অনন্যসাধারণ উদ্ভাবনায় একেবারে মোহিত হইয়া, মধুর আত্মীয় সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া এবং তাহার কর্ণযুগল ধরিয়া গোয়ালন্দের নির্দয় মাটিতে তাহাকে নামাইয়া দিল। যাহা হউক, ফজলু মিঞার অসাধারণ প্রতিভার যথাযথ সম্মান যদিও স্টীমার কোম্পানী দেখাইল না, তবুও গোয়ালন্দ ঘাটে তাহা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া তাহার আয়ের পন্থা চমৎকারভাবে করিয়া দিল। বাজারে এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তির নিকট তাহার নৃত্যগীতের পারদর্শিতা সে দেখাইতে লাগিল। কেহ দেয় কিছু খাবার জিনিস, কেহ বা সযত্নে কর্ণমর্দন করিয়া দেয়, কেহ বা দুই একটি মিষ্টি কথা বলে এবং যাহারা অপেক্ষা-কৃত দয়াবান তাহারা চোখ বুজিয়া একটি আধলা টুপ করিয়া ফেলিয়া দেয় তাহার হাতে। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল—কোন রাত্রিতে গাছতলায় শুইয়া, কখনও কারও বাড়ীর কোন অব্যবহৃত স্থানে। অবশেষে একদিন স্টীমার-ঘাটের একজন কেরানী সাহেব তাহাকে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার জন্য ফুসলাইয়া ফুসলাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের ফজলুমিঞার প্রতিভা কেবল নৃত্য-গীতে সীমাবদ্ধ নহে, গল্প বানাইয়া বলিবার ক্ষমতাও তাহার অনবদ্য।

নিজের সম্বন্ধে সে একটি গল্প সাজাইয়া বলিল। গ্রামোফোন কোম্পানীর কোন একজন লোক কি উপলক্ষে যেন ফজলুদের গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে ফজলুর নৃত্যগীতে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া, তাহার মাতা-পিতাকে তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন তিনি কলিকাতায়। কয়েকদিন ফজলুর খুব যত্ন-টত্ন করিলেন, পয়সাও দিলেন। কিন্তু একদা তাঁহার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। খাবার দিলেও তিনি ফজলুকে পয়সা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নিজের প্রতিভার অসম্মানে তাই ক্ষুব্ধ হইয়া ফজলুমিঞা ফিরিয়া যাইতেছিল তাহার বাড়ী, কিন্তু পথিমধ্যে একটি অভাবনীয় বিভ্রাট বাধিয়া যাওয়াতে তাহার দেশে পৌঁছান আর ঘটিয়া উঠিল না। ভদ্রলোক এ-কাহিনী বিশ্বাস করিলেন কিনা তাহা ফজলুর পক্ষে অনুমান করা দুঃসাধ্য হইল। তবে কণ্ঠ মোলায়েম করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন ঃ দেখ্‌, তুই যদি আমার এখানে চাকরি করিস্‌, তবে তোকে মাসে মাসে একটা করে টাকা দিব। খাওয়া পাবি, বাসাস শুবি, দু'মাস চাকরি করে বাড়ী ফিরে যেতে পারবি। ভাগ্যের এ-প্রকার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে ফজলুর মন তাহার স্রষ্টার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং ভদ্রলোকের এ-লোভজনক প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

মাসখানেক কাটিয়াছে। ফজলুর নূতন মনিব আহমদ মিঞাকে যদিও খুব দয়াবান লোক বলিয়া অভিহিত করা যায় না, তথাপি মন্নু মামুর তুলনায় আহমদ মিঞাকে ফজলুর বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তা বলিয়া মনে হইল। পরন্তু আহমদ মিঞা তাহাকে একটি চকচকে নূতন টাকা দিয়াছে মাসের শেষে। ফজলুর ভাবিতে বেশ মজা লাগিল, এই গোটা টাকাটি সে কেমন করিয়া খরচ করিয়া দিবে রকমারী জিনিস কিনিয়া। আর নাচ গান করিয়া সে হপ্তাতে ছয় পয়সা আট পয়সা তো রোজগার করিয়াই থাকে। কিন্তু স্বচ্ছ আকাশে আকস্মিক মেঘ ঘনাইয়া আসিল। বাজারে সেদিন রাধানৃত্য দেখাইবার সময় হঠাৎ নিজের দেশের একটি লোকের সঙ্গে ফজলুর অপ্রাথিতভাবে দেখা হইয়া গেল। ফল কি হইল তাহা বিস্তারিত বলিয়া লাভ নাই। মন্নু মামুজানের স্নেহাশ্রয়ে ফজলু আবার ফিরিয়া আসিল সেই কলিকাতা।

মন্নু মামুজান অত্যন্ত সদাশয় লোক। ফজলুর গৃহত্যাগের পাশবিক অপরাধের জন্য তাহাকে সে এত কম মারিল যে ফজলুর পিঠ ফাটিয়া

মাত্র একটি দাগ গভীর হইয়া বসিয়া নীল হইয়া উঠিল, তাহা ছাড়া ফজলুর দেহ রহিল অক্ষত। এইবার মন্নু ফজলুকে একটি হোটেলে চাকরি করিয়া দিল এবং সংগোপনে হোটেলওয়ালাকে ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যেন সে ফজলুকে একটি আধলাও কখনও না দেয়। মারের দাগ ফজলুকে কয়েকদিন অত্যন্ত বিচলিত রাখিল, তবে কয়েকদিন পরে সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল এবং আবার তাহার দিন কাটিতে লাগিল পরম উল্লাসে। ইহা বলা বোধ হয় বাহুল্য যে নৃত্যগীতে নিজের নিপুণতা ফজলু অব্যাহতই রাখিয়াছে। হাসিয়া খেলিয়া নাচগান করিয়া অনেকের আদর আপ্যায়ন পাইয়া তাহার সময় বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল—এমন কি, ফজলু তাহার মন্নু মামুর নির্মমতাকে মনে মনে ক্ষমা করিয়া ফেলিল।

তবে বিভ্রাট বাধিল সেদিন। এইখানে চাকরি করিবার কয়েকদিন পরেই তাহার একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুটিয়া গিয়াছিল। হোটেলে সে মাঝে মাঝে ইয়ারদের লইয়া চা পান করিতে আসিত, হোটেলের সকলের সহিত হল্লা করিত। তাহার বয়স কত তাহা কেহই বলিতে পারে না। এভারেস্ট শৃঙ্গ যতদিন না মানুষ জয় করিবে, ততদিন তাহার বয়সও কেহ বলিতে পারিবে না। টেরী কাটিবার তাহার ধরন ছিল অদ্ভুত, কানে সব সময়ই একটা বিড়ি গোঁজা থাকিত, লুঙ্গী পরিত চটক্‌দার। এবং তাহার কীর্তিকলাপ মেছুয়াবাজারের দুর্দণ্ডপ্রতাপ গুণ্ডাদিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলিত। অবশ্য ফজলু তাহার নবীন বন্ধুর চরিত্রের এ নমনীয় দিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলো।

একদা সেই বন্ধু আসিয়া বলিল :—এই শালা, চল—ডাঁষ (পাঠকদের অবগতির জন্য ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে 'Dance' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ ডাঁষ) দেখতে যাবি? বহুত চামড় অউরত আছে রে!

মহাসঙ্কটে পড়িল ফজলু। মহবুব তাহার বিশেষ বন্ধু, তাহার কথার অমর্যাদা করা তাহার পক্ষে কঠিন, অথচ তাহার নিকট একটি আধলাও নাই। ফজলুর শালা-মামু তাহার মাহিনা সব দখল করিয়া নেয়। বন্ধুকে জানাইল তাহার বিপদের কথা।

দুইচোখে এক অদ্ভুত গতি সঞ্চারিত করিয়া মহবুব বলিল : তোর মাথায় একটুও আক্‌কেল নেই রে শালা! হোটেলে কাজ করিস্ কি

করতে ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখবি—যখন কেউ নেই তখন এমনি করে পয়সা তুলে নিবি। কথা শেষ করিয়া মহবুব মিঞা বিস্ময়কর দক্ষ ভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালিত করিল।

আর যাহাই করুক, ফজলু এ-পর্যন্ত কাহারও কিছু চুরি করে নাই। বন্ধুর কথায় তাহার কেমন যেন খট্‌কা লাগিল।—না, চুরি আমি করব না। অবশেষে ফজলু মাথা নাড়াইয়া বলিল।

মহবুব তাহাকে প্রথমে অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গাল পাড়িতে লাগিল। পরে স্বর নরম করিয়া চুরির মাহাত্ম্য কীর্তন করিল এবং পরিশেষে একটি দার্শনিকতত্ত্ব প্রচার করিয়া বলিয়া বসিল ; ও শালাদের পয়সা চুরি করলে কিছু হয় না রে—ওদের গাদাগাদা পয়সা। এবং এই সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ এমন একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিল যে লিপিবদ্ধ করিলে তাহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে।

ফজলুর পক্ষে 'টকী' এবং র্ডাষ দেখিবার আকর্ষণ কম নহে, পরন্তু চুরি করিয়া মহবুবের নিকট বাহাদুরী পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বিভ্রাট বাধাইয়া বসিল। চুরি করিবার সঙ্কল্প তাহার মনে সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং এক অনিবার্য প্ররোচনায় তাহার জীবনে সে প্রথম চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তৎক্ষণাৎ। সকলে তাহাকে নির্মমভাবে পিটাইতে লাগিল। অবাক্ হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল ;—বেটাকে ভাল বলে ঠাঁউবিয়ে ছিলাম। ও বাবা, পেটে তার এত বিদ্যে তা কে জানত! শালার কি সাহস! সমস্ত নির্দয় অত্যাচার ফজলু নীরবে সহিতে লাগিল। কিন্তু কেহ জানিল না মহবুবের চক্রান্ত। যাক, খালি মার খাইয়াই ফজলুর এ-ফাড়া কাটিয়া গিয়াছে, নয়ত চুরি করিবার শাস্তি স্বরূপ জেলেই পচিতে হইত তাহাকে। ভালই বলিতে হইবে ফজলুর কপালকে।

কলিকাতা ছাড়িয়া ফজলু নৈহাটী পলাইয়াছে। প্রথম কয়দিন একেবারে খারাপ কাটিল না। কিন্তু নূতন জায়গায় তাহাকে সকলে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল এবং যাহা সব চাইতে আশ্চর্যের কথা সেই নৃত্যগীতে তাহার নিপুণতা একেবারে উবিয়া গেল। পেট ভরিয়া আজকাল সে আর খাইতে পারে না। অর্ধাহারে অনাহারে ফজলু শুকাইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া চলিল। তাহার জীবনে আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বেদনার নিত্য আঘাতে তাহার

হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহ হইয়াছে কাঠির মত ক্ষীণ। পৃথিবীর আলো-বাতাস যদিও ফজলুকে এখনও বর্জন করে নাই, তবুও অন্যান্য অসহ্য দুঃখের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। বেদনার আঘাতে হতভাগ্য বালক পরাভব মানিয়াছে।

আবার রাত্রি আসিয়াছে। পৃথিবীতে আঁধার নামিয়াছে গাঢ় হইয়া। ফজলু ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। কোন জায়গায় তাহার আশ্রয় জুটিয়া উঠে নাই। গাছতলায় দেহ এলাইয়া ফজলু বসিয়া পড়িল। পরনে এখন তাহার যা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাকে কাপড় বলিয়া অভিহিত করা যায় না। সারা শরীরে ময়লা জমিয়া জমিয়া কেমন বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে তাহার চেহারা। আর দেহ এত ক্ষীণ হইয়াছে যাহা দেখিলে হয়ত অনেকেরই মায়া হইত। তমিস্রাময় নিশীথে বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। ফজলুর দেহ তাহাতে শীতল হইয়াছে, বাতাসের উদার স্পর্শে তাহার বেদনাক্রান্ত মন যেন জুড়াইয়া গেল। ফজলুব ইহা খুব আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল, এ নিবিড় আঁধারভরা রাত্রিতে গাছতলায় একা পড়িয়া থাকিতে কিন্তু তাহার এতটুকুও ভয় করিতেছে না। এক সময় হঠাৎ তাহার এমনিই মনে হইল ঃ যদি এখন তাহার মা-বোন বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে বেশ ভালই হইত। আচ্ছা, না হয় ফজলু ধরিয়াই লইল, এখনও তাহার মা-বোন বাঁচিয়া আছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা ফজলুর এই অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে। না, বাপের কথা সে ভাবিতেছে না। বাঁচিয়া থাকিলে সে মনু মামুর মতই তাহার উপর জুলুম করিত। ভালই হইয়াছে তাহার বাপ মারা গিয়া। তবে এখন তাহার মা-বোন বাঁচিয়া থাকিলে মন্দ হইত না নেহাৎ। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ফজলু একসময় শুইয়া পড়িল। কালো আকাশে তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে আর তখন হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে গাছের পাতার উপর, বন্য ফুলগাছে, ঘাসে, ফজলুর সমস্ত শরীরে - খুব ধীরে, খুব করুণ নম্রতায়, এত কোমল হইয়া...ফজলু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

ফজলুদের গ্রামে একটি যাত্রাদল আসিয়াছে। খুব হৈ চৈ পড়িয়াছে তাহা লইয়া—পার্শ্ববর্তী অনেক কয়টা গ্রাম হইতে নির্দিষ্ট দিনে বহু-

লোক আসিয়া ভীড় করিয়া বসিল। তিলার্ধ জায়গাও কোথাও নাই। এঁত লোক জমিয়াছে যাত্রা দেখিবার জন্য। ফজলু নাচগানের একটি পার্ট করিবে। যাত্রা আরম্ভ হইল। তুমুল করতালিতে কাঁপিয়া উঠিল দিগ্বিদিক। অবশেষে ফজলুর পার্ট আসন্ন হইয়া আসিল। ফজলু নাচিতেছে, গাহিতেছে এবং লোক সব অবাক্ হইয়া দেখিতেছে তাহার নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমা, বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে তাহার গান। সর্বশেষে ফজলু আর একটি গান গাহিল। এত বিষাদমাখা সে গান যে, তাহার কণ্ঠের দরদের সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়া তাহা একটি অদ্ভুত কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সকলেই তাহার গান অভিভূত হইয়া শুনিতেছে, অনেকেরই চোখে জল জমিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে বিরাজ করিতেছে নিগূঢ় নিস্তব্ধতা। ফজলুর গান শেষ হইল। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে করতালি দিবার মত মানসিক অবস্থা কাহারও ছিল না, কি এক অনির্দেশ্য দুঃখে তাহাদের হৃদয় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সাহেব যাত্রা দেখিতে আসিয়াছিলেন। ফজলুর গান শুনিয়া সস্নেহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন ঃ বেশ গান গেয়েছিস্ খোকা। তোর নাম কি?—ফজলু! সলজ্জকণ্ঠে সে উত্তর করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ সাফল্যের দীপ্তিতে হইয়া উঠিল উজ্জ্বল। বাসায় ফিরিয়া সে আত্মীয়স্বজনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং নিভৃতে ফজলুর মাথায় হাত রাখিয়া, পায়ে খুব কোমল করিয়া হাত বুলাইয়া তাহার মা বলিতেছে ঃ কি কি বলল রে তোর লোক সব? ফজলুর কালো গাল দু'টি বাদামী হইয়া উঠে।—অ অনেক কিছু। ফজলু মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া উত্তর করিল। মা তাহার মুখটি নিজের বুকের মধ্যে খুব গাঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল। ফজলুর বড়বোন নিতান্ত অকারণে তাহার গলা নিজের দুইটা নরম উষ্ণ হাত দিয়া জড়াইয়া খুব মোলায়েম স্বরে বলিয়া উঠিল ঃ তুই আমার খুব ভাল ভাই, বুঝলি? বড়বোনের স্নেহোষ্ণ স্পর্শে কি এক অপূর্ব সুখ-শিহরণ তাহার শরীরে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। অনেক দূরে যেখানে গাছগুলো একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে, যেখানে আকাশের অনন্ত ব্যাপ্তি পরাভব মানিয়াছে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ অত্যন্ত মলিন হইয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

কি এক অসহ্য যন্ত্রণার কাতরতায় ফজলু আচম্বিতে জাগিয়া উঠে। সারাদেহ যন্ত্রণায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। উঃ! পৃথিবীর এ

কোমল বুকে এত কাঠিন্যও সঞ্চিত রহিয়াছে—এত হৃদয়হীন কঠোরতা। চারিদিকে নিরন্ধ্র গাঢ় তমিস্রা, তাহাকে ভেদ করিয়া উঠিতে পারে এমন কিছু এ বিশাল বিশ্বে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ফজলুর চোখে নেশা ধরিয়াছে, ফজলুর চোখ ঝিমাইয়া আসিতেছে, সমস্ত কিছু আবছা হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবী হারাইয়া গিয়াছে। ধরিত্রী স্থির, নিস্পন্দ, আঁধারাবৃত, বাতাসও ফুরাইয়া গিয়াছে। আঁধার, আঁধার আঁধারের প্লাবন—বন্যা!

পরদিন সকলে ভিড় করিয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল ফজলুর মৃতদেহ। নীল হইয়া গিয়াছে তাহার শরীর। একটি ভদ্রলোক, ডাক্তারই হইবেন হয়ত, ফজলুর দেহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: ছেলেটাকে সাপে কামড়িয়েছিল।

ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারিব না, ফজলুর খবর দেওয়া হইয়াছিল, না গোপন হইয়াছিল, কি তোমরা তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল। আর ইহাও আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না, তাহার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া কোন সদাশয় লোকের মন একটি মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল কিনা, বা তাহার চোখ দিয়া ঝরিয়াছিল কিনা একফোঁটা জল।

পূর্ণিমা রাতের স্মৃতি

বাবর ভাগ্যবান। বি-এ পাস করে ল' কলেজে ভর্তি হল। সঙ্গে সঙ্গে এম-এ ক্লাসেও যোগদান করল। তারপর একদিন এম এ, বি-এল হয়ে [illegible] পেয়ে গেল এক মুন্সেফী। বিয়ে করেছে বাবর [illegible]। আয়শাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে বাবর অসন্তুষ্ট নয়, আর বছর দুই হোল তাদের একটা সুন্দর সুস্থ সবল ছেলে হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] বিস্ফারিত নাদুস নুদুস ছেলে—নাম জাফর। [illegible] মাত্র তাদের বিয়ে হয়েছে। রূপে বর্ণে গন্ধে উচ্ছল পৃথিবী তাদের চোখে রঙের নেশা লাগিয়েছে। তাদের মনে ফুলের উগ্র সুবাস এখনও অম্লান।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে শ্রান্ত দেহকে একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিয়ে [illegible] বাবর বলল—এবার বদলী করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। জাফর তখন একটা টিনের বাক্স নিয়ে খেলা করছিলো—ক্রীড়ারত শিশুটার দিকে চেয়ে আয়শার মুখটা সহসা আশঙ্কায় কাল হয়ে উঠে। কথা বলবার সময় তার গলাটা কেন যেন কেঁপে উঠছে—সেই যেখানে তোমার ছোট ভাই মারা গিয়েছিলো? বাবর সংক্ষেপে উত্তর করে, হুঁ। বাবরের জুতোর ফিতা আলগা করতে করতে আবার এক সময় আয়শা বলে ওঠে: কখন যেতে হবে? দিন পনের পরে, বাবরের মুখটা তবুও গম্ভীর বিষণ্ণ।

চারদিকে কি একটা রহস্যকর পারিপার্শ্বিকতা নিমেষে গড়ে উঠেছে। জাফরকে কোলে তুলে তার গালে চুমো খেয়ে আদর করে বাবর বলল: এই বল্ ঘোড়া গাড়ী টন টন। জাফর অস্ফুট কণ্ঠে বাবরের স্বর অনুকরণ করবার চেষ্টা করে বললে: দোড়া দাড়ী তান তান। জোর করে হেসে ক্ষুব্ধতা ঝেড়ে ফেলে আয়শাকে

বাবর বলে ঃ বাহাদুর হয়েছেন তোমার ছেলে, এখনও একটা কথা ঠিক করে বলতে শিখল না। এ ছেলের হবে কি! গাল ফুলিয়ে 'বনীবেবী'র মত জাফর হাসতে থাকে. দাঁতও কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আয়শা চেয়েছিলো আকাশের দিকে। আকাশ ক্রমেই গাঢ় কাল হয়ে আসছে, চিলরা উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে, এখনই হয়ত এ পৃথিবীর ব্যথা-তপ্ত বুকে ঝরে পড়বে জল, জননীর স্নেহে, হয়ত বা আয়শার হৃদয়ের প্রগাঢ় মমতা নিয়ে। আয়শার মনটা তবুও কেমন করতে থাকে, একটা কারণহীন অস্বস্তির ভাব। বাবরের কোল থেকে জোর করে জাফরকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে খুব করে চুমো খেতে থাকে বাইরের আকাশের সঞ্চিত মেঘের নিবিড় কারুণ্যের প্রভাবেই হয়ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি হয়েছে শুনে বাবর ও আয়শার মনে যে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছিলো তা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেল। নূতন জায়গায় আসার উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আয়শাকে মনের স্থিরতা ফিরিয়ে দিয়েছে। মোক্তার গৃহিণীরা, সবডেপুটী গৃহিণীরা এবং উকিল জমিদারদের গৃহিণীরা সকলেই একে একে এসে একবার আয়শাকে দেখা দিয়ে যান, বিশেষ করে অনুরোধ করেন যেন আয়শা তাদের ওখানে মাঝে মাঝে যায়। জাফরকে আদর করে কেউ কেউ বা কিছু উপহার দিয়ে যান, আয়শা আপত্তি করলে সুমধুর হাসি হাসেন। এমনি করে আয়শা ভুলে গেল কেন তার মন একদা ব্যাকুল-উদ্বেগে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। আর বাবর? মুন্সেফদের জীবনে কি বিশ্রাম আছে? অফিসের কাজে সে এত ব্যস্ত থাকে যে মাঝে মাঝে তার ভুল হয় এরই মধ্যে পৃথিবী কি আশ্চর্য ভাবে রসহীন নির্জীব হয়ে গেছে। আরও কত রকমের আনুষঙ্গিক কাজ। মুন্সেফ যে, সে ভাগ্যহত। তবে নেহাৎ যখন সময় থাকে সে স্টেশন ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে, আলোচনা করে। বাড়ীতে আয়শা আর 'বনী'ছেলে জাফর। এর চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষার জিনিস মানুষের কি হতে পারে? বেশ আনন্দে দিন কাটছে বাবরের, বলতে গেলে। হাসি খুশি. গল্প গুজব, টাকার অসচ্ছলতা নেই, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর 'বনী বেবী', এমন সম্মান···বাবরের ভাববার কি সময় আছে যে দশ বছর আগে তার ভাই এখানে মারা

গিয়ে এ দীর্ঘ সময় ধরে এখানকার এক অবজ্ঞাত জায়গায় গভীর ঘুমের যাদুতে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে? বাবর বলে কি আর কেউ আছে?

ঈস্টারের ছুটি হয়েছে দুদিন। বাবর ভাবছিলো কেমন করে এ ছুটি কাটান যায়। ভৈরবাজার এখান থেকে খুব কাছে। সেখানে এখানকার এক সম্ভ্রান্ত মোক্তারের বাড়ী। তিনি বিশেষ অনুরোধ করে বলছিলেন: স্যর বলতে সাহস হয় না, তবে যদি মেহেরবানী করে গরীবের ঘরে ··কিন্তু বাবর এ পর্যন্ত কিছু বুঝে উঠতে পারে নাই। কথাটা আয়শাকে বললে সে বলল: পাগল, ওখানে গিয়ে কাজ নেই। অতএব ওখানে যাওয়া আপাতত এখন স্থগিত। আয়শা আরও বলেছিলো - একা কোথাও যেও না।

তারপর? বিচিত্রভাবে কিন্তু অদম্য আকর্ষণ নিয়ে বাবরের মাথায় এক খেয়াল ঢোকে। প্রকৃতির আদিম রহস্য আচম্বিতে কখন যে মানুষকে পেয়ে বসে তা যদি কেউ ঠাহর করে পায়? বাবরের দুর্নিবার ইচ্ছে হচ্ছে রশীদের কবরের এখানে যেতে।

পূর্ণিমার মস্ত সমারোহে সে নীরব নিশীথ অপরূপ। বাবর কবরস্থানের দিকে যেতে থাকে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল আয়শাকে ডেকে নেয়, জাফরকে। কিন্তু আয়শা কাজে বড় ব্যস্ত আছে যে!

কবরস্থানে। পূর্ণিমা মফঃস্বল শহরের বিশেষ করে এ নিথর জায়গায় কেমন এক বিচিত্র কুহক রচনা করেছে, পাশে অনেকগুলো টিনের বাড়ী, উত্তর দিকে স্টেশন, সামনে ধানক্ষেত, রেললাইন স্টেশনের বাতি, দূরে সিগন্যালগুলো। আর চারদিক ঘিরে গাছ। শ্যামলতার প্রাচুর্যে তা এ পূর্ণিমা রাতের শুভ্র জ্যোৎস্নার সাথে মিশে এক অনুপম রহস্যাত্মক শোভার সৃষ্টি করেছে। সামনের ধানক্ষেত অনেক বড়, যেখানে সারি সারি সবুজ গাছের মাথা চুম্বন করে গাঢ় নীল আকাশ হারিয়ে গেছে, মনে হয়, সেখানে এ ধানক্ষেতের শেষ। হয়ত বা আরও দূরে। বা কোন অচিন্ দেশে! খানিক আগেই একটা আবছা অপার্থিব ভাব, চারদিকে একটা উন্মত্ত উল্লাসের ভাব, পেছনে কার হাতছানি। আর সুনীল আকাশের মন-ভোলান হাসি এবং শূন্যে ঝকঝক করছে জ্যোৎস্নার রূপালী শুভ্রতা। ঘাসের ওপর বাবর বসে

পড়ে। ওই ওইটাই বুঝি রশীদের কবর—পাশে শেফালি গাছ। বাবরের স্পষ্ট মনে পড়ে যখন রশীদকে হেমন্তের এক মধুর সন্ধ্যায় কবর দেওয়া হয় সূর্য ঢুলে পড়ছিলো তখন ধানক্ষেতের ওদিকে, আর সান্ধ্য রশ্মি মাঠে যে জল জমে উঠেছিলো তাতে প্রতিফলিত হয়ে সব-কিছুকে বর্ণের বিজুরীতে করে তুলছিলো রহস্য-রঙীন, আকাশে জ্বলজ্বল করছিল ক্ষিপ্ত রঙ। তারপর এক সময় পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে নেমে আসে গোধূলির ধূসর ম্লানিমা। তখন চোখ-ভরা অফুরন্ত অশ্রু নিয়ে বাবর রশীদের কবরের পাশে একটা শেফালি ফুলের গাছ পুতে দেয়।

দেখেছ! সে গাছ কত বড় হয়ে গেছে। কত অজস্র ফুল তার পাতায় পাতায়। বাতাসের মৃদু আঘাতে শেফালি ফুলগুলি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। এমন প্রাণ-মাতান শেফালি ফুলের সৌরভ, তা কি বাবর জানত? বাবর সম্মোহিতের মত ভাবতে লাগল, মনে হল কার যেন চাপা কান্নার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে, বাবরের চেতনা বলে যদি কিছু থাকে! বাবরকে কে যেন জোর করে এখান থেকে উঠিয়ে রশীদের কবরটার পাশে নিয়ে যায়। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সেখানে বসে পড়ল। কবর যে এখানে এককালে ছিল তা এখনও বোঝা যায়, ঘাসে ঢাকা বলে দূর থেকে টের পাওয়া যায় না। বাবরের মন পরিমাণহীন মায়ায় হঠাৎ রণরণিয়ে উঠে, কেমন করছে বাবরের মন।

উপরে আলোকের পৃথিবী—উপরে যে পৃথিবী তার সুনীল আকাশে চাঁদ উঠে তাকে আলোকের উৎসবে, আনন্দের প্লাবনে, উচ্ছৃঙ্খল মাধুর্যে ছেয়ে ফেলেছে। শেফালি গাছের পাতায় পাতায় প্রচুর ফুল ফুটে মন্থর-মদির বাতাসকে দিক্‌প্লাবী সৌরভে স্নিগ্ধ করে তুলছে। বাবরের সহসা মনে হয়, এমনিই ঃ দশ বৎসর ধরে শিশু রশীদ কঠিন মাটি ও প্রারষ্ট আঁধারের ক্রূর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য দুরন্ত ব্যাকুল চেষ্টা করছে, তার নরম, মোমের মত নরম ক্ষুদ্র দেহে যখন কোন জিনিসের মায়াহীন আঘাত লেগেছে তখন তার নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কামনায় এককালে সকলের খুব আদরের রশীদ পৃথিবীর মানুষের স্নেহোষ্ণ মমতাকোমল স্পর্শ পাওয়ার জন্য হয়ত বা এ দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে অবিরত কাঁদছে—পেতে চাচ্ছে মায়ের বুকের পরশ, বাবার বাহুবেষ্টন, ভাইবোনদের আদর আপ্যায়ন।

বাবরের বুকটা কেমন করে উঠছে—রশীদ যে আসতে চাচ্ছে তার কাছে –যে ভাই তাকে সবচেয়ে বেশী আদর করত, তার কোলে ফিরে আসতে চাচ্ছে শিশু রশীদ। বোকা ছেলে বোঝে না যে এ পৃথিবী কত নিষ্ঠুর আর মানুষরা কত হৃদয়হীন! অতি মনীষী নিষ্পাপ বালক তাত' বোঝে না। বাবরের ঘুম পাচ্ছে, জড়িয়ে আসছে চোখ দুটো –বাবরের আজকে কি হয়েছে তাত' বাবর বুঝছে না'।

বাবরের বাবা দশ বৎসর আগে এ [illegible] সদাগ সকেলের অফিসার ছিলেন। নাম [illegible]। স্ত্রী এবং তিনটা ছেলের সাথে তিনি এককতন পেনশন [illegible]। সে বাড়ীতে কাঁঠাল, গোলাবজাম, আনারসের গাছ –[illegible] জায়গা জুড়ে বাগানের মত করা, তার পাশে [illegible] এক [illegible] রাস্তা, তারপরই পুকুর। [illegible] —মানন-[illegible]। [illegible] বয়স [illegible] বোন, [illegible] ছেলে রশীদের [illegible]।

সেদিন সাদেক সাহেবের [illegible]। [illegible] এসেছিল সঙ্গে [illegible]। রশীদ না [illegible] স্বরে বলল [illegible] মাথার [illegible]। মা কোলে তুলে নিয়ে চুমা দিয়ে বললেন—যাচ্ছি [illegible]। [illegible]। তিনটা ছিল [illegible]। নাপিত এসেছিলো, সাদেক সাহেব [illegible]কে কোলে করে নাপিত দিয়ে তার নখ কাটিয়ে নেন।

ঘন্টা তিন বাদে। বাবরকে মা বললে। দেখত' একটু রশীদ কোথায়। বাবর পড়ছিলো খবরের কাগজ, বলল ঃ যাচ্ছি একটু বাদে। মা রাগ করে চলে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে রফিককে বললেন— রশীদ কই রে? বাইরে সাইকেল মেরামত করা দেখছে রফিক উত্তর করল। মিনিট পনের পরে মা আবার বাবরকে এসে বললেন ; দেখ না কোথায় রশীদ। বাবরকে উঠতেই হয়। বাইরে পুকুর সংলগ্ন বাগানে সাইকেল মেরামত করা হচ্ছিল -সেখানে রশীদ নেই। ফিরে এসে মাকে বাবর বলল ঃ না ওখানে ত' রশীদ নেই। মা ব্যাকুল হয়ে বললেন—খোঁজ না কোথায় গেল। সাদেক সাহেব বাইরের কামরায় ইজি চেয়ারে বসে পুকুরের দিকে চেয়েছিলেন। তিনি নিস্তব্ধ হয়ে

বসেই রইলেন। খুঁজতে বেরোল বাবর ও রফিক। দু'একটা জায়গায় খুঁজে বাবর পুলিশ ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে এসে তার ছেলের সাথে গল্প জুড়ে দিল; কি এক সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ে ছিল তার একটা গল্প পড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু খানিক বাদেই বাবরের মন কেমন করে ওঠে – সে উঠে নানাজায়গায় খুঁজতে লাগল। সম্ভব অসম্ভব জায়গায় —যেখানে সেখানে। তবুও রশীদের কোন হদিসই নেই। বাড়ীতে তখন কান্নার রোল পড়ছে, খালি সাদেক সাহেব গম্ভীর হয়ে তখন ইজি-চেয়ারে বসে, দৃষ্টি তাঁর সেই পুকুরের দিকে।

বাবর রেল-লাইন ধরে মাইল দেড়েক খুঁজে এল, পথে সব লোককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল রশীদের কথা। স্টেশনের সামনে একটা বিস্কুটওয়ালার দোকান। সে বলল ঃ হ্যাঁ রশীদবাবু এসেছিলেন এখানে, তাঁকে বিস্কুট দিতে চাইলাম, তিনি বললেন—যাঃ। রশীদকে যে পাওয়া যাচ্ছে না সে কথায় বিস্কুটওয়ালা খুব উদ্বেগ প্রকাশ করল, কিন্তু সেখান থেকে রশীদ কোথায় গিয়েছে তার খবর সে দিতে পারল না। আবার বাসার দিকে ফিরে আসছিল বাবর। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টারের ভাইয়ের সাথে স্টেশনের সামনে দেখা, সাইকেল চড়ে কোথায় খুব ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে —তার দিকে যে অমন করে তাকাল! – বাসার পাশেই তাদের বাড়ী। আবার পুলিশ-ইন্সপেক্টারের ছেলের সাথে দেখা, সে বলল ঃ যান রশীদকে পাওয়া গেছে পুকুর থেকে। সামনের গাছগুলো যেন বাবরের চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কম্পিত আশঙ্কাবিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ মরে গেছে? —বোধ হয়, ছেলেটা দ্রুত চলে গেল সাইকেলে চড়ে।

হেমন্ত কাল হলেও তখন বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু করে, ঝরঝর করে। কাঁটাল গাছ, আম গাছ, বেল গাছ যত সব গাছ ছিল তারাও কেঁদে কেঁদে যেন আকুল হচ্ছে। যে লোকগুলো ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকে কাঁদছে। সহানুভূতিশীল করুণাময় লোকেরা কাঁদছে, আর কাঁদছেন পাগলের মত নেচে নেচে বুক থাপড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদছেন সাদেক সাহেব, বাবরের মা এবং কাঁদছে বাবর-রফিক। কাঁদছে, কাঁদছে, কাঁদছে। চাপা, ভীত, তীক্ষ্ণ কান্না। সকলেই কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে সাদেক সাহেব বলছেন ঃ হায় আমি ইজিচেয়ারে

বসেছিলাম, এই পুকুরের দিকেই চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বাচ্চা কখন যে ডুবে মরল তা জানতে পারলাম না। মা বলছিলেন ওরে আমার তোতা পাখী, তোকে আমি মেরেছিলাম রে, আয় লক্ষ্মী সোনা, একবার তোর মায়ের কোলে আয়, একটা চুমো দে ওরে আমার কলজের–টু-ক-রো। তারপর আবার বিনিয়ে বিনিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। আর বজ্রাহত বাবর বিমূঢ় মনে ভাবছিলো সে যখন পত্রিকায় গল্প পড়ছিলো তখন হয়ত রশীদ নিঃশ্বাস নিবার জন্য ছটফট করছিলো— একটু বাতাস।

বিস্কুটওয়ালার দোকান থেকে ফিরে রশীদ পুলিশ ইন্সপেকটারের বাড়ীর সামনে বাতাবী লেবুর গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল--কে ধমক দিল— এই এখানে কি করছিস। অভিমানী শিশুর ঠোঁট দুটো হয়ত বা ফুলে উঠেছিলো, রশীদ বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। লোকজন তখন কেউ ছিল না সাদেক সাহেবের বাড়ীর সামনে। বাসায় ফেরার রাস্তা হেটা, সেখানে একটা গরু বাঁধা। তার পাশ দিয়ে রশীদ ছোট ছোট পা ফেলে মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ গরুটা তাড়া দেয়। পা পিছলায় রশীদের, পা পিছলিয়ে পুকুর পাড়ে পড়ে। আবার পিছলায়, তারপর জল। জলের মধ্যে ক্রমেই রশীদ তলিয়ে যাচ্ছে, কোমর ডুবল, গলা ডুবল, চোখে পানি, চোখ ডুবল। বন্ধ হয়ে আসছে বাতাস, ফুরিয়ে গেছে বাতাস, রশীদ নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে, খুব কষ্ট হচ্ছে রশীদের, জলের নীচে আগাছায় জড়িয়ে যাচ্ছে রশীদ, রশীদ···ঘুমিয়েছে। ঘুম ঘুম ঘুম।

রশীদের ঠোঁটের একটা কোণ নীল হয়ে উঠেছে। মৃতদেহে আর কোন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু চোখের কোণে এক ফোঁটা জল জমে গাঢ় হয়ে উঠে যেন শক্ত হয়ে গেছে। সেই ফুলের মত সুন্দর মুখ প্রস্ফুটোন্মুখ গোলাপের মত হাসছে, সে মৃদু সুন্দর হাসির বিচ্ছুরিত আভায় সব কিছু সুন্দর···রমণীয়·· পবিত্র।

কত লোক সান্ত্বনা দিচ্ছে সাদেক সাহেবকে, পাশের সব বাড়ীর মেয়েমানুষেরা এসে বাবরের মাকে বোঝাচ্ছেন···কত কথা। আর একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন···মরে গেছে, হয়ত মিনিট দশেক আগেও তার দেহে শ্বাস ছিল ; যদি আর একটু আগে তাঁকে খবর

দেওয়া হোত ! একটা মেয়েমানুষ রশীদের চোখ মুখ জিব নানাভঙ্গীতে দেখে বলল ; ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে। তারপর তার বুকে মাটি রেখে অনেক কিছু অনেক ব্যাপার করল ; কিন্তু রশীদের স্থির ঠাণ্ডা শরীর, তার পাষাণ মুখ তখনও প্রসন্নতার জ্যোতিতে চমৎকার।

তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে একটু অসাধারণ, মাত্র আত্মীয়-স্বজনের বিচারে বেদনাদায়ক। এরকম অপমৃত্যু কত ছেলেরই হচ্ছে, তার সাথে এ পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সম্পর্ক কিসের · কতটা ? অবশ্য কয়েকদিন মা-বাপরা কাঁদে। ভাইরা কাঁদে। মাত্র কয়েকদিনের জন্য পৃথিবী হয়ে ওঠে অশ্রুময়, তারপর হাসি গান আনন্দ —বিস্মৃতি। দুনিয়ার স্বাভাবিক সহজ নিয়ম এই-ই। সুতরাং মা বাপ ভাইদের মর্মন্তুদ বেদনাকে উপেক্ষা করে রশীদ আর চোখ মেলে নাই—মায়ের কোলে আসতে চায় নাই বাপের সান্ত্বনাহীন দুঃখকে ঈষৎ স্তিমিত করতে আর একবারও বা-ব্-বা বলে ডাকবে না, বাবর ভাইয়ার আদর শিশু রশীদকে আর ভুলাতে পারছে না। অভিমানী শিশু অভিমান করেছে সকলের উপর। যেন বুঝেইছিলো রশীদ ঃ সে মারা গেলে কয়েকদিন মাত্র কাঁদবে মা বাপ ভাইরা -তারপর আর কয়েকদিন বাদে তাদের কান্না কমে আসবে, আর কয়েকদিন পরে তাকে এ অপ-রিচিত জায়গায় একা ফেলে রেখে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ সবাই পালিয়ে যাবে, তারপর নিঝ্ঝুম। কেন থাকবে তাদের কাছে রশীদ, যখন এমন ঘুম · এমন মিষ্টি ঘুম ··এমন মধুর ঘুম !

মাস দেড়েকের মধ্যেই সেখান থেকে সাদেক সাহেবরা সব চলে আসেন। যে রশীদের সামান্য ক্রন্দনে সাদেক সাহেব বিচলিত হয়ে উঠতেন, যার একটু আঘাতে মার বুকটা কেমন করে উঠত, যাকে বাবর রফিক খুব ভালবাসত সে রশীদকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সাথীহারা, একেবারে একা ফেলে রেখে সকলে চলে আসছে। সেদিনটা ছিল দুর্যোগময়। বৃষ্টি · ঝড়। ট্রেনটা যখন রশীদের কবরের খুব কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে জানালা থেকে অসম্বরণীয় বেদনায় সাদেক সাহেব আর বাবরের মা চেয়েছিলেন, আর স্তব্ধ বাবরের চোখ দুটো যখন জলে ভরে উঠেছে তখন একেবারে কাছে কোথায় যেন বাজ পড়ল। বাবরের তখন সহসা মনে হয়েছিলো রশীদ মুখটা ভয়ে খুব কাল করে

যেন তাকে ডাকছে—তাকে কোলে নিয়ে চুমো দিতে, বুকের মধ্যে পিষে ধরে মায়ায় মমতায় আদরে তার কচি মন থেকে সে ভয় দূর করে আবার তাকে হাসিয়ে ফেলতে।

*   *   *   *   *

কখন যে আয়শা কাজ সেরে বাবরকে খুঁজতে খুঁজতে কবরস্থানে তার পাশে এসে বসেছিলো জাফরকে নিয়ে! বাবরের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল অঝোরে ঝরে পড়ছে, বাবর আপনভোলা হয়ে কাঁদছে। খুব কোমল মনে নিজের হাত দিয়ে আয়শা বাবরের চোখের জল মুছিয়ে দেয়, মৃদু সোহাগের আরও কোমল স্বরে বলে: আমি বুঝেছি। তার চোখেও জল। বিস্ময়াহত শিশু জাফর বাবরের চুলে একটা টান দিয়ে তার আধা আধা বুলিতে ডাক্‌লে—আ—ব্‌-ব্‌-আ।… তখন গাছের পাতায় পাতায়, বাঁ দিকের পুকুরের জলে, মাঠের মাঝে, ধানক্ষেতে, এখানে সেখানে পূর্ণিমার আলো বন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে, আর একটা পাখী নিকটে কোন এক গাছে বসে চেঁচিয়ে আকুল হয়ে আবার চেঁচাচ্ছে।

বিস্মরণী

একটা পাগলা লোক মারা গেলে, কেন জানি, বহু লোকেরই কাঁদার ভাষা হারিয়ে যায়। বিচিত্র হতে পারে, তথাপি সত্যি যে একটা সুস্থ স্থিরমস্তিষ্ক নিতান্ত চরিত্রহীন হতভাগ্য বদ্‌লোক মারা গেলেও অনেক মানুষের মনেই করুণা জাগে। মৃত লোকটির অতীত দুষ্কর্ম্ম এবং বিবিধ অনাচারের কথা বিস্মৃত হয়ে ক্ষণিকের জন্যও তাদের মন একটা সজল কারুণ্যে হয়ে ওঠে ব্যাকুল। কিন্তু একটা পাগলা লোক মারা গেলে, হোক তার অতীত ইতিহাস সমুজ্জ্বল, প্রতিভার গৌরবে প্রদীপ্ত, তথাপি বেশীর ভাগ লোকই তার মৃত্যুর শোকে বিচলিত হয়না, —কান্না হয় না স্বতস্ফূর্ত।

ওবায়দ মরলই নেহাৎ। বেচারার মৃত্যু হ'ল অত্যন্ত আকস্মিক। দিব্যি সুস্থ মানুষ, হঠাৎ টাইফয়েড হ'ল এবং তিন দিনের জ্বরে গেল মারা। কেউ ভাবে নাই যে ওবায়দ এমন করে মারা যেতে পারে, এত দ্রুত, এমন অকস্মাৎ! কিন্তু ওবায়দ মারা গিয়ে যথার্থই ভাল হয়েছে। তার অসহ্য পাগলামীর পীড়াদায়ক প্রভাব থেকে সে আত্মীয়স্বজনদের মুক্তি দিয়ে গেছে—অফুরন্ত মুক্তি। এবং মরে গিয়ে নিজেও যে সে মুক্তি পেয়েছে এটাও নিঃসন্দেহ। অতএব তার মারা যাওয়াতে কয়েকজন হয়ত ক্ষুব্ধ হয়েছে, কিন্তু সকলেই খুশী হ'ল এই ভেবে যে, সে, মারা গিয়ে মা বাপ আত্মীয়স্বজনদের গুরু-যন্ত্রণাকে অনেকাংশে লঘু করে গেছে। কারণ তার পাগলামী। ওবায়দের মৃতদেহের দিকে চেয়ে তবুও কেউ কেউ কাঁদছে। মা বাপ ভাই বোনেরা ত কাঁদবেই। কেউ কাঁদছে বিনিয়ে বিনিয়ে, দুএকজন করুণ স্বরে, কেউ বা ডুকরিয়ে ডুকরিয়ে। তবে অধিকাংশ লোকই নিস্তব্ধ। হয়ত সহানুভূতিতে কারও হৃদয় উথলিত, হয়ত মমতাময়

সমবেদনায় কারও হৃদয় শিহরিত, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কাঁদছে না, তারা বাহ্যিক সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে ওবায়দের মা বাপ বোনদের সান্ত্বনা দিচ্ছে—সেই মামুলী প্যানপেনে একধরনের সান্ত্বনার কথা। হঠাৎ সকলে স্তম্ভিত হ'ল, সীমাহারা বিস্ময়ে সকলে অবাক হতচেতন হ'ল যখন রোকেয়া এসে অজস্র, সান্ত্বনাহীন, বন্যার মত উদারভাবে কাঁদতে লাগল। উঃ সেকি কান্না! গভীর দুর্বার আন্তরিক ক্ষোভের সেকি বিপুল প্রকাশ! ওবায়দের মৃত্যুতে যাদের মন বিচলিত হয় নাই, বরং যারা খুশী হয়েছিল একটা পাগলা লোক মারা যাওয়ায়, তারাও সে কান্নার মর্মভেদী তীক্ষ্ণতায় ব্যথিত হয়ে উঠল হ'ল ক্ষুব্ধ। একটা পাগলা লোকের জন্য, খুব নিকটাত্মীয় নয় এমন এক সুন্দরী তরুণী, যার স্বামী আছে, ছেলে আছে তার এত কান্না কিসের? ওবায়দের মৃত্যুতে রোকেয়ার এমন কি অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে যাতে তার এ মর্মভেদী কান্নার কোন অর্থ করা যেতে পারে, ঈষৎ শোভন হতে পারে তার এ কান্না? সকলে অবাক! রোকেয়ার স্বামী নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে ক্রন্দনরতা স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে. রোকেয়ার ছেলেটা মায়ের বিরামহীন অজস্র কান্নায় ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে বিরক্তিকর তীব্রতায় কেঁদে ওঠে। খালি ওবায়দের মা বিস্মিত হন নাই—রোকেয়ার এমন অশোভন, বিস্ময়কর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে। বড় ছেলে ওবায়দ পাগলা হয়ে তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং তাঁর অশান্ত হৃদয়কে দগ্ধ করে, পাথর ক'রে দিয়ে গেছে ওবায়দ মারা গিয়ে। উদগত অশ্রুকে গোপন রেখে রোকেয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন: ছি মা, অত কাঁদতে নেই. দেখ আমি ত কাঁদছি না। কিন্তু রোকেয়া বধির হয়ে গেছে—অন্ধ, পাগলা। রোকেয়ার এরকম অদ্ভুত অচেতন ভাব অন্য যে কোন সময়ে বাস্তবিকই হাস্যকর হ'ত। রোকেয়ার সঙ্গে ওবায়দের মাও আবার কেঁদে ওঠেন, তাঁর মাতৃহৃদয় গভীর শোকে অপার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অর্থহীন কান্না, অন্ধ কান্না, কিন্তু ওবায়দের আকস্মিক মৃত্যুর মতই করুণ!

মা বাপ বোনেরা কাঁদেই। রক্তের আকর্ষণ মৃত্যুর মতই অনিবার্য। ওবায়দের মৃত্যুতে আত্মীয় লোকদের মধ্যে খালি রোকেয়া কাঁদছে. আর সকলেই পাষাণ। রোকেয়ার এ নাটকীয় আশ্চর্যকর ক্রন্দনের ইতিহাস আছে।

রোকেয়ার সঙ্গে যে ওবায়দের বিয়ে হবেই তা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। এ রকম অবস্থায় দুজনারই লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া। তবে ওবায়দ রোকেয়াকে লজ্জা করতে দেয় নি। যখন তার খুশী হ'ত রোকেয়াকে নিয়ে সে বেড়াতে যেত, সিনেমায় যেত। ওবায়দের এ বিষয়ে এত উত্তেজনা সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত। অবশেষে বাধ্য হয়ে মা একদিন বললেন তুমি আচ্ছা বেহায়া ছেলে ত, অত কিন্তু ভাল না। সিসোরিয়াণ স্বরে ওবায়দ উত্তর করেঃ রোকেয়াকে বিয়ে করবে তুমি না আমি, আমি তাকে নিয়ে আমার যা ইচ্ছে খুশী তাই করব। ওবায়দের মুখ শিশু-সুলভ চটুলতায় দুরন্ত হয়ে উঠল। আজকালকার দিনে এত কড়াকড়ি করতে গেলে বিপদ হয়। ছেলের বাক্‌চাতুর্যে মাকে পরাভব মানতে হল। ওবায়দ যথার্থই তার মা বাপে ভাগ্যবান ছিল। ছেলেকে সব মা বাপই স্নেহ করেন, তবুও ওবায়দকে তার মা বাপ যে পরিমাণে ভালবাসতেন তা শ্রেষ্ঠ স্নেহপ্রবণ পিতামাতাদের মধ্যেও সুলভ নয়। অবশ্য ওবায়দকে না ভালবেসেও গত্যন্তর ছিল না। কারণ ওবায়দ সেই দুর্লভ শ্রেণীর লোক যাদের সকলেরই ভাল লাগে। বেচারী রোকেয়ার মুস্কিল হয়েছিলো। একদিন সেও বলে বসলঃ তোমার লজ্জা করে না আমাকে একা বেড়াতে নিয়ে যেতে? এ নিয়ে লোকে যে-সব কথা কানাকানি করে ···। উষ্ণ, অসহিষ্ণু কণ্ঠে রোকেয়াকে থামিয়ে ওবায়দ বলল ঃ লজ্জা?—তার ভ্রূ দুটো বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে—তুমি অত মেয়ালী কথা ব'ল না, আমার ভারী হাসি পায়। শুনে রোকেয়া হয় হতবাক!

এমনি করেই দিন কাটছিল চঞ্চল লঘু আনন্দে, চটুল সুস্থ মনোরম পারম্পর্যে। অকস্মাৎ আসন্ন বিচ্ছেদের কারুণ্য আকাশে-বাতাসে মর্মরিত হল। ওবায়দের মা বাবা ঠিক করলেন তার এবার বিলেত গিয়ে বি-এ. পড়া উচিত - কেম্ব্রিজে। অবশেষে একদিন ওবায়দের বিলেত যাওয়ার তারিখ্ নির্ধারিত হয়ে গেল। ওবায়দ নিশ্চয়ই রোকেয়াকে ভালবাসত। তার ভালবাসার মধ্যে ছিল উদ্‌ভ্রান্ত আকুলতা, অশাসনীয় দুর্বারতা। বসন্তের সুনীল স্বচ্ছ আকাশের শুভ্র আলোকের মত তার উষ্ণ মিষ্টি প্রেম। রোকেয়াকে দীর্ঘ তিন বৎসর ছেড়ে থাকতে হবে বলে প্রথমে ওবায়দের মন সুগভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু লীলাকৌতুকময়ী ইউরোপ-সুন্দরীর আবেদন অপ্রতিরোধ্য—সম্ভাবনায়, ইঙ্গিতে ও বৈচিত্র্য-বিলাসের সুনিপুণ সঙ্কেতে যে ইউরোপ গরিমাময়ী, যার সারা দেহে উদগ্র সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত।

পাসপোর্ট পর্যন্ত যখন এল, তখন উত্তেজনার বিভ্রমময় চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে উভয়েরই হৃদয় একটা নিস্তব্ধ প্রগাঢ় বেদনায় প্লাবিত হয়ে উঠল। একদিন ওবায়দের সাথে রোকেয়া বেড়াতে গেল গড়ের মাঠে। অনেকক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা হয়েছে, মাঠের এখানে সেখানে আঁধার ঘনিয়েছে, কোথাও গ্যাসের আলো সবুজ ঘাসে প্রতিফলিত, আলো-ছায়ার নিপুণ খেলায় সারা মাঠ হয়ে উঠেছে মায়াময়। একসময় ওবায়দ চাপা মৃদু কণ্ঠে বলল—না, কলকাতার কয়েকটা আকর্ষণ ছিল। বেশ ভাল লাগে আমার এই শহর। আরও মৃদু করে রোকেয়া বলে—আচ্ছা লণ্ডন কলকাতা থেকে কত বড়?—কলকাতার আটগুণ। লণ্ডনের তুলনায় ত কলকাতা একটা গণ্ডগ্রাম।—আ—ট গুণ—বিস্মিত স্বরে রোকেয়া বলল এবং মনে মনে লণ্ডনের বিশালত্বের ছবি নিল আঁচ করে।—অনেকের মতে শহর হিসেবে লণ্ডন অত্যন্ত বিশ্রী। খালি কুয়াসা, ঘোলাটে আকাশ আর বড় বড় বাড়ীগুলো সব এলোমেলো, তাদের মাঝে না আছে কোন প্ল্যান, না আছে শিল্পনৈপুণ্য। কমার্শিয়াল শহর যেমন হয়—উৎসাহের আতিশয্যে ওবায়দ দ্রুত কণ্ঠে বলে যেতে লাগল—প্যারী, ভিনিস বা বুডোপেস্ট শহর হিসেবে লণ্ডন থেকে সহস্রগুণ ভাল। তারপর হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে—আমার কোন্ শহর সব চেয়ে ভাল লাগে তা তোমায় চিঠি লিখে জানাব, খুব লম্বা চিঠি, সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিস জানতে পারবে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। কিন্তু রোকেয়া ওবায়দের কথায় মন দিতে পারছিল না। একটা সূক্ষ্ম বিষাদে, বিপুল দুঃখে তার মন মথিত হয়ে উঠছে। আচম্বিতে তার মনে দোল লেগেছে অকারণ ব্যথা-বেদনার। রোকেয়া চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে—নানা রঙের ঝলমল করা বাতির সমাবেশে, নারীপুরুষের বিলাসচঞ্চল গতিতে শিহরিত চৌরঙ্গী, চৌরঙ্গী এখন রহস্যরঙ্গিনী; তার রূপের বিপুল সৌন্দর্যে, ধনের বিলাসের কৌতুক-কম্পিত লীলারসের অখণ্ড প্রবাহে চৌরঙ্গী এখন স্বপ্নপুরী। আর নিকটে দূরের গ্যাসের বাতি সব! বিসর্পিত, তমিস্রাবৃত রহস্যমুখর রাস্তা, কাছে দূরে আরও দূরে—যেন তাদের শেষ নাই। ওরা পৃথিবী ছেড়ে কি এক অনির্দেশ্য লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। বিরামহীন গতিতে ওদের চিরন্তন অভিযান। গ্রহ হতে

গ্রহান্তরে তাদের যাত্রাপথ। পৃথিবী-সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য যেন ওদের পাষাণ কায়ায় গ্রথিত। মনকে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দেয় এই রাস্তাগুলো! রোকেয়া অবসাদ-ভরা স্বরে বলল: কলকাতা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? চৌরঙ্গী এত সুন্দর, এদের ফেলে রেখে যেতে তোমার মায়া হবে না? রোকেয়া এমনভাবে কথাগুলো বলছে, এমন আশ্চর্য শ্রান্তির সঙ্গে যে ওবায়দ স্তব্ধ হ'ল। ওবায়দ বিমূঢ় হ'ল রোকেয়ার এমন কথা শুনে। চৌরঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ওবায়দ স্বপ্ন দেখছিলো আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের, স্প্রী নদীর; ওবায়দ মনে ছবি আঁকছিলো টেমস নদীতে কুয়াসার, এবং রউন বুডাপেস্ট ভিনিসের। হঠাৎ রোকেয়া এসব কথা এমন ভাবে বলল! একটু অনুতপ্ত স্বরে, ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ওবায়দ বলল: সত্যি কলকাতা ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হবে তোমাকে ছেড়ে [illegible] যেতে—আমার মিষ্টি শাহজাদীকে। শেষের দিকে তার গলাটা কান্নার মত কেঁপে উঠল।—সত্যি! [illegible] একথা বলে রোকেয়া [illegible] রইল। তার [illegible] ঝিকমিক করছিলো তা কিন্তু ওবায়দ টের পায় নি।

তার একদিন [illegible] কে জানে, ওবায়দ আর রোকেয়া হেঁটে বেড়াচ্ছিল। [illegible] নিবিড় পাতাতে ভরা অখ্যাত রাস্তা সব। এসব [illegible] নিস্তব্ধ [illegible] কোন অসংলগ্ন মুহূর্তে [illegible] কারণহীন পুলকে [illegible] করে তোলে! আকাশে মেঘ জমেছিলো—নিকষ কালো মেঘ। রডন স্কোয়ারে পৌঁছতেই বৃষ্টি নামল। বাতাস অনেকক্ষণ ধরে দোলা দিচ্ছিল শহরের ছোট বড় গাছকে। [illegible] বাড়ল, প্রমত্ত গতিতে বাতাস বেড়ে চলল। আসলে ঝড় নয়, কিন্তু বাতাসের সুতীব্র বেগ ক্রমেই হয়ে উঠেছে দুঃসহ। এক রকম দৌড় দিয়েই তারা গিয়ে উঠল [illegible]। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, গাছগুলো নড়ছে, [illegible] দুলছে, বাতাস শন শন করছে, বন্ধনহারা দ্রুত ক্ষিপ্ত গতিতে বাতাস বিক্ষিপ্ত হয়ে শহরকে বিভ্রান্ত বানিয়েছে। আর ছোট ছোট ফুলের গাছ, বন্য ফুলের গাছ, ঘাসশ্যাওলা সমস্ত কিছু নিমেষে ভিজে উঠে একটা অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধের সঞ্চারে সমস্ত স্থানকে আমোদিত করে তুলছে। নাকে শিহরণ জাগায় ওসব গন্ধ, ওগন্ধে আছে ইঙ্গিত, আছে উষ্ণ স্বপ্ন, ওগন্ধে মেশানো রয়েছে কোমল, মমতা-

আর্দ্র স্নেহ। আর স্কোয়ারের উত্তর দিকে তিনচারটে বড় বড় লাল বাড়ী। অবিরাম বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ঝাপটায়, বাতাসের দুর্দম ভীতিপ্রদ কোলাহলে অবাস্তব ঠেকছে অদ্ভুত ঠেকছে অপার্থিব ঠেকছে ওসব বাড়ী। মিট-মিট করে আলো জ্বলছে। ইউরোপীয়ানদের ডিউক লণ্ডনের ক্যাসেল্‌স্ এর মত স্বপ্নীয় ভৌতিক ওদের চেহারা। স্কোয়ারের ওপাশের দৃশ্য হয়েছে বিচিত্র, পাষাণ-রহস্যে স্থির নিষ্কম্প। আসন্ন দুর্ঘটনার চঞ্চল প্রতীক্ষায় ওখানকার আবহাওয়া বীভৎসভাবে শান্ত। ওবায়েদের চোখের পলকে আবার লেগেছে স্বপ্নের ছোঁয়াচ। এই সব ক্যাসেল্‌স্ এ বিস্ময়কর, চাঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চকর কত ব্যাপারের কলরব! বর্বর নিষ্ঠুরতার কাহিনীর অবতারণা! ওবায়েদের মন প্লাবিত হয়েছে গ্রহাতীত আনন্দ ও বিস্ময়ে।... এক সময় বৃষ্টি থামল। তা'রা যখন বাসার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে, নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে রোকেয়া বলে উঠল—আমায় এখানে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার একটুকুও কিছু হবে না? আমায় তুমি ভালবাস না, কিছু না, একেবারে না। এবার কিন্তু ওবায়েদ প্রতারিত হয় নাই। সে দেখল যে রোকেয়ার চোখে উষ্ণ জল টল টল করছে। কিন্তু এমন স্বার্থপর কেন রোকেয়া? তার বিলেত যাওয়া নিয়ে রোকেয়ার এ কি 'অর্থহীন আচরণ? রোকেয়া কি খুশী হতে জানে না? শেখে নাই সে নিজের দুঃখের সাথে অপরের সুখ মিশিয়ে দেখতে? রোকেয়া ওবায়েদের মনকে মিছে মিছি শঙ্কাকুল করে তুলল। তুমি যদি বল,—ওবায়েদ আহত অভিমানের স্বরে বলল তা হলে আমি বিলেত যাওয়া বন্ধ করে দেই।

রাত্রি প্রভাত হল। আজকে ওবায়েদের বিলেত যাওয়ার দিন। দিনটা অদ্ভুত। ভোরে সূর্য উঠেছিল সোনার থালার মত, আকাশ ছিল প্রগাঢ় নীল মনোহর স্বচ্ছ। উজ্জ্বল প্রফুল্লতার উষ্ণময় প্রভাতের রক্তিম বীজে স্বপ্নায়িত। তারপর মেঘের আকস্মিক সঞ্চারে সারা আকাশ কালো হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এত গাঢ় হয়ে পৃথিবীর বুকে আঁধার ঘনিয়ে আসে যে, কাল মৃত্যুর মত আবেশ আসে আর ভয়। আবার সহসা মেঘ বাতাসে ভেসে যাওয়াতে আকাশ এত গভীর নীল হয়ে ওঠে যে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, এটা বসন্তকাল। আর বাতাসও ক্ষণে ক্ষণে খেয়ালী হয়ে উঠেছে। এক সময় খুব মৃদু কোমলতার শিহরণে অত্যন্ত নম্র হয়ে শরীরকে ব্যাকুল রহস্যে স্পর্শ করে, আর

ঠিক তার পরে বাতাসের গতি এত উন্মাদ দুরন্ত হয়ে ওঠে যে; মনে হয়, ঝড় বুঝি আসন্ন।

রোকেয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কিন্তু ওবায়দ চোখের জল গোপন রাখতে পারে নাই। ওবায়দের চোখে অমন জল দেখে রোকেয়ার মন ব্যথার নিপীড়নে আর একটু হলেই স্থবির হয়ে যেত। সে অশ্রুর ভাষা কি মর্মন্তুদ! বিদায়কালের দৃশ্য রোকেয়া তার জীবনে হয়ত কখনও ভুলবে না। ওসব জিনিস অনেক লোকেই ভুলতে পারে না। প্রথম ঘণ্টা যখন পড়ল, রোকেয়ার বুক খান খান হয়ে গেল বেদনার আঘাতে, নিঃশ্বাস তার অবরুদ্ধ হয়ে আসছে, হৃদয় কাঁপছে সহনাতীত ক্ষোভে। চোখের উষ্ণ অফুরন্ত অশ্রুকে কোনমতে সামলে রেখেছে রোকেয়া। বিদেশ যেতে ওবায়দের দুঃখ হচ্ছে, সুখও; তখন তার মনে দোল লেগেছে, রঙ্ লেগেছে; তখন তার মন স্থগিত বিষাদে ভরপুর। দ্বিতীয় ঘণ্টা যখন পড়ল তখন একটা ব্যাকুল হতাশায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন কি একটা ঘনিষ্ঠ প্রিয় বস্তু সে হেলায় হারিয়ে যাচ্ছে, এত অবহেলা করে ফেলে যাচ্ছে যাতে ভয় হয় হয়ত এ জিনিস আর সে ফিরে পাবে না। বিদেশিনী তার রূপরসগন্ধশোভিত নিটোল দেহের লাবণ্যকম্পিত সুন্দর অভিব্যক্তি দিয়ে যখন তার কল্পনাকে প্রলুব্ধ করছিল, সাথে সাথে এক পরিচিতা সুন্দরীর নিষ্কম্প স্তব্ধ মুখ তাতে মিশে গিয়ে অপরিসীম আলোড়নে তার মনকে নিপীড়িত করে তুলছিল।

শেষে বম্বে মেল সকলের অতি প্রিয় বাংলাদেশ ছেড়ে অজানার অভিমুখে ধাবিত হ'ল। তার কোলে কত মাটির মানুষ আর তাদের স্বতন্ত্র স্বপ্নের সমারোহ!

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়েই আকাশের দিকে চেয়ে রোকেয়া একেবারে অবাক! মেঘ কখন পাতলা হয়ে আকাশে জন্ম দিয়েছে মলিন চাঁদের। আকাশ নয় নীল বা শুভ্রতার প্রাচুর্যে ঝলকপ্রদ। একটা মন্থরমদির বিষণ্ণ ভাব সারা আকাশ ছেয়ে। আকাশে ঝাপসা সোনালী রঙ। বিষাদ-মলিন মাধুরীতে রাত্রির আকাশ কুহকমণ্ডিত। মেডিটরেনিয়ান, রেড সী ও সুয়েজের ওপারের মহিমোজ্জ্বল সঙ্কেত নিশীথের আকাশে নিপুণ মায়ায় গ্রথিত।

কষ্ট হয়েছিল রোকেয়ার। দীর্ঘ তিন বৎসরের জন্য ওবায়দ বিলেত গেল তাকে এখানে একা রেখে—সাথীহারা। দুঃখ হবেই ত

রোকেয়ার। আকাশে যেমন দুটো পাখী উড়ে বেড়ায়—সর্বদাই একসঙ্গে সুনীল বিশাল আকাশের চারদিকে তারা উড়ে উড়ে বেড়ায় যখন থেকে তাদের পাখায় ভর এসেছে। দুটি বন্ধু। হঠাৎ কোন নির্মম শিকারী যদি একদিন তাদের মধ্যে একজনের বুক তীর দিয়ে বিঁধে ফেলে, মেরে ফেলে, তবে অন্য পাখীর দুঃখ হবে না? আগেকার মত অফুরন্ত আনন্দে উচ্ছল স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসে কি সে সাথীহারা পাখী দিগন্তব্যাপী আকাশ পরিভ্রমণ করতে পারে? কিন্তু যে পাখী নিষ্ঠুর শিকারীর তীরে মারা গেল সে হয় ত সুখেই আছে. হয় ত বা ভুলে গেছে তার অতীত দিনের বন্ধুকে।

ওবায়দ তাকে চিঠি লেখে—লম্বা লম্বা চিঠি। ছুটীর সময় ইউরোপের অনেক জায়গায় সে বেড়াতে যায়। সে সব শহর গ্রামের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা তার চিঠিতে। তারুণ্যের তপ্ত ভাববিলাসে তার চিঠি বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। একটা চিঠিতে সে লিখেছে—

এখন এ কথা ভাবতে আমার খুব দুঃখ হয় যে আমি ভাল লিখতে পারিনা। আমি সমস্ত জিনিস দেখছি শিল্পীর দৃষ্টিতে, অনুভব করছি কবির মত। প্রগাঢ় দরদে আমার মন আচ্ছন্ন, কিন্তু আমি লিখতে শিখি নাই। আমি প্রকাশ করতে অক্ষম আমার কল্পনার ব্যাপকতাকে, আমার আশ্চর্য দরদকে, আর আমার সেই শোকময় বিহ্বল আনন্দে ভরা ভাবকে—Had I the wings of a dove·· সীন নদীতে যখন সূর্যাস্ত হয় তখন প্যারী দেখতে কেমন তুমি ভাবতে পার? আর টেমস নদীতে কুয়াসা? কলোনের গির্জা দেখে তুমি খালি ব্যাকুল অভিভূতই হতে পার। ভিনিসের গণ্ডোলা আর ক্যানেল। আমি বলি ইউরোপে যদি কেউ আসে তবে একবার যেন সে বুডোপেস্ট দেখে যায়। অবশ্য ফ্লোরেন্সও আমার খুব ভাল লাগে। আর ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শহর ব্রাসেলসও মন্দ নয়। তারপর হিডেলবার্গ আছে, বউন আছে যেখানে বিঠোভেনের জন্ম, আর আছে ব্ল্যাক ফরেস্ট। প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি দেখতে চাও একবার জার্মানীর রাইণ প্রদেশ বা সুইটজার-ল্যাণ্ডে যেও, যদিও অনেকে বলে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিতায় স্কটল্যাণ্ডের তুলনা নেই।·· একদিন আমি আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের কাছ দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম সন্ধ্যার দিকে। আমি বোঝাতে পারব না আর তুমিও বুঝবে না কি আকাশ-বিসর্পিত আনন্দে আমার মন সে সন্ধ্যায় ভরা ছিল। তারপর উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে প্যারীর

চওড়া, নিবিড় কালো স্বপ্নবন্ধ রাস্তা দিয়ে বেড়াবার সময় আমার মনে এল আকাশের অজস্র রঙ, গাছের গভীর শ্যামলিমা আর উত্তাল প্রমত্ত বন্য কম্পন। সে সন্ধ্যা অপরূপ হ'ত, স্বর্গীয় হ'ত, আনন্দ-শিহরণে তুলনারহিত হ'ত যদি সঙ্গে তুমি থাকতে, থাকতে সাথে আমার শাহজাদী। এমন অবস্থায় মরতেও ভয় হয় না বা ঈষৎ ক্ষোভ। এ নিয়ে শেলীর একটা কবিতা আছে, না?

তাদের মত অনেকেরই প্রেম। পৃথিবীর আদিকাল হতে যুগ যুগ ধরে সংখ্যাহীন নরনারী পরস্পরকে এমন, এর চেয়েও বেশী উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনায় ভালবেসে এসেছে। রোমিও জুলিয়েটকে শেক্সপীয়ার অমর করেছেন। বিয়াত্রিসকে না পাওয়ার দুঃখে দান্তে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। আরও কত কি। প্রেমের উষ্ণ ফেনিল মাদরা পান করে শেলী অন্ধ, মজনু পাগল।...পৃথিবীতে ত আছেই প্রেম। আকাশ যখন মেঘের সমারোহে আবেশে ভেঙে পড়ে তখন বন্য ফুলের মধ্যাহ্ন স্বপ্নের আকুলতা কজন বোঝে, নিশীথের একান্ত গোপনতায় ঊর্ধ্বায়িত দৃষ্টিতে যখন চাঁদের দিকে বাকহারা বিস্ময়ে পৃথিবী চেয়ে থাকে—সমুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল—তার মর্মরিত ভাষা নিজেদের মধ্যে অনুভব করে কজন?

জানি, পৃথিবীতে প্রেমের অম্লান মহিমা সর্বজনীন। তবে এ প্রেম-কাহিনীর পরিণতিই মাত্র অসচরাচর, ভিজে ফুলের ইঙ্গিতের মতই সকরুণ। যেমন ক'রে লোকে সব জিনিস জানতে পারে রোকেয়া আচম্বিতে একদিন বজ্রাহত হয়ে শুনল ওবায়দের মাথায় কেমন গোলমাল ঢুকেছে, সন্দেহজনক বিকৃতি। নিঃসন্দেহ রোকেয়ার জীবনের সে মুহূর্ত পরিপূর্ণ দুঃখের। সে মুহূর্ত বাস্তবিক অতুলনীয়—ক্ষোভের নিবিড়ত্বে, হৃদয়বিদারক বেদনার বিপুল সমন্বয়ে এবং রুদ্ধ অসহায় অভিযোগের গোপনতায় অনুপম। সে মুহূর্ত বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র্যে, অসামান্য অসচারচরত্বে অতুলনীয়। পৃথিবীর শক্তিহীন মানুষের জীবনে করুণাময় বিধাতার হৃদয়হীন শরনিক্ষেপে রোকেয়ার জীবনের সে মুহূর্ত অনবদ্য—নিপীড়িত কাঠিন্যের একটা কবিতা।

তারপর একদিন ওবায়দ ফিরে এল—তার দেশে, মা বাপ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাগল হয়ে ফিরে এল। নিজের আপন লোকদের জীবনকে বেদনার দুঃসহ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে একদিন ফিরে এল রোকেয়ার প্রেমিক, মা বাপের খুব আদরের বড় ছেলে, যে ছেলের

অতীত জীবন গৌরবমণ্ডিত। রোকেয়া একদিন ভয়ে ভয়ে গেল ওবায়দের বাড়ীতে। তাকে দেখে ওবায়দ হতভম্ব হয়ে বসল, তার স্বরে বিহ্বলতা করুণভাবে ফুটে উঠেছে - তুমি কোথা থেকে এলে— তারপর কি যেন ভেবে—না কোন জায়গা থেকে এলে? দীর্ঘ দুই বৎসর পরে এই প্রথম ওবায়দকে দেখে হঠাৎ কান্নার কথাবেদনা-মদিত শাক্তগোর আক্রমণে রোকেয়ার মন বন্য কম্পনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওবায়দ অমন করলে, অমন করে তার দিকে চাইলে রোকেয়া কেঁদে উঠবে, রোকেয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বুক ছেড়ে কেঁদে একটা চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করে বসবে। ওবায়দ একসময় আপন মনে বলল: আমি বাংলাদেশের গভর্নর হব দেখো, প্রথম ভারতীয় গভর্নর, ব্যাকিংহাম প্যালেসে আমি পঞ্চম জর্জের সাথে হ্যাণ্ডশেক করেছি—তোমার বাবার সুযোগ ছিল করার? এই বল ইয়েস ইয়োর এক্সেলেন্সী আচ্ছা আমি দারোগা হলে কেমন হয়, আমায় নেবে? (রোকেয়া ততক্ষণে সামলিয়ে নিচ্ছে। কোমলকণ্ঠে বলল: নেবে না আবার, খুব নেবে। না তুমি একেবারে বোকা, আমায় নেবে না; কেন নেবে না জান, আমার মাথা খানিকটা খারাপ হয়ে গেছে কি না! রোকেয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল, দ্রুত বিক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল: কেন তোমার মাথা খারাপ হল? ওবায়দের মুখটা কোমলতায় নরম হয়ে উঠেছে, তার মুখে একটা স্মিত ভাব; বলল স্বাভাবিক স্বরে, অসহায়তাভরা করুণ আবেদনের স্বরে: তোমার আর মার জন্য মনটা কেমন করত, তোমাদের জন্যই ত আমি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম। রোকেয়া বোবা স্তব্ধ বজ্রাহত হয়ে গেছে, রোকেয়া পাষাণ!

বলতে গেলে এক রকম রোকেয়াই দায়ী বৈকি ওবায়দের মাথা খারাপ হওয়ার জন্য। তার বিলেত যাওয়ার সময় ওবায়দের মনে যে সংশয়ক্ষুব্ধ ব্যথা সে এঁকেছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে বর্ধিত হয়ে পল্লবিত হয়ে একদিন তার মাথায় তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল— ফলে ওবায়দ হল পাগল।—তাদের কথা ভেবে ভেবে, নিরন্তর তাদের কামনা ক'রে। বিদেশের নির্মম আবহাওয়ায় নিষ্পিষ্ট হয়ে;— ভাবনায় জাগরণে, অর্ধচেতনায় তাদের সর্বতোভাবে পাওয়ার দুর্বার ইচ্ছায়! ক্ষত-বিক্ষত, চূর্ণায়িত প্রত্যাশায়! এত বিষাদমাখা, এত করুণ!

এ মহিমময়ী ধরিত্রী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। এ পৃথিবীতে ফুটবে ফুল, আকাশে রঙ তেমনি করে গলগল করবে উদগ্র সৌন্দর্যে। সীন নদীতে হবে সূর্যাস্ত, গাইবে পাখী, উত্তাল আনন্দের সঞ্চারে; সঙ্গীত-চঞ্চল দুর্বার উন্মত্ত উল্লাসে এ পৃথিবীতে নিত্য বিভ্রাট বাধবেই।

সত্যি সত্যিই রোকেয়ার খুব কষ্ট হয়েছিলো অনেক দিন ধরে। গাছ থেকে ফুল ঝরে, আবার জন্ম হয় মুকুলের। রোকেয়ার বুকে কি ঝরা ফুলের বিষাদ অক্ষয় হতে পারে, হতে পারে চিরন্তন? শিশু মুকুল প্রকৃতির অকৃত্রিম স্নেহে লালিত হয়ে একদিন ফুটবেই ফুল হয়ে। স্বচ্ছসৌন্দর্যে চিত্তহারী।...রোকেয়াও একদিন বিয়ে করল, তার ছেলেও হয়েছে একটা। আদর্শ সংসার।

ওবায়দের মারা যাবার দুদিন আগে। রাত্রি অমাবস্যা। পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আঁধার, নিরুপম সুপ্তি। রোকেয়ার স্বামী ক্ষমাহীন বিদ্রূপের স্বরে তাকে বলল: ওবায়দ বেচারা প্রলাপে তোমার নাম ডাকছিলো। তুমি গেলে, তার সেবা করলে সে নাকি বাঁচতে পারে। তুমি যাবে? যাও না বেচারাকে বাঁচিয়ে তুলতে। বাইরের গাঢ় কঠিন আঁধারের দিকে ছলছল চোখে চেয়ে, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রোকেয়া ভাবল: মানুষরা এত নিষ্ঠুর কেন? কেন?? কেন???

কিন্তু রোকেয়া ভুল করেছে। আজকে যখন ওবায়দ মারা গেল তখন তার কাঁদা ঠিক হয় নাই। এ পৃথিবীতে কাঁদার একফোটাও মানে হয় না। পৃথিবী সুন্দর, প্রকৃতি শোভাময়ী, সেখানে কান্না কেন? লোকে কেন কাঁদে? প্রকৃতি সবুজ, প্রকৃতি নবীনা, চিরযৌবন-রসে প্রকৃতির তনু অনুপম; নিজে যুবতী হয়ে রোকেয়া এত কাঁদছে কেন? মারা যাওয়া কিছুই না, লোকে মরেই। রোকেয়া যদি হাসে! ওবায়দের মৃত্যুকে বন্দনা করে যদি তার মুখে দুরন্ত হাসি ঝকঝক করে ওঠে। না রোকেয়ার আজকের এ উচ্ছ্বসিত কান্নার মানে হয় না কিছু। কারণ, হে সুন্দরী, কান্না নয় চিরন্তন।

রাজধানীতে ঝড়

কয়েকদিন হল আকবর দিল্লীতে এসেছে ; উদ্দেশ্য আই-সি-এস দেবে। হোটেল খুঁজবার হয়রানীতে কয়েকদিন যাচ্ছে-তাই-ভাবে কেটেছে, বেড়াবার কোন সুবিধাই পাওয়া যায়নি। সাথীও নেই আর আলস্যও অনেকটা গোলমাল লাগিয়েছে এ-সব ব্যাপারে। হঠাৎ আকবর একদিন সচেতন হল : আলস্যকে দেহ অধিকার করতে দেওয়া পাপ। এমনি করলে আই-সি-এস-এ নিশ্চয়ই তার সফল হবার আশা কম। সুতরাং আকবর স্থিরসিদ্ধান্ত করল : আজকে দিল্লীর কোন দ্রষ্টব্য বস্তু সে দেখতে আর বাকী রাখবে না।

কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল বিকেলের দিকে। পুরাতন দিল্লীর একটা চলনসই হোটেলে আকবর থাকত। হোটেলের জানালা দিয়ে পশ্চিম দিকের পরিষ্কার নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, সেদিকে চেয়ে আকবর কিছু একটা ভাবছিল হয়ত। কিন্তু অন্য সব দিকে কখন যে কালো মেঘ উঠেছে সে খেয়াল তার ছিল না। হঠাৎ এদিকটা আঁধারে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে তার ভাববিলাসিতার ব্যত্যয় ঘটল। তারপরে খানিক বাদেই ঝড়—উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল। সে ঝড়ের প্রচণ্ড দুর্দমতায় হয়ত বাদশাহ্‌দের রাজধানীর কোন বাক্যহীন ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।

আকবর অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করছে বাতাসের মাতলামি। গাছগুলো উপড়ে যাবে যেন! আর গাঢ় আকাশে বিদ্যুৎবহ্নির সাথে সাথে সে কি প্রলয় হুঙ্কার—কড়কড়ানি! আকবরের হৃদয়ে উত্তাল উদ্দামতা এসেছে, হয় ত ঝড়েরই প্রলয়-ছন্দ। শেষে ঝড় থেমেছে। আকাশ খানিকটা পাতলা হল, বিদ্যুৎ চমকালেও শব্দ হয় কম। বাতাসের মত্তবেগ শান্ত, অনেকটা নম্র রূপ নিয়েছে। আকবর আবার প্রস্তুত হল। এ-ঝড়ের মধ্যেই সে বেরুবে, তাতেই অভিনব আমোদ। ঝড়ের মধ্যে বাস্তবিকই এক সঞ্চরণশীল তুমুলতা আছে।

আশ্চর্য আকবরের সঙ্কল্প! এ-অবস্থাতেই সে বেরিয়ে পড়ল। আকাশের চেহারা আশাদায়ক। ফোর্ট আজকে আর দেখা হবে না। এক্কা চাঁদনী-চকের দিকে ছুটেছে, আর সঙ্কল্পের বিরাট মূর্তি নিয়ে তার মধ্যে বসে আছে আকবর। চাঁদনী-চকটা কলকাতার মিশুসে স্ট্রীটের মত, মিশুসে স্ট্রীটের পরিচ্ছন্নতা নেই। জুম্মা মসজিদের বিরাট গম্বুজটা বকুনি-খাওয়া ছেলের মত মনে হচ্ছে মেঘাবৃত আকাশের নীচে। আকবর চলতে লাগল — তারি [illegible] শ্রী জায়গা—[illegible]লোকের মত চলা অতিরিক্ত অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। চলতে চলতে হয়ত আরও অনেকদূর যেত, কিন্তু কাঁধে কার হাতের স্পর্শ! চমকে ফিরে দেখে সে আরও বেশী চমৎকার। পাঁচ বৎসরের ব্যবধানেও রহিমের চেহারা বদলায়নি, লাল হয়েছে গাল দুটো। বন্ধু রহিম। আকবর অবাক হল।

অনিবার্য কয়েকটা কথা শেষ হবার পর আকবর বলল: বাহ্, কোথায় থাক এখানে তুমি?

এখানে নয়, বাড়ি দিল্লী, [illegible] রেডিং রোড, নিউ দিল্লীতে। রহিম ব্যগ্র কণ্ঠে বলল: চল না আমাদের ওখানে তুমি? হোটেলে থাকাটা বিশ্রী ব্যাপার।

এখনও মুখ ফুলিয়ে কথা বলে রহিমের গালে টোল পড়ে।

সে পরের কথা, হয় তোমাদের ওখানে এক সময়। এখন বেড়াচ্ছি।

আকবরের সে অদ্ভুত খামখেয়ালীতা এখনও রয়েছে। চেহারাতেই টের পাওয়া যায় না। অবশেষে অনুরোধ করে রহিম বলল: নিশ্চয়ই যেও যেন, ভুল না। মা দেখলে তোমায় খুব খুশী হবেন। বলে অগত্যা যেতেই হোল রহিমকে। আর সাথে সাথে আবার ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ — সেই অনবরত অর্থহীন বৃষ্টি!

বজ্রের শব্দে কান বধির হয়ে যাচ্ছে। মনের পর্দায় তার আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত বিপজ্জনক। আকবরের এক সময়ে মনে হল: ফিরোজা সত্যিই কত বড় হয়েছে, কে জানে? ফিরোজা কি আছে দিল্লীতে? হয়ত বা বিয়েই হয়ে গেছে এতদিনে। এ বিরামহীন বৃষ্টিতে এ-সব ভাবতেই বিচিত্র মধুর লাগছে। রহিম-ভগ্নী ফিরোজার সব কথা এখনও এমন আশ্চর্য পরিষ্কারভাবে তার মনে পড়ে। বৃষ্টির অনাবশ্যক শাসন আকবরের দিবাস্বপ্নকে আঘাত করল। তাই ত! দিল্লীতে এমন বৃষ্টি! দিল্লীকে অবলম্বন করে ভাবপ্রবণ আকবরের মনে যে

কাপড় বদলিয়ে আকবর এল মার কাছে। যতক্ষণ না রহিমের বাবা এলেন সে-সময় পর্যন্ত মার কথার স্রোত থামেনি! যদিও স্বভাবত কথাচোরা আকবরের সে-সব কথা শুন্‌তে মন্দ লাগেনি; কারণ আড়াল করে ফিরোজা দাঁড়িয়েই ছিল।

মিঃ মনসুর বললেন ঃ কে, আকবর না?

জ্বী আকবর কদমবুসী করল।

সমস্ত বিবরণ শুনে মিঃ মন্‌সুর বল্‌লেন ঃ পাগল নাকি! হোটেলে নামলে কেন? তোমার বাবা ত' আচ্ছা লোক একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না! মিঃ মন্‌সুরের স্বরে অনির্দেশ্য বেদনা ছিল।

আকবরের সাথে সকলেই নানা প্রকারের কথা বল্‌ছে, কিন্তু ফিরোজা এমনকি বোধহয় কোন সম্বোধনই করেনি তাকে। এ অন্ধকার রাতের শীতল হাওয়ায় রহিম ও আর সকলের কথা শুন্‌তে আকবরের খুবই ভাল লাগছে, কিন্তু সব জিনিসের গোপনে ফিরোজার নিস্তব্ধতা তার মনে কেমন এক মধুর বেদনার সৃষ্টি করছে। ফিরোজা এত সুন্দর, এত প্রার্থিত ঠেক্‌ছে আকবরের নিকট।

ভাত খাওয়ার সময় মিসেস্ মন্‌সুর নিজে বসে বহু যত্ন সহকারে আকবরকে খাওয়ালেন। আর সকলেও ছিল। তবে ফিরোজা স্বীকৃত হয়নি আকবরের সাথে খেতে। অপরিসীম লজ্জা তাকে আঁকড়ে ধরেছিলো। খেতে খেতে মিঃ মন্‌সুর আকবরের আই-সি-এস দেওয়া সম্বন্ধে বহুকথা বললেন।

হঠাৎ মিসেস্ মনসুর বললেন ঃ যদি পাস কর তবে বুঝি তোমায় এক বৎসর বিলেতে থাকতে হবে?

জ্বী, মেষের মত নিরীহ স্বরে আকবর উত্তর করল।

কিন্তু বিলেত না গেলেই নয়? মিসেস্ মনসুরের স্বরে অতিরিক্ত ব্যগ্রতা ছিল।

জ্বী না, খানিকটা হেসে আকবর বলল ঃ যেতেই হবে।

মিসেস্ মনসুরের মুখটা শুকনো ঠেকছে! নিভৃতে রহিমকে আকবর বলল ঃ বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে যে ওঁর এত উৎকণ্ঠা?

ওঃ, তার এক পাগলামী আছে, আমার এক খালাত ভাই বিলেত গিয়ে পাগল হয়ে এসেছে। তাই ওঁর মাথায় ঢুকেছে যে যেই বিলেত যাবে···আকবর চমৎকার ভাবে হেসে রহিমকে কথাটা সম্পূর্ণ করতে দিল না!

কিন্তু রাত্রে যখন শুল আকবর, বালিশের গন্ধটাই যেন তাকে আকুল করেছে—হয়ত কোনদিন ঐ বালিশই ফিরোজা মাথায় দিয়েছে, আর বর্ষা-ঘন রাতের এ সুনিবিড় গোপনতায় মিসেস্ মনসুরের তার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ অত্যন্ত অর্থময় মাধুর্যে সিক্ত হয়ে তার মনে কোমল খোঁচা দিতে লাগল।

বর্বরতা আকবর করতে পারে না। স্নেহপূর্ণ অনুরোধ এঁদের মানতেই হয়, যদিও এর সাথে জড়িয়ে আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। হপ্তা খানেক আছে মাত্র আই-সি-এস-এর। এ কয়দিন আকবর এখানেই থাকবে ·সকলের বিশেষ অনুরোধ। একদিন গত হল। সকলের সদয় বিবেচনা এমন তৃপ্তিদায়ক! সত্যি খুব ভাল লোক এঁরা! আকবর সবদাই আশা করছে, ফিরোজার সাথে কথা বলার উপযুক্ত সুযোগ হয়ত সে পাবে। এমন প্রবলভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছে ফিরোজা যে আকবর তার সম্মোহনকারী প্রভাবে একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। এই কতকালের চেনা ফিরোজার মুখে এবং হাব-ভাবে কি দুর্বোধ্য রহস্যের আবরণ এসেছে। আকবরের যদি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকত! যদিও সে ইচ্ছে করলে যে-কোন সময়ে ফিরোজার সাথে কথা বলতে পারে তবে সে-রকম কথা অত্যন্ত খাপছাড়া হ'ত।

মিসেস্ মনসুর বাংলাদেশ কবে ছেড়েছেন তা নিয়ে গুরুতর গবেষণা করা যেতে পারে এবং তাঁর অর্ধ-দিল্লী অর্ধ-সিমলা দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছে হলেই মিসেস্ মনসুর একা বেড়াতে যেতেন, কোন দিন বা ফিরোজার সাথে। বাংলাদেশের অবলা নারী ন'ন মিসেস্ মনসুর।

সেদিন আকবরকে ডেকে বললেন: চল, আমাদের সাথে বেড়াতে যাবে।

নিঃসন্দেহে সে-সময় আকবরের মাথা ঘুরছিলো। তোৎলিয়ে সংক্ষেপে বলল: আচ্ছা।

সন্ধ্যার দিকে সুন্দর হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রেডিং রোডের পাশেই কিংস্‌ওয়ে সোজা চলে গেছে একেবারে ভাইস্‌রয় হাউসে। চমৎকার সোজা রাস্তা, একেবারে মাপ করা। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং সব এ-রাস্তায়। ভাইস্‌রয় হাউসটা দেখবার মত বাড়ী। ফিরোজা

ত ভাল সেন্ট মাখে। তার রহস্যনিবিড় গন্ধ আকবরকে আকর্ষণ করছে। স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করছে আকবরের।

মিসেস্ মনসুর বললেন: তোমাদের কলকাতা ভারি বিশ্রী শহর। নিউদিল্লী দেখেছ? আকবর তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল। ফিরোজা মুখ লুকিয়ে হাসছে। বেড়িয়েছে তারা অনেক, মহারাজা নওয়াবদের সুন্দর প্রাসাদগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবুও নিউদিল্লী অত্যন্ত ছোট শহর—রাজধানীর পক্ষে হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র। তারা যখন বাসায় ফিরল, তখন সন্ধ্যার নম্র চিন্তায় আকবরের মন ভরপুর। তৃপ্তিতে তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আকবরের মনে রঙ ধরেছে।

ফিরোজার জীবনে ঝড় এলো। একেবারে ভাল লাগে না দিল্লী ফিরোজার, আর আকবর এসে তার বেদনামিশ্রিত হতাশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে সহস্রভাবে। চঞ্চলতা বয়ে এনেছে অন্তরে। তার প্রবাস-জীবনকে এমন [illegible], এমন অর্থহীন, এমন বেদনাদায়ক ভাবে ফিরোজা আর কখনও দেখেনি। আকবরের [illegible] তাকে নতুন স্বপ্ন দিয়েছে। ফিরোজা আকবরের সঙ্গে [illegible] সে কথা বলতে লাগল। [illegible] উভয়ের [illegible]। ও স্বচ্ছ হয়েছে। কুয়াশার কোন আবরণ তাদের এখন বাধা দেয় না। ফিরোজা আবার পুরানো হয়ে উঠেছে। দিল্লীর কলেজের ছাত্রী ফিরোজা নয়। নাগপুরের ফিরোজা। [illegible]। [illegible] হয়ে উঠেছে আকবরের। ফিরোজা অনেক কিছু শিখেছে। জিনিস জানবার আগ্রহ তার মধ্যে প্রচুর। ফিরোজার সাথে কথা বলে মনেরও তৃপ্তি হয়।

তখন রুশ-ফিনিয়া যুদ্ধ হচ্ছে। তর্কপ্রসঙ্গে ফিরোজা আকবরকে বলল: ইংরেজ জাতটা বদমাস, আর ফ্রেঞ্চরা দেখুন। লীগ অব নেশনস্ [illegible] এঁরা? এর চেয়ে বড় নিরর্থক জিনিস আর হতে পারে?

আকবর বলল: ফ্রেঞ্চ-ইংরেজ জাত সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যে আমার সমর্থন আছে। কিন্তু লীগ অব নেশনস্ নিয়ে তর্ক হয়।

হঠাৎ ফিরোজা উত্তেজিত হয়ে বলল: একেবারে না। যে আদর্শের ওপর লীগের ভিত্তি, তাকে লোকে স্বপ্ন বলে ঠাট্টা করে।

এখানে তুমি না বুঝে কথা বলছ। জিনিস যখন নূতন, লোকে ঠাট্টা করবেই, তা নিয়ে সত্যি-মিথ্যার বিচার হয় না। লীগের যা

আদর্শ তা কল্যাণকর, সে-আদর্শকে সফল করার চেষ্টা লীগ করছে, এটাকেই এখন বড় করে দেখতে হবে।

কিন্তু এটা কি তুমি মানবে না যে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় সম্পূর্ণ-ভাবে দূর না হচ্ছে, ততক্ষণ যুদ্ধবিরতির কোন আশা নেই। স্থায়ী শান্তি অসম্ভব।

কথাটা তুমি একটু বাড়িয়ে বল্‌লে পারতে যে, এ ন্যায় যাতে সম্ভব হয় তার ঐকান্তিক চেষ্টা করে লীগ ভাল কাজ করছে, ইংরেজ-ফ্রেঞ্চ-দের তুমি যতখুশী গাল দাও, আমার পূর্ণ সহানুভূতি পাবে, কিন্তু লীগ এখন ইম্পিরিয়ালিজমের পুতুল হলেও তার প্রাণধর্ম অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ব্যাপক। এ নিয়ে সরল আলোচনা হয় না। লীগ বল্‌লে জিনিসটা বুঝবে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চলছে, লীগ তার এক প্রাথমিক রূপ।

কিন্তু এ লীগের ধোঁকাতেই তো আবিসিনিয়া মরতে বসেছে। এর প্রতি মিথ্যা মোহেই তার মৃত্যু।

কারণ লীগের আর্দশ লীগকে প্রভাবান্বিত করছে না, আমি ত বলিনি যে লীগের গঠনটা একেবারে আর্দশ। তোমার তর্কের বস্তু লীগের গঠন —লীগের উদ্দেশ্য নয়।

ফিরোজা হেসে বলল: কিন্তু ইংরেজদের গাল দিয়ে যদি তুমি আই সি এস-এর প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে তোমার সফলতার দিক থেকে তা খুব ভাল হবে না।

তখন আমি হিজ্‌ ম্যাজেস্টির মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট আর লয়াল সার্ভেণ্ট। আকবর তখন বোমার চোটে বেহেস্তে গেছে।

খিল্‌খিল্‌ করে ফিরোজা হেসে উঠল।

ফিরোজা কলেজে যায়। নিজের পরীক্ষার প্রয়োজনে কয়েকদিন আকবর খুব ব্যস্ত রইল। সুতরাং আকবরের স্বপ্ন মনের মধ্যেই বন্দী। এ কয়দিন কেমন করে কাটল যেন, খুব তাড়াতাড়ি—যদিও আকবরের পড়াশুনার একাগ্র নিষ্ঠায় ফিরোজার সমস্ত অভিব্যক্তি মনোহরভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। ফিরোজা তাকে উদ্বুদ্ধ করছে। ফিরোজা *তার উর্বশী।*

পরীক্ষা একদিন শেষ হয়ে গেল। আকবরের মন এখন মুক্ত। উদ্দাম আনন্দের বন্যা তার মধ্যে বন্যভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে। দিল্লী কি তাকে পাগল করবে?

বিকালের দিকে ফিরোজা এসে বলল্ল ঃ চল, ফোর্ট দেখে আসি। এতদিন ত বেড়াতেই যাওনি কোথাও।

কুণ্ঠা একেবারে চলে গেছে এ কয়দিনের সাহচর্যে। আজকাল অফুরন্ত কথা ব'লে আকবরকে বিহ্বল করে দেয় ফিরোজা। বিলেত গেলে করবে কি। তাকে যেন খুব লম্বা লম্বা চিঠি লেখে তখন ইত্যাদি।

আকবর বলল ঃ তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছ ?

সেটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। অকারণ ক্রোধের সাথে ফিরোজা বলল।

আকবরের আনন্দের সীমা নেই কোন, ফিরোজার অপ্রতিরোধ্য লালিত্য তাকে বিভ্রান্ত মুগ্ধ করে দিয়েছে। ফিরোজার মুখে এমন সহজ ভাব, যেন এ-ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কোন বস্তুর অংশ নেই !

এখান থেকে দিল্লীর ফোর্ট মাইল দেড়েক হবে। টোঙ্গা চলছে। ফিরোজার সাথে একেবারে আকবর একা। বিস্ময়কর। আকবর এত স্ফূর্তিতে আছে যে রাস্তায় নেমে সে বুক-ডন পর্যন্ত করতে পারে। একটা একান্ত অপরিচ্ছন্ন লোককে গাঢ় আলিঙ্গন করে বলতে পারে ঃ হে বন্ধু ! পরস্পরে আমরা ভ্রাতা হই।

অথচ কিন্তু ফিরোজার সাথে কথা বলতে পারছে না আকবর। অভিধান মন্থন করেও এমন একটা শব্দ বের হচ্ছে না যাতে এ লবণ্যবতী সুন্দরীর সঙ্গে সে মধুর কথা বলতে পারে। আঁটসাঁট হয়ে ফিরোজা একদিকে বসে আছে।

হঠাৎ আকবর বলল ঃ আগেকার কথা তোমার মনে পড়ে ? তার স্বরটা অকারণে কেঁপে উঠছে।

হুঁ···মৃদুস্বরে ফিরোজা উত্তর করল।

তারপর বেশ কৌতুকের সাথে ফিরোজা আবার বলল ঃ তুমি ত' দিন চারেকের মধ্যেই কলকাতা যাবে, না ?

বোধ হয়। মলিন স্বরে আকবর কথার উত্তর দিয়ে বাড়িয়ে বলল ঃ দিল্লী তোমার ভাল লাগে ?

ফিরোজা চুপ করে রইল।

·· ফোর্ট এসে পড়েছে। বাবলা গাছ, ধুলো ধুলো ভাব, এখানে অনেক টোঙ্গা দাঁড়ান। ফেরিওয়ালা সব মেঠাই বিক্রী করছে। জুম্মা-মসজিদটা যেন অনাবশ্যকভাবে প্রকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

একদিকে। এর বিরাটতার প্রভাব অনতিক্রমনীয়। ফোর্টের চারদিক ঘিরে পরিখা।

গেট দিয়ে ঢুকে একেবারে দিওয়ানী আমে এসে পৌছল তারা। সামনে সাইপ্রাস গাছ। অনেকবার এসেছে ফিরোজা এতে, তার তেমন ব্যগ্রতা ধরা পড়ছে না। কিন্তু অবাক্ বিস্ময়ে আকবর ঘুরে ঘুরে দেখছে—দেওয়ানী খাস, নূরজাহাঁর গোসলখানা, সোয়ান হাউস। যে ব্যারাকগুলোতে মোগল সৈন্যরা থাকত এখন সেখানে ব্রিটিশ। একটা পরিপূর্ণ উদার ঐতিহাসিক আবহাওয়ার মধ্যে তাদের অদ্ভুত অবস্থান বর্বরতার সামিল। সৌন্দর্যপিয়াসী মনকে এরা পীড়া দেয়।

খানিকক্ষণের মত আকবর এমন কি ফিরোজার অবস্থিতিও ভুলে গেছে। মোগল অতীত গরিমার নিদর্শন স্বরূপ এ-সব অপরূপ প্রাসাদ তাকে রূপকথার মত আকর্ষণ করছে।

ঘুরে ঘুরে যখন দৈহিক ক্লান্তি এল, বসল তারা এক জায়গায়। মুগ্ধস্বরে আকবর বলল : দিল্লীর এ-দুর্গটা আশ্চর্য জিনিস।

ফিরোজা বেশী উৎসাহ প্রকাশ করল না। এক সময় বলে উঠলো : দিল্লী আমার একেবারে ভাল লাগে না। তার স্বরের মধ্যে এমন একটা গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে যা মমতার সাথে আকর্ষণ করে।

আকবর বর্তমানে ফিরছে। ফিরোজার বিষণ্ণ চোখ তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রলুব্ধ করছে তাকে বিপজ্জনকভাবে।

ফিরোজা একেবারে কাছে সরে এসে বলল : রংপুরের সব কথা মনে আছে আমার। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ।

আকবর গভীর স্বরে বলল : ওসব কথা কি ভুলবার? তারপর বেদনার সাথে হেসে বলল : অনেক দিন গেছে তার পরে।

ফিরোজার মন ব্যথায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাজধানীর এ-কুহক অতিক্রম করে তার মন ঘন-সবুজ বাংলাদেশে গেছে—মিষ্টি বাংলাদেশ, ভারী মিষ্টি, যেখানে খালি সে অফুরন্ত খেলা করত, অফুরন্ত হাসি, অফুরন্ত অভিমান। তার সে দুষ্টু আকবর, চমৎকার আকবর, খুব ভাল আকবর।

সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে আস্ছে চারদিক।

আকবর বলল : চল বাড়ী ফিরি। আকবরের হাত ধরে ফিরোজা একটু চাপ দিয়ে বলে : কলকাতায় ফিরে আমার কথা মনে হবে তোমার?

তোমার কি মনে হয় ?

ভুলে যাবে।

পাগল! ফিরোজার হাত শক্ত করে ধরে আকবর বলল।

স্টেশনে সব বিদায় দিতে এলেন। মিসেস মনসুর দুঃখ করলেন খুব, এত শীগ্‌গীর চলে যাচ্ছে আকবর। রহিম বেচারা মুশ্‌ড়ে গেছে। কিন্তু ফিরোজা শক্ত পাথরের মত, তার ব্যবহারের নির্মমতা আকবরকে আঘাত করছে। কোন অনিবার্য কারণবশত স্টেশনে মিঃ মনসুর আসতে পারেননি।

শেষে ঘণ্টা পড়ল · দুই · তিন। গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে। ফিরোজার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে আকবর – চোখে তার জল! খুব ভাল লাগল আকবরের। বাস্তবিক দিল্লীর মাধুর্য অতুলনীয়। কাঁদিয়ে আস্‌তে পেরেছে আকবর একটা অপরূপ সুন্দরী তরুণীকে। দিল্লী ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে গেলে আকবর অশ্রুস্নাত চোখে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

প্রথম যৌবন

মাসুদের বয়স তখন ষোল। স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে সদ্য কলেজে প্রবেশ করেছে। গড়ন পাৎলা ও লম্বা; রঙ্ কালো; ব্রণ-বিক্ষত মুখ। তবে চেহারার চেয়ে মনটাই ছিল তার অসাধারণ।

কলেজের ছাত্র হয়েও এবং কলকাতায় দীর্ঘকাল থেকেও লাট্টু বা ডাংগুলি খেলবার অভ্যাস তার এখনও যায়নি। সিনেমায় যাবার পয়সা'র অভাব হলে মাঝে মাঝে সে জুয়োও খেলতো এবং প্রায়ই জিততো। মাসুদের বন্ধুরাও ছিলো তারই মত বেপরোয়া। তাস খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো লেগেই আছে। অভিনেতাদের মধ্যে তাদের প্রিয় ছিলো মাস্টার নবীনচন্দ্র ও ভিটলদাশ। তলোয়ার খেলাতে কি তাদের নৈপুণ্য; কি বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া তারা চালায়; সুন্দরী মেয়েদের কাবু করবার কি অপরূপ কৌশল!

বিশেষ করে মাস্টার ভিটলদাশের প্রভাব মাসুদের ওপর অসামান্য। তার প্রিয় অভিনেতার ধরনে সে প্রায়ই কথা বলে এবং হাসবার সময় কোমরে দু'টো হাত দিয়ে মাথাটা একটু পিছু হেলিয়ে দেহটাকে সামনের দিকে দুলোতে থাকে।

নানা কারণ বশত মাসুদের ওপর তার পরিবারের কেউ বিশেষ খুশী নয়। জিহবায় তার লাগাম নেই, মুরুব্বীদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, তা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞানা। মেজাজ তার খিটখিটে, বাসায় কারও না কারও সঙ্গে ঝগড়া লেগেই আছে এবং যা সব চেয়ে মারাত্মক, বাসায় এক চাচাজান ছাড়া সে আর কাউকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।

খাওয়া তার প্রায়ই পছন্দ হয় না। খেতে বসে বাসনটা সজোরে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলাটা তার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। মা ধমকান। তাতে ফল হয় না কিছুই। এক এক সময় মাসুদ

আরও মজা করে। খেতে বসেছে। তরকারীতে মন রুচলো না। মাকে বললো : আর একটুকরো মাছ।

তাড়াতাড়ি মা আর একটুকরো মাছ এনে দেন। তারপর সে এক কাণ্ড। মাছ ছিতরালো একদিকে, তরকারী অন্য একদিকে, ভাত বারান্দার চারদিকে, আর টুকরো টুকরো হবার সময় কাঁচের বাসনের ঝন্‌ঝনাৎ রব।

মা ত তেড়ে ওঠেন : তোকে মাছ দিবো না ছাই দিবো, লক্ষ্মী-ছাড়া···বদমাস · কালকুট্‌ঠা · বেয়গন্‌ভুট্‌টা।

শেষের দু'টি শব্দ মাসুদের বিরুদ্ধে তার মায়ের এক মারণাস্ত্র। চেহারা ও গায়ের রঙ্ নিয়ে কেউ তাকে ঠাট্টা করলে সে মর্মে মর্মে জ্বলে।

কিন্তু, আশ্চর্য, মাকে মাসুদ এবার গালিগালাজ দেয় না, নিজের চোখ দু'টিতে কান্না জমে আছে সে অনুভব করে। কিছুক্ষণ পরে ধাঁ করে সে অন্যদিকে চলে যায়।

কলেজ থেকে ফিরবার সময় মাসুদ একদিন খুব সস্তা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে চা খেতে বসে। পাশের দু'একজন লোকের সঙ্গে গল্পও জুড়ে দেয়, কেউ হয়ত পিওন, কেউবা দারোয়ান।

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মুখ তুলে মাসুদ দেখে, সামনের ফুটপাত দিয়ে তার মেজভাই তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চলে গেলো। মাসুদের মনটা একটু ঝিমিয়ে পড়ে।

বাসায় ফিরেই মেজভাই ও মায়ের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : একেবারে কলকাতার গুণ্ডা হয়ে গেছে, শরীফ খান্দানে পয়দা হবার লায়েক নয়।

মাসুদ অজ্ঞতার ভাণ করে।

মা বলতেই থাকেন : দারোয়ানদের সঙ্গে এর পরে গাঁজা খেতে বসবে, কোনদিন যে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। জেলের ভাত খেতে হবে তখন, বাসার ভাত ত পছন্দ হয় না।

—কি হয়েছে? কিছুটা উত্তাপের সঙ্গে মাসুদ জিজ্ঞেস করে।

—আবার নেকু সাজতে চায়, দু'চোখে আমি দেখতে পারি না এই গুণ্ডাকে, রাস্তার ফকিরদের সঙ্গে ফুটপাথের মাঝখানে চা খায়।

—কে বলেছে তা? মাসুদের গলার স্বরটা আরও চাড়া দিয়ে ওঠে।

—চুরি করে আবার সিনাজোরি করা, সাদেক তোকে নিজের চোখে দেখেনি চা খেতে, রাস্তার মাঝখানে পিওনদের সঙ্গে?

মাসুদ কিছু বলে না। সার্টের পকেটে তার দু'টি মার্বেল ছিলো, মেজভাই সাদেকের দিকে লক্ষ্য করে সেগুলি সে ছুঁড়ে মারে।

সাদেক চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ে।

সেদিন অবশ্য চাচাজানের হাতে মাসুদ এমন মার খেয়েছিলো, যে, তা দেখে সাদেক পর্যন্ত আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কোন শব্দ না করে প্রস্তরমূর্তির মত সে মার খেয়ে যায়। একটুও কাঁদে না।

কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসেন মা নিজে হাতে করে, মমতা-ভিজে কণ্ঠে মাসুদকে তা খেতে বলেন। মায়ের দিকে মাসুদ শুধু গভীর ও অন্ধ বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকায়। তা লক্ষ্য করে মায়ের বুকটা আশঙ্কায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

সরকারী চাকুরে বলে আব্বাজান প্রায়ই মফঃস্বলে থাকেন। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। আব্বাজানকে মাসুদ বেশ সমীহ ক'রে চলে, কারণ তাঁর মেজাজের আঁচ পাওয়া মুস্কিল। কোন সময় হয়ত স্নেহে তিনি গলে যান, পরমূহূর্তেই খামাখাই খাপ্পা হয়ে ওঠেন। তবে আব্বাজান কলকাতায় এলে মাসুদের একটা সুবিধা হয়। বালিশ বা বিছানার তলায় টাকা পয়সা রাখা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। নোট ও পয়সাগুলি তিনি গুনে রাখেন, টাকা গুনতে ভুলে যান। তাই সুযোগ পেলেই বালিশের তলা থেকে মাসুদ দু'এক টাকা সরিয়ে ফেলে।—আব্বাজান বুঝতেও পারেন না।

তখন জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি "কার্ল হেজেনবেক" বলে এক জার্মান সার্কাস দল কলকাতায় এসেছে। তা নিয়ে প্রায় সারা শহরে চাঞ্চল্য। মাসুদের দু'একজন বন্ধু এরি মধ্যে সার্কাস দেখে এসে তার প্রশংসায় পাগল। সবিস্তারে এবং রঙ্ দিয়ে প্রত্যেকটি ব্যাপার বর্ণনা করে তারা মাসুদের মনকে উতলা করে তুললো।

মাসুদ পড়লো এক ডামাডোলে। সঙ্গে পয়সা একেবারে নেই, অথচ সার্কাসটা না দেখতে পারলে বন্ধুদের চোখে তার মর্যাদা অনেকটা নেমে পড়বে। তবে একটা উপায় আছে অবশ্যি।

আব্বাজানের বিছানার তলা। সুযোগ মিলতেও দেরী হোল না। আব্বাজান বাথরুমে যাবার সময় তাঁর কামরা খালি দেখে বোঁ করে মাসুদ সেদিকে ঢুকে পড়লো। বালিশের তলায় তার অভ্যস্ত হাত পৌঁছাতে বেশী সময় লাগলো না। সে জায়গাটা ফাঁকা। তোষক ওল্টাতে মাসুদ আর সময় পেলো না।

আব্বাজানের গলার স্বর অদূরেই শোনা যাচ্ছে। অন্য দরজা দিয়ে মাসুদ দিলো ছুট।

কিছুক্ষণ পরেই বোন শাহেদা এসে মাসুদকে জানালো: মাসুদ ভাই, তোমাকে আব্বা ডাকছেন।

ভাইবোনদের মধ্যে শাহেদার সঙ্গেই মাসুদের সবচেয়ে বেশী ভাব। বোনকে কোমল কিন্তু কিছুটা আশঙ্কামিশ্রিত কণ্ঠে মাসুদ জিজ্ঞেস করে: কেন রে?

—তার আমি কি জানি। বেণী দুলিয়ে আর মাথা নাড়িয়ে শাহেদা উত্তর দেয়।

মাসুদের ভাবনা হয়: বালিশের তলা ঘাঁটতে আব্বাজান তাকে দেখেছেন নাকি! তাহলেই খেয়েছে। মায়ের সে ততটা ভয় করে না, কিন্তু কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, তবে তার সম্বন্ধে শাহেদার কি একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে যাবে।

দুরুদুরু বুকে সে আব্বাজানের কাছে যায়। তাকে দেখে তিনি বলেন: তুই শুনি খালি গুণ্ডামি করে বেড়াস, পড়াশুনা করিসনে।

মাসুদ চুপ করে থাকে।

—চুপ করে আছিস কেন, জবাব দে না।

মাসুদ তবুও চুপ।

—বড় হয়ে তোমায় কুলীগিরী করে খেতে হবে দেখে নিও, আব্বাজান ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

মাসুদ স্পষ্ট বুঝতে পারে, মা আব্বাজানের সামনে তার দোষের তালিকা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন।

চুপ করে থাকলেও মাসুদের চোখ দু'টিতে জল জমাট হয়ে ওঠে।

হঠাৎ আব্বাজান সুর বদলান: কার্ল হেজেনবেক সার্কাস দেখেছিস?

—জী না। মাসুদ দ্রুত জবাব দেয়।

—আজকে সন্ধ্যায় শাহেদাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখে আসিস। আব্বাজান দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন।

নিমেষে মাসুদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে: বকুনী খাওয়ার পর এরকম বক্‌শিস পেলে মন্দ নয়।

সন্ধ্যের দিকে আবার মাসুদের ডাক পড়ে। আব্বাজান বলেন: বিছানার নীচে পাঁচটা দশটাকার নোট আর পাঁচটা খুচরো টাকা আছে, নিয়ে আয়তো।

ত্বরিত গতিতে মাসুদ আব্বাজানের কামরায় এসে তাঁর বিছানার তোষক উল্‌টিয়ে দেখতে পায়ঃ পাঁচটা দশটাকার নোট আর সাতটা খুচরো টাকা। দু'টাকার হিসেব তিনি ভুলে গেছেন, বোধ হয়। পকেটে টাকা দু'টো পুরে মাসুদ পরক্ষণেই ভাবলোঃ তার সততা পরীক্ষা করবার জন্য এ আব্বাজানের এক অভিনব কৌশল নয়ত। কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর সে টাকা দু'টা বাজেয়াফত করবার সিদ্ধান্তই করে।

আব্বাজানের হাতে সে পাঁচটা দশটাকার নোট আর খুচরো পাঁচ টাকা অর্পণ করে। নোট কয়টি গুণে তিনি মাসুদকে জিজ্ঞেস করেনঃ খুচরো ক'টাকা ছিলোরে?

—পাঁচ।

—পাঁচ না সাত? আব্বাজান দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

—পাঁচ সাত হবে কেন? মাসুদ সরলতার প্রতিমূর্তি।

—রাস্তায় কিন্তু সাবধানে চলিস, বাস লরী দেখে—আর সব সময় শাহেদার হাত ধরে থাকবি, সার্কাসের মধ্যেও। বলে অন্যমনস্ক মনে তিনি অন্যত্র চলে যান।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাসুদ ভাবেঃ মন্দ হোল না কিন্তু, সার্কাসও দেখা হোল মুফ্‌তে এবং লাভের মধ্যে দু'টাকা ফাউ। আব্বাজান লোকটি, ভদ্রলোকের মেজাজ একটু অনিশ্চিত হলেও, মন্দ নয়!

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। শেষপর্যন্ত খালি শাহেদাই মাসুদের সঙ্গে এলো। চাঁদের লহরীতে শাহেদার লাবণ্য যেন উপছে উঠেছে। সহসা মাসুদের মন ধিক্‌কারে ভরে যায়। মলয়-লুণ্ঠিত ফুলের সৌরভ সে ধিক্‌কার বোধকে গভীরতর করে। ভাল হতে হবে, নিজেকে সুন্দর করতে হবে। চুরি করবার অভ্যেস ছাড়ান দিতে হবে। আব্বাজানের দু'টো টাকা অমনভাবে না নিলেও হোত।

নিবিড় স্নেহে মাসুদ শাহেদার হাত ধরে, আর চাঁদনী রাতের মায়া তার চোখে স্বপ্নজাল বুনতে থাকে।

হঠাৎ মাসুদের জীবনে একটা বিপর্যয় এলো। যে বাসায় তারা থাকতো সেটা একটা 'ম্যানসন'। দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটটা অনেকদিন খালি থাকবার পর একদিন নূতন বাসিন্দাদের কলরবে মুখর হয়ে উঠলো।

চৌদ্দ কি পনের বছরের এক তরুণী পাড়ার যুবকদের চিত্ত প্রথম দিনেই জয় করে ফেললো।

মাসুদও অবশ্যি মেয়েটিকে দেখছে, কিন্তু তার মনে পাড়ার অন্য ছেলেদের মতো তুফান জাগেনি। মেয়েদের ব্যাপারে মাসুদ বস্তুতই কিছুটা উদাসীন।

তার অন্যান্য বন্ধুরা যখন মেয়েটার দৃষ্টি তাদের দিকে কি ভাবে আকর্ষণ করবে সে চিন্তায় বিভোর, মাসুদ তখন সাহিত্যের নেশার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। নানা রকমের বই পড়া তার এক সুখ। মাসুদের মনের নিভৃতে, তার অজ্ঞাতেই বোধ হয় এমন একটা আশ্চর্য জগৎ রস ও সৌন্দর্যের পরিপুষ্টতায় গড়ে উঠেছে, যা তার প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা ও অসাফল্যকে হরণ করে নেয় এবং সূক্ষ্ম এক তৃপ্তি দেয়। তার মনের রুদ্ধ বাসনা ও অকারণ আর্তি সহসা ভাষা পেয়ে অসীম নির্ভয়ে নিজের মনোজগতে চলাফেরা করে, আর কি এক মহার্ঘ ঐশ্বর্যের স্পর্শ অনুভব করে তার সমস্ত সত্তা বাক্‌হারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু 'ম্যাডান থিয়েটার'এ কি একটা চমৎকার ইংরিজি ছবি এসেছে। দেখতেই হবে। অতএব বাদশাহ্‌র সঙ্গে লাটুর জুয়া খেলতে হবে। সিনেমা দেখবার লোভে নিজেকে ভালো করবার সঙ্কল্প মাসুদের ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বাসার বাইরে একটা ছোট্ট গলির ভেতর দু'বন্ধু তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে বসে। খেলা পুরোদমে চলেছে, এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা। গলি থেকে রাস্তা চোখে পড়ে। সেই মেয়েটি রাস্তা ধরে আসছে। পরনে সাদা মিলের শাড়ী, পাড়টি কালো। দু'হাতে ভর করে একটি হাঁস, ঝরঝরে সাদা, বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আর তার পদক্ষেপ শ্লথ মাধুরী ভরা।

মাসুদ আর চোখ ফেরাতে পারে না, খেলা ভুলে যায়। মনে তার এক উদ্দাম আনন্দ, সাতসাগরের সপ্তবর্ণ রঞ্জিত ঢেউ। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল মাসুদ। তার দিকে মেয়েটি বক্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে গেল। কি ছিলো সে দৃষ্টিতে মাসুদ বুঝিয়ে বলতে পারবে না, তবে মন তার অপরিমিত পুলকে ভরে যায়। মনে হয়, আনন্দে ঝলমল, বর্ণে ভাস্বর এক দুনিয়া যার খোঁজ কোনদিন সে পায় নি, তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কি বিস্ময়!

তার স্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভেঙে দেয় বাদশাহ্ ঃ খেলা যে ভুলে গেলে, এক চাউনিতেই কাৎ। ও মেয়ের দিকে ভিড়ো না বন্ধু. তোমাকে নাচিয়ে বেড়াবে।

বন্ধুর প্রতি মাসুদের মন হঠাৎ এতটা বিষিয়ে ওঠে যে কোন কথা না বলে সে নীরবে বাসায় ফিরে যায়। ফিরবার পথে দেখে রাস্তার পার্শ্বে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের স্তবকে স্তবকে অজস্র ফুলের রক্ত-রঙীন সমারোহ। সারা দুনিয়াতে যৌবনের যেন আগুন লেগেছে।

তারপর ধীরে ধীরে মাসুদের মধ্যে এলো পরিবর্তন। বাসার কারও সঙ্গে আর ঝগড়া করে না; খাওয়ার ব্যাপারেও উদাসীন। বেশীর ভাগ সময়ই বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। বিকেলের দিকে বেড়াতে যায় কোনদিন গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনস্‌এ, কোন-দিন বা ভিক্টরিয়া মেমোরিয়ালে। বন্ধুরা তার খোঁজ করতে এসে প্রায়ই তাকে বাসায় পায় না। বাদশাহ্ ত সকলকে বলতে আরম্ভ করেছে, মাসুদ তার প্রতিবেশিনীর প্রেমাসক্ত।

একদিন বাসার ছাদে মাসুদ তার ছোট ভাই নওয়াজের সঙ্গে টেনিস বল খেলছিলো। হঠাৎ ছাদের দক্ষিণ দিকের দেওয়াল টপ-কিয়ে বলটি গিয়ে পড়লো নূতন প্রতিবেশীদের অঙ্গনে। মাথা ঝুঁকিয়ে মাসুদ লক্ষ্য করে, বল পড়বার শব্দ শুনে মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি।

কিন্তু এদিকে ছোটভাই নওয়াজ কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে, নীচে পড়ে যাওয়া বলটি তার! মাসুদ পড়ে ফাঁপরে। বলটা মেয়েটার থেকে চাইবেই বা কি করে, আর বল ফেরত না আনলে এদিকে নওয়াজের কান্নার আর বিরাম হবে না। শেষ পর্যন্ত মাসুদ বলটা ফিরিয়ে আনাই সিদ্ধান্ত করে। ভাইকে বলে, চুপ কর রে নওয়াজ, বল এনে দিচ্ছি। বলে নীচে নেমে যায়।

নূতন প্রতিবেশীদের বাসার দরজার সামনে এসে মাসুদ অবাক হয়ে দেখে, লীলায়িত ভঙ্গীতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার বল, মুখে হাসি, চোখ দু'টি কৌতুকোচ্ছল, ব্লাউজের শাসন অতিক্রম করে একদিকের স্তন উদ্ধত।

কেমন যেন হয়ে যায় মাসুদ। বিকেলের রোদ ঝলসাচ্ছে। প্রাচীরের ওপারে একটা অশ্বত্থ গাছের পাতা রোদে চিকমিক করছে এবং বাতাসে হিল্লোলিত। সে এবং একটা অপরিচিত তরুণী মুখো-

মুখি দাঁড়িয়ে, আশেপাশে আর কেউ নাই। তরুণীর ঠোঁট দু'টির ফাঁকে বিহ্বল করা হাসির এক অপরূপ সংকেত। যেন প্রচণ্ড অথচ মধুর আকস্মিকতায় মাসুদের বহু বাসনা-ব্যাকুল স্বপ্নের নায়িকা এক বিভ্রমময় মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছে।

মাসুদের মুখ থেকে কোন কথা সরে না। ভাষা তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটি গাল ফুলিয়ে হাসে এবং হস্ত প্রসারিত করে মাসুদকে বলটি ফিরিয়ে দেয়। মেয়েটি হাসবার সময় মাসুদ আবিষ্কার করে, তার একটি দাঁত কিছুটা উঁচু। কিন্তু মাসুদের মুগ্ধ চোখে মনে হয়, মেয়েটির উঁচু দাঁত তার আকর্ষণীয়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বলটি হাতে নিয়ে মাসুদ কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিবার কথাও তার মনে পড়ে না। মনে অতল এক অনুভূতি নিয়ে মাসুদ ফিরে যায়, হাস্যরতা ও কৌতুকময়ী এক সুন্দরী তরুণীকে পেছনে ফেলে রেখে।

বলটি নওয়াজের হাতে অর্পণ করে মাসুদ অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাদের বাসার কাছে একটা পার্কে গিয়ে বসে। পার্ক অনেকটা নির্জন। খালি দেখে একটা বেঞ্চে বসে সে হঠাৎ অনুভব করে আশেপাশের সমস্ত কিছু কেমন একটা মহার্ঘ শোভায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। পরিচিত গাছ-পালাতেও বিস্ময়ের এক ঝলক্।

মেয়েটি হাসলো কেন? মনে তার কি ছিল? বল নিয়ে দরজার সামনে মাসুদের জন্য তার প্রতীক্ষা করবারই বা কি অর্থ? হয়ত তাকে মেয়েটি একটা অজ বোকা ঠাউরিয়েছে। একটা ধন্যবাদ দিবার কথাও তার মনে পড়লো না! মেয়েটির চোখে কি ভাষা ছিল? হাসবার সে কি ঠাট, দাঁড়াবার কি লীলায়িত ভঙ্গী, দৃষ্টিতে কি দুঃসহ কৌতুক!

খোদা আমার একি হোল! মন আমার কি যেন চায়, হৃদয়ে আমার একি রহস্য-গভীর আকুতি, চোখে আমার একি বিস্ময়! নিজের কাছেই আমি এখন অচেনা।

কয়েকদিন যে কি ভাবে কেটে গেলো, মাসুদ বুঝতেই পারে না। রঙীন, ঝলমলে কয়েকটা দিন। বাসার সকলে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, মাসুদ ছোট ভাইবোনদের আদর করছে, তাদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলছে। মাসুদের নম্র ব্যবহারে মা ত' খুব খুশী, যদিও বেশ কিছুটা তাজ্জব। সকলেই একবাক্যে বলেঃ মাসুদ অনেক

বদলে গেছে, ভাল হতে চলেছে। হাজার হোক, এখন ত কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হচ্ছে তার।

একদিন ভোর প্রায় ন'টার সময় মাসুদ বাদশাহ্‌র সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছিল। অমন সময় প্রায়ই সে তার বন্ধুর ওখানে যায়। বাদশাহ্‌দের ফ্ল্যাট ঠিক নূতন প্রতিবেশীদের পেছনে। গলিতে প্রবেশ করে একটা দৃশ্য দেখে মাসুদের মন ওলট-পলট হয়ে যায়।

মেয়েটি আবার বাইরের দরজার সামনে দাঁড়ানো, কার যেন প্রতীক্ষারতা। চোখে সে উচ্ছল কৌতুক নেই, মুখে বিষাদের রেখা, দাঁড়াবার ভঙ্গীতে হতাশা উচ্চারিত। মাসুদের মন করুণায় ভরে যায়। তাকে দেখে মেয়েটির বেদনা-বিব্রত অভিব্যক্তিতে হাসির একটা মৃদু সংকেত আসে যেন, চোখ দু'টি গভীর হয়ে যায়। মাসুদের মনে হয়, কার বিরুদ্ধে অশেষ অভিযোগের ভাষা মেয়েটির মুখের প্রতিটি রেখায় কে যেন খুঁদে খুঁদে বসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে, নিবিড় দুঃখ ও নিবিড়তর এক মমতার দৃষ্টিতে, যে মাসুদের যৌবন নিজের কাছে নিজকে অপরাধী মনে করে। সৌন্দর্যের একটি অফুরন্ত সম্ভাবনা পঙ্গুতার চাপে পড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত যৌবনকে অভিশপ্ত করে।

* * *

পরের দিন মাসুদ জানতে পারে: নূতন প্রতিবেশীরা বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

*
* *

আবার বাদশাহ্‌ ও মাসুদকে দেখা যায় গলির ভেতর বাজী রেখে লাট্টু খেলছে। নূতন কোন ভালো ছবি এসেছে হয়ত। দৃষ্টি একটু প্রসারিত করলেই চোখে পড়ে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ, বর্ণাঢ্য সমারোহে যার প্রত্যেকটি ফুল পথিকের চিত্ত লুব্ধ করে।

———

অভাবনীয়

বৈশাখ মাসের রাস্তা-তাতানো রোদ্দুর। গায়ে ঘাম আসলেও, আসমানের আচমকা বিস্ময় ও বিদগ্ধ কৃষ্ণ-চূড়া গাছের কামনা-হত আবেশ উপেক্ষা করা যায় না। ধাবমান মোটর গাড়ীতে বসে বাইরের দিকে মজিবুল দৃষ্টি প্রসারিত করে। আলো আর উত্তাপ মধ্যাহ্নের নিরলস রূপকে উগ্রতর করে মনের নিবিড় বাসনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

খুলনা থেকে মোটরযোগে মজিবুল কলকাতায় চলেছে। সঙ্গে দূর-সম্পর্কের ফুপাজান, ফুফুআম্মা এবং তাঁদের বড় মেয়ে ও বড় ছেলে। ফুপাজান খুলনা সদরের মহকুমা অফিসার। কলকাতা সদলবলে চলেছেন কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে। মজিবুল এসেছিলো ফুপুআম্মার আমন্ত্রণে, সকলের সংগে ফিরে যাচ্ছে রাজধানী। পেছনের সিটে নাজমা বসে।

যে কয়েকদিন মজিবুল খুলনায় ছিলো বেশ আনন্দে কেটেছিলো এবং সে আনন্দকে ঘনীভূত করেছিলে নাজমার সাহচর্য। ছোট্ট হলেও বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহর খুলনা। দু'দিকে নদী। শহরের মাঝ-খানে বড় এক মাঠ। সোজা, পরিমিত পীচ-ঢালা রাস্তা। খুলনাকে প্রথম দেখেই মজিবুলের ভালো লেগেছিলো। খালি খুলনাকেই নয়। হাস্য, লাস্য ও প্রাণচাঞ্চল্যে নাজমা তাকে মাতিয়ে রেখেছিলো। প্রথম দিনেই তার সংগে প্রাণখোলা ভাব হয়ে যায়। কোনরকম কুণ্ঠা নেই বা কোনরকম সংকোচ। লুব্ধ পুরুষের দৃষ্টিতে তাকে প্রথম প্রথম একটু অগ্রসরপন্থী মনে হতে পারে, তবে অন্তরংগ পরিচয়ের পরে সে-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। আশ্চর্য খোলামন নাজমার।

—আপনি নাকি ব্যাড্‌মিন্টন খুব ভাল খেলেন? পরিচয়ের প্রাথমিক জড়তা কেটে যাওয়ার পর নাজমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

—খেলি বটে, তবে ভাল কি না বলা মুস্কিল—আর ব্যাড্‌মিন্টন ভাল খেলাও পুরুষের পক্ষে এমন কিছু কৃতিত্বের কথা নয়। মজিবুল নাজমাকে নাজেহাল করবার সাধু প্রয়াস করে।

—আচ্ছা, বিকেলে একবার পরখ করা যাবে কেমন আপনি খেলেন, শমীম কিন্তু খেলে খুব ভাল। শমীম নাজমার ভাই।

সে খালি বলে, কিছুটা রহস্য করে, কিছুটা অবোধ শিশুর আস্ফালনের ধরনে ঃ বক্‌সিংএ অবশ্য আমি ওস্তাদ।

নাজমা হাসে।

বিকেলের স্তব্ধ প্রহর সেতারের মূর্ছনায় সহসা সঞ্জীবিত হয়। অলস মনে নিজের ছোট কামরায় বসে এলোমেলো ভাব-সমুদ্রে মজিবুল গাহন করছিলো, এমন সময় সেতারের মৃদু ঝংকার হৃদয়কে মধুর এক সম্ভাবনার সংগে পরিচিত করায়। কত বিচিত্র অনুভূতি মনের গহন কন্দরে যে সুপ্ত হয়ে আছে, তা অনুধাবন করা যায় এই সব বিরল মুহূর্তে যখন যৌবন জাগরণের আনন্দে গান গেয়ে উঠে।

শমীম এসে বলে ঃ চলুন মজিবুল ভাই, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলি।

মজিবুল বলে ঃ চলো।

ব্যাড্‌মিণ্টন খেলা শেষ হয়েছে এমন সময় ত্বরিত গতিতে নাজমা এসে মজিবুলকে সম্বোধন করে বলেঃ তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে ফেলুন, সিনেমা দেখতে যাবো। তখন সবেমাত্র আকাশে কিছুটা রঙ ধরবার উপক্রম করেছে; মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বয়। খেলা শেষের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রসন্নমুখে মজিবুল জিজ্ঞেস করে ঃ কি ছবি দেখাচ্ছে ?

—শেষ রক্ষা। দ্রুত চলতে চলতে নাজমা বলে।

—হলেই হয়—আচম্বিতে মজিবুলের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

—কি বললেন—তীব্র কৌতুহলের স্বরে নাজমা জিজ্ঞেস করে।

তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে মজিবুল বলে ঃ সময়মত সিনেমায় পৌঁছাতে পারলেই হয়।

—তা পারবেন, মোটরে করে যাব। নাজমা আশ্বাস দেয়। তারপর কি যেন মনে হওয়াতে ঃ খেলায় কে জিতলো ?

—শমীম। মজিবুলের দ্বিধাহীন উত্তর।

পেছনেই ছিল শমীম। বিজয়ীর গর্ববোধ থেকে নিজেকে সত্যের খাতিরে বঞ্চিত করে প্রবল প্রতিবাদের ভঙ্গীতে সে বলে ঃ না আপা।

মোটর নিজেই চালিয়ে নিয়ে যায় নাজমা। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিপরীত দিক হতে ছুটে-আসা মিলিটারী লরী ও রাস্তার নির্বি-কার জনতা এড়িয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায় সে ক্ষিপ্রগতিতে। তা লক্ষ্য করে মজিবুলের বড় অনুশোচনা হয়। না জানে সে সাঁতার কাটতে বা মোটর চালাতে—ঘোড়ায় চড়ার কথা না হয় বাদই গেলো। পুরুষ হয়ে জন্মেছিলো সে বৃথা। নাজমার সামনে-আনা চুলের অরণ্য থেকে উত্থিত একপ্রকার আশ্চর্য সুবাস দমকা বাতাসকে সুরভিত করে মজিবুলের মনকে সাময়িকভাবে বিবশ করে দেয়।

স্বপ্ন-শিশু যেন মুচকে হাসে।

খুলনা থাকাকালীন সুন্দরবনে দু'রাত্রি যাপনই অবশ্য সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। মজিবুলের ফুপাজান কি কৌশল প্রয়োগে যেন একটা 'লঞ্চ' যোগাড় করতে পেরেছিলেন। যেদিন বিকেলে তারা রওয়না হয়, আকাশে মেঘ করেছিলো। কিছুদূর এগুবার পরই বাতাসের তীব্রতা বাড়লো, নদীও কিছুটা ফুলে উঠলো।

নদী-বক্ষে ঝড় মজিবুলের তেমন পছন্দ নয়। তাই আকাশের দিকে চেয়ে মনটা তার বিশেষ স্বস্তি বোধ করতে পারলো না। তবে এ মৃদু আতঙ্কের মধ্যে কেমন সূক্ষ্ম রোমাঞ্চ আছে। অনেকটা পলকহীন চোখে মজিবুল আকাশে ক্রম-বিস্তৃত মেঘ-সম্ভারের দিকে চেয়েছিলো, এমন সময় অসম্ভব এক প্রত্যাশার মতো নাজমা তার বা'জানের সঙ্গে উপরের ডেকে এসে হাজির হল।

—এই বুঝি তোমার সুন্দরবনের দিকে প্রথম আসা? ঝড়ের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফুপাজান বলেন।

—জী। মিনমিনে স্বরে মজিবুল উত্তর দেয়।

আর কিছুক্ষণ খুচরো গল্প হওয়ার পরে বাইরের রুদ্ধ আব-হাওয়ার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই বুঝি লঞ্চের উপরের নীরবতা বিরাজ করে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার এক ঝাপটায় নাজমার চুলের বাঁধন খুলে গিয়ে চারদিকে লিক্‌লিক্ করে নাচতে থাকে এবং মনে হয়, আকাশ-ভার-করা কালো মেঘকে বিচিত্র এক আহ্বান জানায় যার উত্তরে হয়ত নদীর বুকে এখুনি ঝড় ভেঙে পড়বে আদিম ক্ষুধার প্রচণ্ডতায়। অপরূপ অনুভূতি-গাঢ় কয়েকটি মুহূর্ত, যখন বন্য স্বপ্নেরা আকুলি বিকুলি করে প্রকাশের দীন অক্ষমতায়।

কিছুক্ষণ পরে বাতাস মেঘ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ঝড়ের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

পরদিন বিকেলে সকলে মিলে বোটে চড়ে 'টাইগার পয়েণ্ট'-এর কাছাকাছি সুন্দরবনের ভিতর শিকার করতে যান। যেখানে 'লঞ্চ' নোঙর করেছে সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। বৈশাখ মাসে এদিকে আসা রীতিমত বিপজ্জনক। যে-কোন সময় ঝড় উঠতে পারে। পরন্তু, এ-দিককার নদীতে, আকারে খুব বড় না হলেও, স্রোতের বেগ এত বেশী যে, লঞ্চডুবি হবার সম্ভাবনা সর্বদাই উপস্থিত। সে-কথা ভেবে মজিবুলের মন অবশ্য কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়, কিন্তু বোটে চড়বার পর যখন পেছন ঘুরে সে সমুদ্রের দিকে চায়, তখন তার মন থেকে সমস্ত ভয় উবে গিয়ে এক সীমাহীন বিস্ময়ের ভাব জাগে। যেদিক বেঁকে নদী সমুদ্র হয়েছে সেদিকে তাকালে মন দুরন্ত বেগে ছুটে চলে ঠিকানা-হীন দেশে, কল্পলোক হতে কল্পলোকে, কিন্তু ঠিক যে কোথায় বলা ভার।

বনের ভিতর ঢুকে চঞ্চলা হরিণীর মত নাজমা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মজিবুলের ত' ভয়ই করছিলো। কখন কোনদিক থেকে বাঘ এসে পড়ে বা সাপ ফণা তোলে, কিছুই বলা যায় না। সঙ্গে ত' খালি হরিণ মারার বন্দুক। অথচ নাজমা বনের চারদিকে কি ভাবে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে আশ্চর্য লাগে।

হরিণ কিন্তু একটাও পাওয়া গেল না।

অগাধ বিস্ময়ের মতো সন্ধ্যা'র পরে আকাশের একদিকে চাঁদের ফালি উঠলো। নদীর জলে সুন্দরী গাছের প্রতিবিম্ব এবং আকাশের কোণে লেগে থাকা অপসৃয়মাণ সূর্য-রশ্মির কুণ্ঠিত প্রতিফলন। সামনে সমুদ্রের বিস্তার।

বন-মোরগের শব্দ চতুর্দিকের নীরবতাকে মাঝে মাঝে খণ্ডিত করছে; আকাশ অবিশ্বাস্য নীল; বাতাস সংকেতভরে কখনও উচ্ছল, কখনও মন্থর; শ্লথ গতিতে নামছে আঁধার; সমুদ্রের রেখা অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর।

ফুপাজান কাপড় চোপড় ছেড়ে উপরে এসে বল্লেন: না কপাল খারাপ, এবার আর হরিণ পাওয়া গেলো না।

মজিবুল সান্ত্বনাসূচক ভঙ্গীতে মৃদু হাসে।

মন তার প্রতীক্ষা করছিলো অন্য এক জনের। এমন পরিবেষ্টনীতে যার আবির্ভাব পরিপূর্ণভাবে শোভন হত। তারা-ছাওয়া আকাশে ফিকে চাঁদ হাসলেও কিন্তু সে প্রার্থিত জনের উদয় হোল না। সমুদ্র যেখানে, আলো-অস্পষ্টতা মিশে সেখানে এক বিচিত্র কুহক রচনা করেছে। তাও সব, মজিবুলের কাছে, ব্যর্থ মনে হয়।

* * *

পথের একটা আলাদা নেশা আছে। মোটর ছুটে চলেছে; ঝলকে ঝলকে চোখের সামনে দৃশ্য বদলাচ্ছে; ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের গভীর ছাওয়া উত্তপ্ত পথকে করে চলেছে কিছুটা শীতল। নগ্ন ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ মোটর দেখে হল্লা শুরু করে দেয়।

পেছনকার সীটে নাজমার উপস্থিতি অনুভব করলেও এ-পর্যন্ত মজিবুল একবারও ফিরে চায় নি। তবুও একই মোটরে যে সে নাজমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে চলেছে, একথা ভাবতেও এক উষ্ণ আবেগ মজিবুলের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দেয়।

খুলনায় এ ছয়দিনে ভ্রমণ কম আনন্দের হয়নি। নূতন আবিষ্কারের বিস্ময়, অজানার কৌতূহল, দুরান্তরের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা সব কিছুই এ-কয়দিনের মধ্যে ভিড় করেছিলো; এবং এমন একটা অনুভূতির পরশ সে পেয়েছিলো যাকে ছোঁয়া যায় না, বুঝা যায় না, শাসন করাও যায় না—অথচ অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করা যায়।

কলকাতায় পেঁছে নাজমার সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত হবার সুযোগ হবে কি না, বাইরের আ-দিগন্ত ঝলসে-যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে মজিবুল ভাবে। না হলেও ভাগ্যকে দুষবার কিছু নেই, কারণ গত কয়দিন যে আনন্দে সে সময় কাটিয়েছে তার প্রতিশ্রুতি আগে থেকে কেউ তাকে ত' দেয় নি! সার্থক ভ্রমণের তৃপ্তি তার মনে অনেকদিন থাকবে অন্তত।

(২)

কলকাতার গরম ভয়াবহ হতে পারে। আর যাদের বাড়ীতে প্রত্যেক কামরায় পাখা নেই, তাদের ত' জান বেরিয়ে যাবার যোগাড়। রাস্তার পীচ তরল হয়ে আগুন হয়, আকাশ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়, কাটা মাছের মত ছটফটাতে থাকে মানুষের অসহায় শরীর। ভাগ্যিস যে কামরা নাজমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেখানে একটা পাখা আছে!

না হলে তার হাল কি হতো ভাবতেই শরীর থেকে ঘাম বেরোয়। নাজমারা এসে নেমেছে তার খালা আম্মাদের এখানে। তিন চার দিন কলকাতায় হল্লা করে খুলনা ফিরে যাবে।

মাহবুব কোন সূত্রে নাজমাদের আত্মীয়। এখন আর্মীতে লেফটেনেণ্ট। চটপটে, চতুর ছেলে। সব সময়ই হাসতে জানে। গান গায় ভাল। খোঁজ পেয়ে সন্ধ্যার দিকে নাজমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো এবং সামান্য অনুরোধ করবার পরই সামান্য ক্ষণের বিশ্রামে তিন চারটা গান শুনিয়ে সকলকে মোহিত করলো। নাজমার দিকেই তার নজর বেশী।

নাজমার আব্বা আম্মা উভয়েই মাহবুবের প্রতি খুব প্রীত। বাজারে ছেলেটার পণ্য-মূল্য বেশ চড়াই হবে। তাঁদের মেয়ের সঙ্গে বেমানানও হবে না।

অতএব যখন সে প্রস্তাব করলো সকলে মিলে সিনেমা যাবার, প্রত্যেকেই সহাস্যমুখে রাজী হয়ে গেলো। চটপটে ছেলেদের এমনিই চাতুরিমা।

কাপড় চোপড় পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজবার সময় নাজমার হঠাৎ আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। বেচারা মজিবুল। এ গরমে বোধ হয় হাঁস ফাঁস করছে। খুলনায় কয়দিন কিন্তু মন্দ কাটে নি, যাই বলো। অবশ্য কলকাতায় এলেই মন কেমন বদলে যায়। কোলাহল ভালো লাগে, কোনও অন্তরঙ্গের কথা ভাববার মত অবসর হয় না। ভিড়, রকমারি দোকান ধনী শহরের আবরণহীন দম্ভ, ট্রামে চড়া, সন্ধ্যা হলে আলোর শোভা সব কিছু ভারী ভালো লাগে,— অনেকটা প্রথম প্রেমে পড়বার মতো। তবে কয়েক মুহূর্তের অবসর যখন পাওয়া যায়, তখন মন খোঁজে নীরবতার শান্তি। কোলাহলহীন আরাম। একটু চাপা হলেও, ছেলে মজিবুল মোটামুটি ভালোই। ফাৎরা নয়, চটুলও বোধ হয় নয় তেমন; তবে মন পরিষ্কার, হৃদয় গভীর। যে-সন্ধ্যায় সুন্দরবন অভিমুখে তারা রওয়ানা হয়, লঞ্চের উপরের ডেকে বসা মজিবুলের মুখের ভাব তার স্পষ্ট মনে পড়ে। আকাশে জমছিলো মেঘ, বাতাসেও এসেছিলো তীব্রতা, আর ভাব-গভীর মুখে মজিবুল চেয়েছিলো আকাশের দিকে, অনেকটা সম্মোহিত ভঙ্গীতে। তখন তাকে ভারী আদর করতে ইচ্ছে করছিলো।

সাজা শেষ হয়। আম্মা তাড়া দিচ্ছেন। ঠোঁটে লিপস্টিকটা একটু পাতলা করে নাজমা সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং প্রায় প্রত্যেকেরই প্রশংসাসূচক দৃষ্টি কুড়ায়।

নীচ থেকে একজন কে এসে বলে ঃ মজিবুল ভাই এসেছেন।

নাজমার মন সহসা কেমন করে ওঠে। আম্মা বলেন ঃ চা দিতে বলো।

মাহবুব গটগট করে নীচে নেমে গিয়ে মজিবুলকে আমন্ত্রণ জানায় ঃ আমরা সকলে সিনেমা যাচ্ছি, আপনিও চলুন।

আমন্ত্রণের এ-আকস্মিক ধরনে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে মজিবুল বলে ঃ জী না, আমি এখন যাব না, আপনি ভাল আছেন ত?

—পর্বত চূড়ায় আছি, পর্বত চূড়ায়, আচ্ছা সময় আর নেই, আবার দেখা হবে, কি বলেন? বলে যেমন ঝটিকার মত এসেছিলো তেমনি ঝটকা দিয়েই মাহবুব আবার উপরে চলে গেল। মজিবুল যখন চা খেতে বসেছে নাজমারা সকলে তখন সিনেমার অভিমুখে রওয়ানা হল। বড় শূন্য মনে হোল নিজেকে মজিবুলের।

(৩)

এই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঃ নাজমা যতক্ষণ কাছে ছিল কিছুই মনে হয় নি, অথচ তার অভাব কি গভীরভাবে এখন মজিবুল অনুভব করছে। নাজমার খালা আম্মাদের ওখান থেকে চা খেয়ে বাড়ী ফিরবার সময় মজিবুলের কাছে এমন জনতাবহুল কলকাতা শহরটাও কেমন খাপছাড়া ভাবে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

মনকে এমনভাবে উদাস করে দেয় যে অনুভূতি, নাজমাকে কেন্দ্র করেই তা মজিবুলের অজ্ঞাতেই প্রস্ফুটিত হয়েছে, শিশির-বিন্দুতে সিক্ত হয়ে রাত্রির গোপনতায় ফুল যেমন বাড়তে থাকে। ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকায় মজিবুল লক্ষ্য করবার সুযোগ পায় নি। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেও আরম্ভ করেছে, শরীর ও মনকে যা জুড়িয়ে দেয়। ফুলের আচমকা সৌরভ দূরান্তরের স্বপ্ন বহন করে আনে।

বাসায় পৌঁছাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই জোর দিয়ে বৃষ্টি নামলো সমস্ত কিছু ঝাপসা করে। বিদ্যুতের ঝলকানি ও বাজের ডাক এবং অবিশ্রান্ত বৃষ্টির তীব্র বেগে সব মিলে মনকে বিচিত্র ভাবাবেগে আচ্ছন্ন

করে দেয়। বৃষ্টির নির্জনতায় ও গভীরতায় হৃদয়ের ছবি নূতনভাবে ধরা দেয়।

পরদিন ভোরে ঝকঝকে রোদ ওঠে নূতন জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে। সূর্য কিরণের প্রসন্ন দীপ্তি সারা শহরকে ছেয়ে রেখেছে। মন তাজা হয়ে ওঠে।

মজিবুলের আম্মা ছেলের নাস্তা নিয়ে আসেন। তিন বোনের মধ্যে এক ভাই হওয়াতে বাড়ীতে মজিবুলের খাতির প্রচুর। আম্মা বলেন ঃ কনিজরা আমাদের এখানে এলো না? কনিজ নাজমার আম্মার ডাক নাম।

—তাত তুমিই ভালো জানো মা। মজিবুল বলে।

—ওরা সকলে খুলনা ফিরে যাবে কবে? আম্মা আবার প্রশ্ন করেন।

—কালকে বোধ হয়। মজিবুলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—গিয়ে দাওয়াত করে আয় না, তোকে এত খাতির করেছে, এখন তাদের কিছুটা খাতির না করলে ভাববে কি?

—আমি ত বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি মা, না এলে কি করবো?

—নাজমাকে বহুদিন দেখি নি, দেখতে ইচ্ছা হয়, কেমনটি হয়েছে! বলে মা ঘরের অন্য কাজে আবার চলে যান।

আম্মা চলে গেলে মজিবুল ভাবতে বসে ঃ গত কয়দিন ধরে নিজের মনকে সে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছে যে এখন তাকে এই ভাব-বিলাস থেকে ছাড়িয়ে আনা ভার। কিই বা এমন অসাধারণ মেয়ে নাজমা. কতটুকুই বা তার সঙ্গে জানাশোনা। আর তাকেই নিয়ে সে মনে মনে এত বাড়াবাড়ি করেছে, ফুলের সৌরভের মধ্যে দূরান্তরের স্বপ্ন খুঁজেছে—পুরুষের মন বড়ই অনিশ্চিত।

কি মজিবুলের ভাবনা, অভাব তার কিসের? খুলনা ফিরে যাবার আগে নাজমার সঙ্গে তার আর একবার দেখা হোক বা না হোক কি যায় আসে শেষ পর্যন্ত তাতে। খুলনায় কয়দিন সময় অবশ্যই ভালো কেটেছিলো, নাজমার সাহচর্য তাকে আনন্দও দিয়েছিলো—তাই বলে নাজমার অভাবে তার আনন্দের আশ্রয় একেবারে মুছে যাবে এমন কোন ভাবনাই মনে স্থান দেওয়া হাস্যকর।

তারা-ঝলকানো আকাশ, অবিরাম বিস্ময়ে ভরা দুনিয়া, প্রত্যেকটি দিনের নূতন ও অফুরন্ত সম্ভাবনা একটি মেয়ের সঙ্গ অভাবে মিথ্যে বা ঐশ্বর্যহীন হয়ে যাবে এ-কথা কেমন করে ভাবা যায়।

তাই মজিবুল 'ম্যাটিনী' শো'তে সিনেমা দেখতে গেল, হাল্কা মনে। ছবি দেখা শেষ হলে নূতন এক অনুভূতির রেশ মজিবুলের মনে আনা-গোনা করতে থাকে। মাউরিন ও হারার স্নিগ্ধ রূপ, কাহিনীর মধ্যে সৌন্দর্যের সম্ভাবনা ও স্ফুরণ! আড়ষ্টহীন অভিনয় চিত্তকে নানা-ভাবে দোলা দেয় আর মনে করিয়ে দেয় কিসের এক অভাব যার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করবার সাধু সঙ্কল্প আবার যায় ভেস্তে। মাউরিন ও হারার সঙ্গে নাজমার সাদৃশ্যের কথা কল্পিত হলেও, মনে হয়। না, এ এক ল্যাঠা বটে।

বাসায় পৌঁছে গেটের সামনে নাজমাদের মোটর দাঁড়ানো দেখে মজিবুলের বুকটা হঠাৎ ধড়াক করে ওঠে। বসবার ঘরে প্রবেশ করে দেখা হয় মাহবুবের সঙ্গে, ইউনিফর্ম পরা। প্রকাণ্ড হেসে দরাজ গলায় বলেঃ আপনি ত আর আমাদের খোঁজই নিলেন না, তাই আমরা এলাম।

মাহবুবের মুখে 'আমরা' কথাটা মজিবুলের মোটেই পছন্দ হোল না। নাজমাকে নিজের দলে সে কি ভাবে ধরে নিলো। আশ্চর্য বেহায়া ত! বাইরে বললোঃ আপনি একটু বসুন, ঝট করে কাপড়টা বদলিয়ে আসছি। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই দেখা হয় নাজমার সঙ্গে, বোন খালেদার সঙ্গে গল্পরতা। নাজমার চোখ দুটিতে বুক জুড়ানো শান্তি, মুখে—এক লহমা দেখে মনে হোল কিছুটা বিষাদের অভিব্যক্তি! মজিবুলের দিকে পূর্ণ ও গভীর দৃষ্টি তুলে নাজমা বলেঃ কেমন আছেন?

ছোট্ট দু'টি শব্দ। কিন্তু কি মাধুর্যে ভরা! কোমল স্বরে মজিবুল বলেঃ ভাল। তুমি কেমন আছ?

উত্তরে খালি নাজমা বিষণ্ণ হাসি হাসে। আর তা লক্ষ্য করে নাজমার প্রতি গভীর মমতায় মজিবুলের মন ভরে ওঠে। এরকম এক জীবন-সঙ্গিনী পাওয়া মন্দ নয় যে দু'একটি ছোট্ট কথায়, হাসির যাদুকরী ভঙ্গীতে মন থেকে সমস্ত ভার তুলে নিবে।

কাপড় বদলিয়ে মজিবুল বসবার কামরায় ফিরে যায়। মাহবুব তখন একটা চেস্টারফিল্ড সিগ্রেট সবেমাত্র ধরিয়েছে। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক ঝলক চেয়ে মজিবুল এই ভেবে স্বস্তি বোধ করে যে, তাদের দু'জনের মধ্যে বাছতে হলে নাজমা নিঃসংশয়ে তাকেই পছন্দ করবে। খালি সৈনিকের পোশাক পরলেই বিশিষ্ট হওয়া যায় না।

চাকরকে ডেকে পরম বদান্যতার সঙ্গে লেফটেনেণ্ট সাহেবের জন্য চা আনতে আদেশ করে মজিবুল।

নাজমারা সকলে চলে গেলে আম্মা বলেন: শুনেছিস মজিবুল; নাজমার সঙ্গে মাহবুবের সাদী ঠিক হয়ে গেছে।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে মজিবুলের মনে। আম্মার দিকে বিহ্বল শূন্য দৃষ্টি মেলে সে অনেকটা অবোধ শিশুর মত চেয়ে থাকে। সহসা তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে সুন্দরবনে 'টাইগার পয়েণ্ট'–এর কাছে যে নদী এঁকে বেঁকে সমুদ্র হয়েছে তার ছবি, যেখানে এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় আলো-অস্পষ্টতা রচনা করেছিলো বিচিত্র এক কুহক।

দাদী আম্মা

ভোরে সকলের থেকে আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন দাদী আম্মা। উঠে উজু করে নামাজ পড়েন, তারপর অন্তত আধ ঘণ্টা যাবত কোরান চর্চা করেন। তাঁর কোরান পড়বার ভঙ্গীর মধ্যে ধরা পড়ে নিষ্ঠাবতী ধার্মিকার একাগ্রতা; সুগভীর বিশ্বাসের ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর ভাবালু মুখের প্রতিটি রেখায়।

ধর্মকাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা করে তিনি মন দেন সংসারের কাজে। পরিচ্ছন্নতা ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। এই ষাট বৎসর বয়সেও কাজ তিনি অজস্র উৎসাহের সঙ্গে করে যান। তাঁর কাজের বহর দেখে যুবতী দৌহিত্রীরাও অবাক মানে। শরীরের গাঁথুনী তাঁর আশ্চর্য রকমের শক্ত; গত দশ বৎসরের মধ্যে একবারও ভুল করেও তিনি অসুখে পড়েন নি। সারাদিন প্রায় অবিশ্রান্ত খেটেও তিনি তাঁর স্বাস্থ্যকে এখনও এতটা ভাল কি করে রেখেছেন তা এক রহস্য।

মুখে তাঁর এখনও একরকম ঝলক-এর সন্ধান পাওয়া যায় যা দেখে অনেক যুবতী সুন্দরীদেরও মনে মনে ঈর্ষা হয়। তাঁর গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধানো। চামড়ায় আগেকার সেই মসৃণতা অবশ্য এখন আর নেই, তবুও অতীত ইতিহাসের ঐশ্বর্য এখনও সম্পূর্ণ হতশ্রী হয় নি। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, তাঁর কেশগুচ্ছের একটি চুলও পাকে নি, গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত তাঁর কেশদাম যৌবনের স্মৃতিকে এখনও অলক্ষ্যে বহন করছে।

দৌহিত্রীদের মধ্যে রেজিয়াকেই দাদী আম্মার সব চেয়ে বেশী পছন্দ। তার একটি কারণ অবশ্য রেজিয়া অবিবাহিতা, অথচ বিবাহ-যোগ্যা। আর সব কয়টি দৌহিত্রীরই সংস্থান হয়ে গেছে। বিবাহে রেজিয়াকে উত্তীর্ণা করবার নিমিত্ত চেষ্টা চরিত্তির এখন থেকেই কিছু কিছু চলেছে, কারণ ইতিমধ্যেই রেজিয়ার শরীর বড্ড বেহায়া রকমে জানান দিতে আরম্ভ করেছে। খুঁতের মধ্যে রেজিয়ার গাত্রবর্ণটা একটু

শ্যামলা। ঠাট্টাচ্ছলে রেজিয়া বলে ঃ দাদী আম্মা, তোমার অমন সোনার মত তকতকে গায়ের রঙ্ তার কিছুটা আমায় ধার দাও না কেন, বতে যাই।

দাদী আম্মা হেসে বলেন ঃ আমায় দেখে হিংসে হয় তোর, শ্যামলী মেয়ে বলে মন তোর গুমরে মবে নাকি? তা হিংসে করো না শ্রীমতী, কালোই ভাল, কথায় বলে কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো ⋯ওরে ও নাকখেঁদী, তোকে এই ঘাঁটিতে বললো কে? দাদী আম্মা শেষের কথাগুলো বিহ্বলিত নূতন দাসীর মুখে ছুঁড়ে মারেন।

দোষটি ঠিক চাকরানীর নয়। রান্নাঘরের কি এক কাজের জন্য সে বইয়ের আলমারীর পেছনে সঞ্চিত পুরানো কাগজ নেবার চেষ্টা করছিলো কতকগুলি বইকে বাইরে টেনে বের করে। বইগুলির ওপর দাদী আম্মার শ্যেন দৃষ্টি, প্রত্যেকটি বইয়ের প্রতিটি পাতায় তাঁর স্বামীর স্মৃতি জলজল করছে। টাকা তিনি এমন কিছু রেখে যেতে পারেন নি, বই রেখে গেছেন হাজারেরও বেশী। বেশীর ভাগ বইই ছিঁড়েটিড়ে গেছে, যে কয়টি অক্ষত আছে তাদের বনেদী চেহারা স্বল্পায়ুসূচক। তবুও অন্য কেউ সে-সব বইয়ে হাত দেয়, দাদী আম্মা এটা একদম বরদাস্ত করতে পারেন না।

চাকরানীর নাম ঠিক কি তা জানতে কেউ কোনদিন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি, সকলেই তাকে শাহাদিয়ার মা বলে ডাকে। চেহারা তার এমনি খারাপ, নাকটা আবার থ্যাবড়া বলে তাকে আরও কুৎসিত দেখায়। দাদী আম্মার ধমক শুনে সে বেচারী ক্ষণিকের তরে বোবা বনে যায়। কিছুক্ষণ পরে স্খলিত কণ্ঠে বলে ঃ কাগজ নিচ্ছিলাম, দাদী আম্মা।

চাকরানীর জবাব শুনে দাদী আম্মা আরও চটে যান ঃ তোর জন্য আমি কাগজ জমাই নাকি নেকী মাগী, খবরদার আর বইয়ের আলমারীতে হাত দিবি তুই, তা'হলে ঝাঁটা মেরে বের করে দিবো।

দাসীর অপরাধ এমন কিছু নয় যে দাদী আম্মার হঠাৎ এতটা রেগে যাওয়া শোভন হতে পারে। শাহাদিয়ার মা কিছু উচ্চবাচ্য না করে গোমড়া মুখে রান্নাঘরে ফিরে যায়। তার অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রেজিয়া দাদী আম্মার প্রতি বেশ কিছুটা অপ্রসন্ন হয়। চাকর-বাকরদের সঙ্গে দাদী আম্মার ব্যবহার, রেজিয়ার মতে, অকথ্য-

ভাবে খারাপ। দাদী আম্মার কোন এক আত্মীয়, শোনা যায়, নিজের বাঁদীকে বিবাহ করে স্ত্রীকে অবহেলা করেছিলেন। রেজিয়া নীরবে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে সংগোপনে চাকরানীকে বললো ঃ তুমি কিছু মনে করো না শাহাদিয়ার মা, দাদী আম্মার কথা বলবার ধরনই ওরকম, নূতন এসেছো তুমি, বইয়ের আলমারী ঘাঁটতে-টাটতে যেও না, বুঝলে?

রেজিয়ার সহানুভূতি জানানোর ধরন দেখে শাহাদিয়ার মার মনে আর কোন ময়লা থাকে না।

দৌহিত্রদের মধ্যে যাকে দাদী আম্মা মনে মনে এখনও সব চেয়ে বেশী ভালোবাসেন সে কিন্তু বলতে গেলে তাঁর পরই হয়ে গেছে। দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে কৃচিৎ। ভালো চাকরি এবং সুন্দরী বউ পেয়ে দুনিয়ার আর কোন জিনিসের প্রতি যেন তার ভ্রূক্ষেপও নেই। দৌহিত্রের অবহেলার জন্য তিনি দায়ী করেন তার যুবতী বধূকে যে দাদী আম্মা ও তাঁর প্রিয় দৌহিত্রের মধ্যে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছে। বধূ সুন্দরী বলে দাদী আম্মা তার প্রতি অধিকতর বিরূপ। এই এক অসন্তোষ দাদী আম্মার মনে দানা বেঁধে আছে, স্মৃতির ঝলক খেলে গেলে অসন্তোষ রূপান্তর লাভ করে গভীর বিক্ষোভে ও বেদনায়।

বিবাহের পরে স্ত্রীকে নিয়ে মোহ্‌সিন একদিন দাদী আম্মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। সেদিন পরিষ্কার তিনি বুঝতে পারেন মোহ্‌সিনকে কি ভাবে তার স্ত্রী গ্রাস করেছে। অথচ মেয়েটির কথাবার্তায়, হাবভাবে এবং চালচলনে কোন খুঁত ধরবার জোটি নেই। বধূকে অপছন্দ করবার হাজারো চেষ্টা করেও সফলকাম না হতে পারায় দাদী আম্মা জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে মোহ্‌সিন সহজভাবে কথা বলতে পারে নাই। ব্যবহারের মধ্যে কেমন তার আড়ষ্টতা ছিলো, কেমন একটা কুণ্ঠিত, বিব্রত, অস্বচ্ছন্দ ভাব। বরং তার স্ত্রীই দাদী আম্মাকে কথাবার্তায় মোহিত করবার চেষ্টা করেছিলো।

মোহ্‌সিন তাঁকে কদমবুসী করবার পর দাদী আম্মা জিজ্ঞেস করে-ছিলেন ঃ কেমন আছ দাদা, এতদিন পরে বুড়ী দাদীকে তোমার মনে পড়লো?—মোহ্‌সিন খালি বিব্রত ধরনে কিছুটা বোকার মত হেসে-ছিলো।

বধু কিন্তু ঝট্ করে বলেছিলো : আপনি দাদী আম্মা আমাদের বাসায় একটিবারও এলেন না, আমাদের এত পর ভাবেন আপনি? কথা বলা শেষ করে মোহ্সিনের স্ত্রী সুন্দর ধরনে হেসেছিলো। বাধ্য হয়ে দাদী আম্মাকে বলতে হয়েছিলো : শোন পাগলীর কথা শোন, ঘরের সব দেখাশুনা করে কি আমার আর মরবার ফুরসত্ থাকে যে আমি একটু বাইরে গিয়ে মনে চেয়্ন পাবো। সে-কথার ত্বরিত জবাব বউ এই বলে দিয়েছিলো : আমাদের এখানে এসে কয়েকদিন থাকুন না দাদী আম্মা, কাজ আমার অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।

মনে মনে দাদী আম্মা ভেবেছিলেন : আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার। তাই অগত্যা তাঁকে প্রসঙ্গ-পবিবর্তন করতে হয়েছিলো।

মোহ্সিনের ছোট ভাই শম্সের দাদী আম্মার আর একজন প্রিয়পাত্র। বিশেষ করে মোহ্সিনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অবস্থার গতিতে একটু বক্র হয় যাওয়ার পর থেকে শম্সের দাদী আম্মার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। শম্সের যে তাঁর সব নির্দেশ মেনে চলে এমন নয়, তবু শম্সের-এর অনেক কয়টি গুণ। এমন শান্ত প্রকৃতির ছেলে খুব কম দেখা যায়। একজনের কথা অপরকে গিয়ে বলবার অভ্যাস একেবারে নাই। তাই মন খুলে তাকে সব কথা বলা যায়। সম্প্রতি ভালোভাবে এম, এ, পাস করাতে বাজারেও তার দর চড়া। আর তার মুখে এমন একটি অর্ধকরুণ অর্ধউদাসীন ভাব অথচ এমন একটা সূক্ষ্ম মাধুর্য আছে যে তাকে কিছুটা না ভালোবেসেও উপায় নেই।

একদিন শম্সের এসে হাজির।

দাদী আম্মা কোরান শরীফ পড়ছিলেন। শম্সেরকে দেখে বললেন : বসো দাদা একটু, আমি পড়াটা শেষ করে নি।

শম্সের একটা টুল টেনে নিয়ে তার উপর বসে। দাদী আম্মার কোরান পড়া শেষ হতে দেরী হয় না। বড় আলমারীর ওপর সযত্নে কোরান তুলে রেখে বলেন : মিষ্টি খাবে কিছু?

মাথা নাড়িয়ে শম্সের জানায় মিষ্টির জন্য সে লালায়িত নয়।

কি দিয়ে নাস্তা করলে আজকে? দাদী আম্মা প্রশ্ন করেন।

মাখন রুটি আর চা। শম্সের-এর নির্লিপ্ত উত্তর।

খাও না একটু হালুয়া, খাবে?

খাওয়ার ব্যাপারে তাকে কেউ পীড়াপীড়ি করলে শম্‌সের মনে মনে চটে যায়। মেয়েমানুষদের এই একটা অসহ্য খারাপ স্বভাব! এলো-মেলো ধরনে বলেঃ না দাদী আম্মা, এখন কিছু খাবো না, পরে একদিন এসে খেয়ে যাবো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দাদী আম্মা বলেনঃ তোমাকে কয়েকদিন থেকে ডাকছি দাদা, আসো নাই যে!

কই আমাকে ত কেউ কিছু বলে নাই। বিস্মিত হয়ে শম্‌সের বলে।

তাহের তোমায় কিছু বলে নাই? দাদী আম্মা অধিকতর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

না তো।

তাহেরটা আচ্ছা ভোলা লোক, কতদিন থেকে বল্‌ছি তোমাকে একটু খবর দিতে, তা কি ওর খেয়াল আছে!

দাদী আম্মা একটু হালুয়া মুখে দিয়ে পানি খেয়ে বললেনঃ মোহ্‌সিন মাইনে পেয়েছে?

বোধ হয় পেয়েছে আমি ঠিক জানি না।

পেয়ে থাকলে বোলো ত। মাসে মাসে আমায় পাঁচটা করে টাকা দিতো, এ মাসে আর দেয়নি কেন? শম্‌সের সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর দাদী আম্মা আবার বলেনঃ তোমরা জিজ্ঞেস করো আমার এত টাকার দরকার কিসের? টাকার দরকার যাই থাকুক, তোমরা তা জিজ্ঞেস করতে যাবে কেন? টাকা দিয়ে তোমরা বরং আমার দোয়া নিবে।

শম্‌সের নীরব থাকে।

এককালে মোহ্‌সিন-এর আমি কম করেছি, ওকে কখনও মায়ের অভাব বুঝতে দিয়েছি? তার পেস্‌সাব করা কাঁথা পর্যন্ত কেচেছি আমি, আর ওই মোহ্‌সিন দু'শ টাকার চাকরি পেয়ে আজকে আর আমাকে পুছেও না, মাসে পাঁচ টাকা করে নিয়মিত দিতেও ভুলে যায়। তুমিও কি দাদা চাকরি পেয়ে আমায় এমন তাচ্ছিল্য করবে? শেষের দিকে দাদী আম্মার গলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে। কি বলবে সম্‌সের তা ঠিক করতে না পেরে দাদী আম্মার দিকে কেমন এক ধরনে চেয়ে থাকে।

রেজিয়াকে নিয়েই দাদী আম্মার ভাবনা আজকাল সব চেয়ে বেশী। মেয়েটির গড়ন ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, মুখশ্রীও সুন্দর, দোষের মধ্যে রঙটা যা একটু শ্যামলা এবং পড়াশুনা কম। ছেলেদের যা দেমাক হয়েছে, লেখাপড়া না জানা মেয়েদের ঘরে আনতে চাইবেন না, চাইবেন এমন মেয়ে যে আই, এ, বি, এ, পড়া, সুকন্ঠী গায়িকা, শিরী-সমা রূপসী এবং আরও কত কি? কেন বাপু, এত দেমাক কেন, লেখাপড়া নিয়ে কি আর ধুয়ে খাবে। যে মেয়ে রান্না ভালো জানে, ঘরের কাজ করতে নিপুণা, স্বাস্থ্যবতী, নম্রস্বভাবা, তার দিকে ফিরেও তোমরা তাকাবা না, আর যে মেয়ে ঠটর ঠটর করে কথা বলতে পারে, কটাক্ষে বিহ্বল করতে পারে, নাচতে পারে, পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে তার পিছনেই ঘুরে মরবা। মরণই তোমাদের ভালো।

শম্সের-এর ওপর এককালে দাদী আম্মার নজর ছিলো। তবে এত ঘেঁষাঘেঁষি বিয়ে হওয়াটাও ঠিক নয়। আর শম্সের, ছেলেটা ভাল হলেও তার মতিগতি বুঝে ওঠা ভার। দাদী আম্মা ঠিক করেন শম্সের-এর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ উপযুক্ত পাত্র আছে কিনা তা একদিন তার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে। বেশীদিন রেজিয়াকে অবিবাহিতা রাখা কিছুতেই ঠিক হবে না। বয়সকে বিশ্বাস নেই।

দাদী আম্মা বাজার সামনে নিয়ে তদারক করতে বসেছেন এমন সময় শম্সের এসে হাজির হয়। বলে ঃ দাদী আম্মা, আমায় নাকি আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বসো দাদা বসো, আমি একটু বাজারের হিসেবটা নিয়ে নি।

শম্সের কোণের চৌকিটার ওপর গিয়ে বসে।

কিছুক্ষণ পরে তার কাছে এসে বসে দাদী আম্মা বলেন ঃ কি ভাই আর যে তোমার খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না।

একটু বিব্রত ধরনে হেসে শম্সের বলে ঃ কাজে কয়েকদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম।

যে কামরাটার মুখোমুখি হয়ে চৌকিটি অবস্থিত সে কামরায় বড় আলমারীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রেজিয়া কেশ-বিন্যাস করছিলো। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে শম্সের আবার দাদী আম্মার দিকে মুখ ফেরায়।

তিনি বলেন ঃ একটু 'ফিরনি' খাবে?

শম্সের 'না' বলতে পারে না।

দাদী আম্মার কামরায় এসে শম্‌সের 'ফিরনি' খেতে বসে। দাদী আম্মা 'সোরাই' থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে এনে দেন।

মোহসিন আবার একদম আসা বন্ধ করে দিয়েছে কেন, বুড়ী দাদীকে বুঝি তার আর মনে পড়ে না ?

এ-ব্যাপারে শম্‌সের নীরব থাকাই সঙ্গত মনে করে।

দাদী আম্মা বলে যান : তোমাদের সকলের জন্যই আমি কোরান শরীফ পড়ে দোয়া চাই আর তোমরা আমাকে একদম 'পুছও' না।

শম্‌সের হাসে অবিশ্বাসের এক মনোরম ভঙ্গীতে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর দাদী আম্মা অন্য এক প্রসঙ্গ ঈষৎ অতর্কিতভাবে উত্থাপন করেন। বলেন : রেজিয়াকে নিয়েই আমি সব চেয়ে মুস্কিলে পড়েছি এখন, বয়স হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে অথচ শাদীর কথাবার্তাই উঠছে না ··তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ এমন আছে যার সঙ্গে কথা তোলা যায় ? মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করলেও বাইরে মুখের প্রসন্ন ভাবটা বজায় রেখে শমসের বলে : এখন ত' তেমন কাউকে মনে পড়ছে না, খোঁজ করে দেখবো'খন!

এদিকে একটু নজর রেখো দাদা, রেজিয়ার শাদী হয়ে গেলে মন থেকে মস্ত এক ভার আমার নেমে যায়।

দরজা খুলে শমসের বাইরে বেরুবে এমন সময় পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে তার কাছ দিয়ে রেজিয়া ভিতরের কামরায় চলে যায়। যাবার সময় তার দিকে ঈষৎ রোষায়িত ও মৃদু অনুযোগের দৃষ্টিতে রেজিয়া তাকিয়েছিলো। সে-দৃষ্টির সামনে হঠাৎ কেন যেন শমসের কিছুটা অপরাধী বোধ করে।

শম্‌সেরের আত্মীয়-মহলে বেশ একটা গুঞ্জন পড়ে যায়। সে নাকি সৈনিকদলে নাম লিখাতে মনস্থ করেছে। এমনি শমসের ছেলে বেশ ভালো, তবে বৎসরান্তে একবার তার মাথায় এমন একটা খেয়াল ঢোকে যে তা' থেকে কিছুতেই তাকে বিচ্যুত করা যায় না। সকলের ঐকান্তিক এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ, উপদেশ ও অনুনয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একদিন সে বেরিয়ে পড়ে 'ফর্ম' আনবার জন্য। ফর্ম নিয়ে বিকেলের দিকে বীরদর্পে সে ফিরে আসে। আশঙ্কা বাস্তবতায় পরিণত হবার উপক্রম করতে দেখে বাবা শোকাকুল হন, ভাইরা হয়

সচকিত, বোনরা প্রায় কাঁদতে বসে, বন্ধুরা ভাবে হৃদয়-ঘটিতে কোন ব্যাপার শম্‌সেরকে মরণের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

মোহ্‌সিন শম্‌সেরকে বোঝায়ঃ তোমার ভাবনা কি, 'আর্মী'তে তুমি কেন যাবা ?

এখানকার আবহাওয়া আমার ভালো লাগে না। শম্‌সের কেমন এক ধরনে কথা বলে।

একটা বিয়ে থা করো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মোহ্‌সিন সমস্ত জিনিসটিকে একটু হাল্কা করে দিতে চায়।

ভাইয়ের দিকে শম্‌সের রূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়।

বাবা শম্‌সেরকে নিরস্ত করতে এসে প্রায় তিরস্কৃত হন। ভাবীকেও শমসের নম্রভাবে জানিয়ে দেয়, তার কিসে ভালো হবে সে চিন্তা তার ওপর ছেড়ে দেওয়াই প্রশস্ত। দাদী আম্মা তাকে বহুবার ডেকে পাঠান, সে কথা শম্‌সের কানেই তোলে না। বেশ একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এই নাটকীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব লাঘব করতেই বোধ হয় খোদা-তালা মোহ্‌সিনকে অসুখে ফেলেন। অসুখটা অবশ্য এমন কিছুই নয়, কিন্তু মোহ্‌সিন সহজেই ঘাবড়িয়ে যায়। বিশেষ করে শম্‌সের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা অসুখটাকে খুব শীঘ্রই বাড়িয়ে তুলে। ভাবী প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে বলেন, শমসের, তুমি ভাই কয়েকদিনের জন্য অন্তত চুপ করে থাকো, না হলে তোমার ভাইয়ের অসুখ নাও সারতে পারে।

এ-সব পান্‌সে হৃদয়াবেগের মূল্য শম্‌সেরের কাছে কিছুই নয়, তবুও যুবতী নারীর অজস্র অশ্রুধারার মধ্যে কেমন একটা সৌন্দর্য আছে।

ডামাডোলে পড়েন দাদী আম্মা। তিনি ঠিক করেছিলেন শম্‌সেরদের বাসায় গিয়ে তিনি যেমন করে হোক তাকে বুঝিয়ে আসবেন যে তার হঠাৎ 'আর্মী'তে যোগদান করবার এমন কিছু কারণ ঘটে নাই। কিন্তু মোহ্‌সিন অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। একদা মোহ্‌সিন সম্বন্ধে দাদী আম্মার স্নেহোচ্ছ্বাসের কোন বাঁধন ছিলো না, এখন তার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছেন—হৃদয় তাঁর কঠিন হয়েছে। অবশ্য তিনি মনে প্রাণে চান মোহ্‌সিন নিরাময় হয়ে উঠুক, আজকে কোরান শরীফ পড়বার পর তিনি তার জন্য দোয়াও চাইবেন। তবে যে তাঁকে এতদিন উপেক্ষা করে এসেছে, সুন্দরী স্ত্রী

পেয়ে তার নিজের দাদী আম্মার অতীতের অক্লান্ত সেবার কথা একেবারে ভুলে গেছে, তার ওখানে, করলোই বা তার অসুখ, আজকে তিনি উপযাচিকা হয়ে কেন যাবেন? তাঁর কি মান-সম্ভ্রম বোধ নেই।

অথচ ওদিকে শম্‌সের গোঁ ধরে বসেছে সিপাহীদলে নাম সে লিখাবেই, বেঁচে থাকতে দাদী আম্মা যা হতে দিতে পারেন না। এক এক সময় শম্‌সের এমন এক জেদ ধরে বসে যে তা থেকে তাকে টলানো মুস্কিল। এত ডাকাডাকি করবার পরও সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে নাই। কি যে করবেন দাদী আম্মা বুঝে উঠতে পারেন না।

রেজিয়া এক সময় এসে বলে, দাদী আম্মা, আম্মারা সব মোহ্‌সিন ভাইকে দেখতে যাচ্ছেন, আপনি যাবেন না?

দাদী আম্মা সমস্যায় পড়েন, বলেন: তা তোমরা এখন যাওগে, আমি না হয় আর এক সময় যাবো।

দাদী আম্মার কথায় রেজিয়া খুশী হতে পারে না; কিছু না বলে সে চলে যায়। দাদী আম্মা বুঝতে পারেন, রেজিয়া তার ওপর বিরক্ত হয়েছে।

রেজিয়ারা চলে গেলে দাদী আম্মা আবার ভাবতে বসেন: মোহ্‌সিন-এর অসুখটা কেমন হয়েছে কে জানে! ওদিকে আবার শম্‌সের-এর ধনুর্ভঙ্গ পণ। ওদের ওখানে যেতেও সম্ভ্রমে বাধে, অথচ না গেলেও স্নেহ তাড়া দেয় ও মন জ্বালা করে। এ এক আচ্ছা ঝক্‌কি যাহোক।

সব সংশয়ের নিরসন হয়ে যায় যখন মোহ্‌সিন-এর যুবতী বধূ এসে, যার ওপর মনে মনে দাদী আম্মা এত চটা, তাঁর পা ধরে বলে: চলুন দাদী আম্মা, আপনি না গেলে ওঁর অসুখ সারতে অনেক সময় নিবে।

ক্ষণিকের তরে দাদী আম্মা বধূর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চান। কিন্তু নাত্‌ বউয়ের চোখে তিনি খালি দেখতে পান সকাতর অনুনয়। আজকে দাদী আম্মার নির্জলা সাফল্যের দিন। এই দৃশ্যটি দেখবার জন্যই তিনি অনেক অনেক দিন অপেক্ষা করেছেন। বধূর

আনত চিবুকে হাত দিয়ে দাদী আম্মা কোমল স্বরে বলেন : বসো তুমি বউ, আমি নামাজটা পড়ে নি।

দাদী আম্মাকে দেখতে পেয়ে মোহ্‌সিন তাঁর হাতটা নিজের উত্তপ্ত কপালে রেখে অনেকটা নেশার স্বরে বলে : আমার ওপর রাগ করেছেন আপনি দাদী আম্মা, তা'হলে আমি ঠিক মরে যাবো। দাদী আম্মার চোখে মোহ্‌সিনকে এখন আগেকার সেই অবোধ বালকের মত দেখায় যাকে তিনি সব সময় স্নেহচ্ছায়ে ঘিরে রাখতেন। যতই বড় হোক এখন মোহ্‌সিন, তাঁর চোখে সে কিন্তু সে বালকটিই আছে।

গভীর মমতার সুরে দাদী আম্মা বলেন : কিছু ভেবো না দাদু, আল্লা তোমায় ভালো করে দিবেন। তাঁর কথায় কামরার আবহাওয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, সকলের মুখেই দেখা যায় আনন্দাভিব্যক্তি।

শম্‌সের-এর ওপর সহসা দাদী আম্মার চোখ পড়ে। রেজিয়ার দিকে সে অনেকটা আবিষ্টের মত চেয়ে আছে।

তা লক্ষ্য করে দাদী আম্মার মুখে আর হাসি ধরে না।

নবমেঘভার

লোকে আশ্চর্য হয়ে ভাবে ঃ শাহেদ এখনও বিয়ে করে নি কেন ? শাহেদের বন্ধুদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তারা বন্ধুর এই বন্ধনহীন সচ্ছলতাকে প্রসন্নচোখে দেখতে পারে না। প্রত্যেকেই বিবাহ করতে খালি পরামর্শই দেয় না; লোভনীয় পয়গামের সম্ভাবনার কথাও কৌশলে উল্লেখ করে। বাস্তবিকই শাহেদের এখনও অবিবাহিত থাকাটা প্রায় অসামাজিক গোনাহ। কারণ, প্রথম কথা, মাসে তার সাড়ে-তিনশো টাকা মাইনে। বছর চার আগে কলকাতার এক বিখ্যাত ইউরোপীয় ফার্মে কর্মনবীশ হিসাবে প্রবেশ করে নিজের অসামান্য কর্মদক্ষতায় ও চটপটে কথা বলবার হৃদয়গ্রাহী নৈপুণ্যে, সে ইতিমধ্যেই বড় সাহেবদের প্রশংসালাভে এবং নিজের উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেখতে সে এমন কিছু অপরূপ না হলেও তাকে দেখে মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে নিবে, এমন চেহারাও তার নয়। পরন্তু সে উচ্চশিক্ষিত, সহৃদয়, দিল-খোলা এবং পরের উপকার করতে, সম্ভব হলে, সর্বদাই প্রস্তুত। শেষোক্ত গুণ বা দোষের জন্যই, কারণ জিনিসটা আপেক্ষিক, শাহেদের এখনও শাদী করা শখ থাকলেও সম্ভব হয় নাই।

প্রথম স্তরে অবশ্য, চাকর। যুদ্ধ শেষ হলেও যার মহিমা এখনও অপরিম্লান। বিশেষ করে যাদের বিবাহ হয় নাই তাদের রক্ত চুষে খায় সমাজের এই বিশেষ শ্রেণীর জীব।

তহুর শাহেদের চাকর, মাইনে দশ টাকা পেলেও প্রত্যেক মাসে বাড়ীতে পাঠায় ত্রিশ টাকা। আর মনি অর্ডারের ফর্ম শাহেদের কাছ থেকেই লিখিয়ে নিয়ে যায়। বাজারের হিসেবে প্রত্যেক দিন দশ-বারো আনা এদিক ওদিক হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার—লক্ষ্য করাটাই অশোভন এবং তা নিয়ে কিছু বলাও অভাবনীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয়।

দেশ থেকে যখন প্রথম তহুরকে শাহেদ নিয়ে আসে, মুনিবের জন্য জান দিয়ে খাটতো সে। প্রথম দিকে মাইনে ছিলো তার পাঁচ টাকা, বছর খানেকের মধ্যেই তা বেড়ে দশের কোঠায় দাঁড়ালো। দু'মাস অন্তর একটা গেঞ্জী বা গামছা বকশিস পেতো সে। খাওয়া দাওয়া মনের মত; মাঝে মাঝে খুচরা পয়সাও চলে আসতো নসিবগুণে।

তারপর, দিনকে দিন, বাজারের ফর্দ বাড়তে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে খরচার তালিকা! ক্রমে ক্রমে দেশে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে মনিবের সঙ্গে চাকর প্রায় টেককর দিতে লাগলো। চাকরির প্রথম দুই বৎসর শাহেদ প্রত্যেক মাসে দেশে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতো। তারপর পঁচাত্তর এবং গত বৎসর থেকে একশ'। তহুরের বাড়তির হার দশ–কুড়ি-ত্রিশ। একবার যখন তহুর মাসের তরা তারিখে শাহেদের কাছে মনিঅডার ফর্ম নিয়ে এলো, এবং বললো, টাকা তিরিশ দেশে পাঠাবে তখন হঠাৎ শাহেদের খেয়াল হল যে, গত তিন চার মাস থেকে তহুর দেশে নিয়মিত ভাবে টাকা তিরিশ পাঠাচ্ছে এবং তার সঙ্গতি এমন নয় যে সে, এত টাকা পাঠাতে পারে।

তাই চাকরের মুখ লক্ষ্য করে মনিঅর্ডারের ফর্ম ছুঁড়ে মেরে হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বলে: তুই হারামজাদা ত' কম বেহায়া ন'স। মাইনে পাস দশ টাকা আর দেশে পাঠাস তার তিন ডবল; আর নিমকহারাম ব্যাটা আমার কাছেই মনিঅডারের ফর্ম নিয়ে আসিস লেখাতে। চুরি করিস ত' জানি, কিন্তু উল্লুকের বাচ্চা সেটা এমন ভাবে জানান দিস কেন! আর কখনও যদি এমন করিস ত' জুতো মেরে তোকে তাড়িয়ে দিবো। ব্যাটা ন্যাঙ্গটা হয়ে ঘুরে বেড়াতো, এখন খাওয়া দাওয়া করে, কাপড় পরে, মাগী-বাড়ী গিয়ে নওয়াব শফিউল মুল্ক-এর শাহজাদার মত ভাব দেখায়। কেউটের বাচ্চা কোথাকার।

তহুর সমস্ত গাল মুখ বুজে শুনে কৃতার্থ ধরনে হাসে। কারণ সে জানে যে মনিবের এই অগ্ন্যুৎপাত সাময়িক—কিছুক্ষণ পরেই সব কিছু সে ভুলে যাবে।

যেমন আকস্মিক রেগে উঠেছিলো তেমনি সহসা প্রশমিত হয়ে শাহেদ বলে: যা ব্যাটা এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়।

আসল ব্যাপার হল এই: শাহেদের দিল্‌টা অত্যন্ত দরাজ। সাক্ষাৎ-ভাবে কারও কষ্টের সন্ধান পেলে হৃদয় তার নিমেষে ভিজে যায়। তার এই কোমল মনোবৃত্তিকে অনেকেই ব্যবসার মূলধন করছে

অপারগ নয়। মা বাপ তার দু'জনেই বহুদিন হল এন্তেকাল করেছেন। দেশে আছেন চাচী আর ফুপা। দু'জনেই শাহেদের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। এখন তাঁদের প্রত্যেককে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে না পাঠালে দুজনেই কড়া চিঠি লিখতে বিস্মৃত হন না অথচ দেশে যা জমিজমা আছে তা ঠিকভাবে তদারক করলে তাঁদের উভয়ের কারুরই পরের অনুকম্পার উপর নির্ভর করবার প্রয়োজন হয় না।

সে কথা তুললেই সর্বনাশ। বদদোয়ার দাপটেই শাহেদের জীবন সাঙ্গ হ'বার আশঙ্কা।

তাই, নানাদিকের নানা চাপে পড়ে শাহেদ এ-পর্যন্ত কিছুই সঞ্চয় করতে পারে নি। লাভের মধ্যে হয়েছে এ-পর্যন্ত ছয় শ' টাকা ধার। দেশে মসজিদ হবে টাকা পাঠাও, কেউ টাকা ধার নিলো ফেরত দিলো না, একসঙ্গে চার পাঁচজন মেহমান এসে হাজির হলো এবং লাগাতার মাস খানেক, কি তারও বেশী, শাহেদের ঘাড়ের উপর চেপে বসলো, যেন তার বাসাটা একটা সরাইখানা, যেখানে সকলেই যতদিন খুশী থাকতে এবং যতটা সম্ভব খেতে পারে।

অতএব, মনে মনে মনের মত একটা মেয়েকে সাথী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও, সঙ্গতির অভাবে শাহেদের শাদী করতে ভরসা হয় না। এখনই খরচায় কুলোতে পারে না, বিয়ে করলে ত' আরও মুস্কিল। অথচ এ-কথা শাহেদের একবারও মনে হয় না যে, বিবাহ করলে যিনি ঘরে আসবেন তিনি অনাবশ্যক খরচ কমাবার দিকেও মন দিতে পারেন। হাজার চেষ্টা করেও শাহেদ এ-পর্যন্ত একটা ভাল ফ্ল্যাট জোগাড় করতে পারলো না। যে বাসায় আছে সেখানে বাতাস এলেওরোদ আসে না। পুরনো ভগ্নপ্রায় এক দোতালা বাড়ীর নীচের তলায় তিনটি কামরা। নীচু ছাদ। কোন এক বন্ধু তার বাসা দেখতে এসে মন্তব্য করে: এ-অন্ধকূপে আছো কি করে? তারপর কোন কামরায় পাখা নেই লক্ষ্য করে দয়াপরবশ হয়ে একদিন একটা পাখা দিয়ে যায়। আজকালকার দিনে যা আশ্চর্য মহানুভবতা। গরমে তাই শাহেদের ভাজা মাছের মত অবস্থা হয় না।

ফার্ম থেকে একটা টেলিফোন দিয়েছে। নিজে শাহেদ কোন ব্যবহার করে কদাচিৎ। পাড়ার লোকেরা কিন্তু ফোনটাকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই ধরে নিয়েছে। ঘনঘন ফোন করতে আসে।

হয়ত গরমের তাড়নায় খালি গায়ে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে শাহেদ, এমন সময় নিঃশব্দে একজন তার কামরায় প্রবেশ করে ফোনটা তুলে নিয়ে পনেরো মিনিট ধরে কথোপকথন চালায়, তারপর ফোন করা শেষ হলে কোন কথা না বলে আবার ফিরে যায়। একদিন ফোন নিয়ে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে।

বিকেলের দিকে ফ্যান খুলে দিয়ে সামনের টেবিলে পা তুলে চেয়ারে বসে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে শাহেদ পুরনো 'স্ট্র্যাণ্ড' পত্রিকায় পি জি উডহাউসের এক চিত্তাকর্ষক গল্প পড়ছিলো, এমন সময় পাশের বাড়ীর দশ বারো বছরের এক ছেলে এসে বলে: আপনি একটু কামরা থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যান ত, আপা এখানে ফোন করতে আসবে।

তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোর বিস্ময়ের কণ্ঠে শাহেদ বললো: কি?

অত্যন্ত শান্ত ও নির্লিপ্ত স্বরে ছেলেটা তার কথার পুনরুক্তি করে।

—তোমার আপা কি আমায় শাদী করবে? তীব্র বিরক্তির স্বরে ছেলেটাকে সম্বোধন করে শাহেদ প্রশ্ন করে। ছেলেটা মুচকিয়ে হাসে, বলে: যাঃ!

আপা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলো; শাহেদের অভিনব প্রশ্ন শুনে ভাইকে ডাকে চাপা বিরক্তির সুরে: এই মকবুল শুনে যা।

মকবুল ফিরে গেলো এবং তার আপা আর ফোন করতে এলো না।

শাহেদের মন্তব্যটা অবশ্যই একটু রূঢ় হয়ে গেছলো, তবে আকাঙ্ক্ষিত ফল তাতে দেখা দিলো। পাশের বাড়ী থেকে ফোন করতে আসা বন্ধ হোল। এর আগে পর্যন্ত কম জ্বালিয়ে খেয়েছে ওরা। বিনা বলায় মাথার তেল নিয়ে গেছে, স্নো, সেন্ট, এমন কি ব্লেড পর্যন্ত। চক্ষুলজ্জার খাতিরে এতদিন পর্যন্ত শাহেদ মুখ ফুটে কিছু বলে নাই, কিন্তু ক্রম-পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ফেটে পড়বার জন্য একটা অছিলার খোঁজে ছিলো। সেদিন তা মিলে যাওয়াতে গায়ের জ্বালা মিটাতে পেরেছে সে।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ শাহেদ নিজের বাসার সামনের অঞ্চলে টহল দিচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ীর সেই ছেলে এসে বল্লে: আপা বলছে যে, আপনি এখন বাসার ভিতর যান, পর্দানশীন মেয়েরা ছাদে ঘুরছেন।

অপমানের প্রতিশোধ নিবার এ-দুর্বল ভঙ্গীতে পাশের বাড়ীর মেয়ের প্রতি শাহেদের বরং অনুকম্পাই হয়, ছেলেকে কিছুই বলে না, শুধু ঘরে

প্রবেশ করবার সময় নিজের মনে বলে ঃ আঃ ! কি আমার পর্দানশীন মেয়ে-রে ! পরের বাসাতে ফোন করতে আসতে ত' শরম বোধ হয় না, অথচ তার চোখের সামনে থেকে দু-শ' গজ দূরে কোন পুরুষ বেড়ালে ঠুনকো ইজ্জত তোমার ভেঙে মিসমার হয়ে যায় ! ওঃ !

প্রায় মাসখানেক পরে শাহেদের বড়ভাই অন্তঃসত্ত্বা বউ নিয়ে ছোট ভাইয়ের ঘাড়ের উপর চেপে বসলেন। একমাত্র ভাই, তাও আবার বড়। কিছু বলাও যায় না। অথচ অসুবিধারও অন্ত নেই। বন্ধুদের দেখা করতে আসাও বন্ধ। আর দু'জনের খাওয়ার খরচ এখন তাকেই চালাতে হচ্ছে। খালি তাই নয়, অন্তঃসত্ত্বা ভাবীর জন্য ফল কিনে আনতেও রোজ প্রায় টাকা দুই বেরিয়ে যায়।

ভাই চুপটি করে থাকেন। খরচা বাবদ সামান্য কিছু টাকা দেবারও কোন লক্ষণ দেখান না। ভারী বিব্রত বোধ করে শাহেদ। অন্তঃসত্ত্বা ভাবীর জন্য খরচা না করে উপায়ও নেই, অথচ খরচ করতে গেলে ধারে ডুবতে হয়। এক এক জনের নসীবে, দিলের খুশি বলে কোন জিনিস থাকে না। শাহেদ যেমন।

মেয়েরা শাহেদকে বেশ পছন্দ করে। সব ক্ষেত্রেই পছন্দটা নিঃস্বার্থ কি না, বলা শক্ত ; তবে প্রায় সব সম্প্রদায়েই তার মেয়ে বন্ধু আছে। শাহেদের বাসায় তারা ঘন ঘন যাওয়া-আসা করে। কোন রকম সঙ্কোচ নেই ; শাহেদ অবিবাহিতা বলে কোন রকম দ্বিধাও নেই। আসে, বসে, গল্পগুজব করে, নিজেরাই হয়ত চা তৈরী করে এবং দরকার মনে করলে শাহেদকে এক কাপ বাড়িয়ে দেয়। কেউ কেউ বা তার ঘর গুছিয়ে যায়। কেউ বা সিনেমার টিকেট করতে বলে, দু'এক জন 'ফার্পো' পর্যন্ত প্রস্তাব তোলে।

তাদেরই দলের একজন একদা শাহেদের সঙ্গে দেখা করতে এসে তার ভাবীর সঙ্গে মুখোমুখী হয়। শাহেদ তখন বাসায় ছিলো না।

নবাগতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে ভাবী জিজ্ঞেস করে ঃ আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কাকে চান ? মেয়েটি শাহেদের ভাবীর নব-প্রভাত উন্মেষের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে মনে মনে ভারী আমোদ পায় এবং কিছুটা বিরক্তও হয় (মেয়েদের এক বিশেষ অবস্থায় এত বিসদৃশ-ভাবে কুশ্রী লাগে যা বলবার নয়)। বাইরে মুখকে প্রসন্ন রেখে বলে ঃ শাহেদ সাহেব বাসায় আছেন ?

—না, সে'ত বেরিয়ে গেছে, কোন বিশেষ দরকার ছিল তার সঙ্গে ? শেষের কয়টি কথা উচ্চারণ করবার সময় ভাবীর অধর কোণে এক প্রকার অদ্ভুত হাসি খেলে যায় যা দেখে নবাগতার পিত্ত জ্বলে উঠে।

—শাহেদ সাহেব ফিরে এলে বলবেন, কুলসুম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো — বলে মেয়েটা একটু আচমকা ভাবে চলে যায়।

যাবার সময় নবাগতা ভাবে শাহেদের বাসায় আবার মেয়ে এলো কে? তাও আবার মা হবার মুখে। কি বিশ্রীভাবে হাসে, যেন দুনিয়ার সব মেয়েকে মনে করে তারই মত মা হতে উৎসুক। প্রথম ত' আশঙ্কাই হয়েছিলো যে শাহেদের নব-পরিণীতা। তারপর বয়স লক্ষ্য করে মন থেকে সে সন্দেহ দূর হয়। তবুও ব্যাপারটা নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত।

শাহেদ বাসায় ফিরে এলে কৌতুহল সম্বরণ করতে না পেরে ভাবী স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেই বসলো : কুলসুম মেয়েটা কে, শাহেদ ?

সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা। কিন্তু ভাবীকে আঘাত করতে মন চায় না, বিশেষ করে এমন অবস্থায়। তাই শুধু বলে : ও এক বন্ধু, যে নভেলটা এনে দিয়েছিলাম, পড়েছো ত'। ভাবীকে কথাটা ঘুরিয়ে নিবার এক বৃহৎ সুযোগ দিলো সে।

—ও, বন্ধু ! ভাবীর হাসিটি যে ইঙ্গিত বহন করছে, তা কারুর পক্ষেই সম্মানসূচক নয়।

—আমার একটু কাজ আছে ভাবী, এখনি আবার বেরুতে হবে, তহুরকে এককাপ চা করে দিতে বলো না।

—এত তাড়া কিসের, রেলগাড়ী ত আর ছেড়ে দিচ্ছে না, বলো না কুলসুম মেয়েটা কে ? ভাবীর সেই এক কথা।

- থাক্ চা খাওয়া এখন আর হোল না, বেরুতেই হবে।

—কোথায়, পেছন থেকে ভাবী টিটকারী কাটে, কুলসুমের কাছে ?

সে-কথার কোন জবাব দেওয়া শাহেদ দরকার মনে করে না।

পরের দিন ভোরে বড়ভাইজান, যিনি এতদিন ছোট ভায়ের ওপর উপার্জনক্ষম হয়েও চোখ বুজে থেকে যাচ্ছেন, অমৃত-উপদেশ দেন : তুমি এবার একটা বিয়ে করো শাহেদ, বয়সও হয়েছে, টাকাও রোজগার করছো বেশ। আর শহরে থাকলে বলা ত যায় না, কখন কোন ফাঁদে

পা দিয়ে বসো, সময় থাকতেই তাই সতর্ক হওয়া ভাল। তুমি যদি রাজী হও আমরাই না হয় তোমার জন্য একটা কনে খুঁজে দিবো।

অযাচিত উপদেশ শাহেদের মনে সব সময়ই বিষের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও ফল হোল অনুরূপ। তবে ভদ্রতার খাতিরে বাইরে সেটা উলঙ্গভাবে প্রকাশ না করে আকারে ইঙ্গিতে বড় ভাইকে সে বিদ্রূপ করে নেয়ঃ এমনিই খরচ চালাতে পারছি না, তার ওপর বিয়ে করে সর্বস্বান্ত হতে মন আমার সায় দেয় না।

বড়ভাই ইঙ্গিতের ধার কাছের মর্মও বোঝেন না, গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বলেনঃ মাসে প্রায় চারশো টাকা কামাচ্ছো, একি সোজা কথা, এত টাকা আয় করেও বিয়ে করবার মত সংস্থান যদি তোমার না হয়, তবে দেশের নিরানব্বই ভাগ মেয়েই যে অনূঢ়া হয়ে থাকবে। নিজের রসিকতা অনুধাবন করে ভাইজান দরাজ হাসি হাসেন এবং ততোধিক দরাজ মনে প্রত্যাশা করেন যে, শাহেদও তাঁর হাসিতে যোগ দিবে।

শাহেদ কিন্তু গোমড়া মুখে শুধু বলেঃ না ভাইজান, বিয়ে করবার মত অবস্থা আমার এখনও হয়নি, দেনায় ডুবে আছি।

ভাইজান যথার্থই শঙ্কিত হনঃ দেনায় ডুবে আছো, কি বলছো হে কি খরচা কর এত?

—কত রকমের খরচা, মেহমান ত হরদম লেগেই আছে।

—শাদী করলে সেসব খরচা অনেক কমে যাবে। ভাইজান আশ্বাস দিতে ভোলেন না।

শাহেদ আর উচ্চবাচ্য না করে চুপ করে বেরিয়ে যায়।

মাসখানেক পরে অবশেষে ভাইজানরা কর্মস্থানে চলে যান। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই শাহেদের দেনার পরিমাণ আরও শ' দুই টাকা বেড়ে গেছে। বন্ধুরা আবার আগের মতই যাওয়া-আসা করে, বান্ধবীদের আনাগোনারও বিরাম নাই।

শাহেদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ নানাজনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে। দেশের লোকেরা ভাবে, শহুরে জীবনের আওতায় পড়ে শাহেদের মত সুবোধ ছেলেরও মতিচ্ছন্ন হয়েছে। ভাল দেখে বউ একটা তাড়াতাড়ি না জুটালে এ গভীর পঙ্ক থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার আর কোন উপায়ই নেই। চাচা-ফুফুরাও এ নিয়ে মাঝে মাঝে লেখালেখি করেন। দু'একবার তাঁদের পছন্দ-করা কনেরও আভাস দিয়েছেন, কিন্তু যতদিন

টাকা তাঁরা নিয়মিত পান ততদিন শাহেদকে অযথা বিব্রত করবার পক্ষপাতি তাঁরা নন।

তাই অবস্থার স্রোতে শাহেদ গা ভাসিয়ে দেয় বিনা ভাবনায় ও ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে।

এমন সময় প্রায় খোদার রহমের মত এক বন্ধু একদিন প্রস্তাব করলো শাহেদের সঙ্গে টাকা-দেওয়া অতিথি হিসেবে সে থাকতে চায়। নিজাম বন্ধুটির নাম। এতদিন 'মেস'এ ছিলো। বিবাহিত। তবে হাজার খুঁজেও কলকাতায় কোন বাসা না পাওয়াতে এতদিনেও বউ ছেলেকে এখানে আনতে পারে নি। এখনও আনবার কোন সম্ভাবনা দেখছে না। মেস-এ থেকে অরুচি ধরে গেছে, খাওয়া বা সঙ্গ কোনটাই মনোমত নয়। তাই শাহেদ যদি তার প্রস্তাবে রাজী হয় তবে সে বিশেষ স্বস্তি বোধ করবে। শাহেদ হেসে বলেঃ তোমার নিজের অবস্থার কারুণ্য অত বিশদভাবে বুঝাবার দরকার নেই, তুমিও যেই তরীতে আমিও সেই তরীতে, মাল-পত্তর নিয়ে তুমি কালই চলে আসতে পারো। তুমি এলে আমারও কম উপকার হয় না, একা ত' আমি সংসার আর চালিয়ে উঠতে পারি না।

নিজাম সাহিত্যিক মানুষ। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন মন ও গভীর বন্ধুপ্রীতি; সহৃদয়ও। দু-একদিনের মধ্যেই নিজামকে শাহেদ নিজেই সংসারের কথা সব খুলে বলে। সব বৃত্তান্ত শুনে নিজাম হতবাক! নিজে সে সাহিত্যিক মানুষ, পাই পয়সার হিসেব তারও ধাতে সয় না। তবে এ-রকম অকল্পনীয় নিয়মিত অত্যাচার, অপরের সে উপায় করে বেশ এবং অবিবাহিত বয়ে—এমন করে রক্ত চুষে খাওয়া নিজামের অভিজ্ঞতায়ও, এবং তা খুব সীমাবদ্ধ নয়, অভাবনীয় ব্যাপার।

এখন অবস্থা যে রকম তাতে সংশোধন করবার এমন কিছু অবকাশও নেই, খালি বাজার খরচা কমাবার চেষ্টা করা ছাড়া। সেটাও কম দুরূহ এবং বিরক্তিকর চেষ্টা নয়। তবে বন্ধুর খাতিরে না হয় তা করা যেতে পারে। কিন্তু এই মেহমানদের অত্যাচার, পরিচিতদের অবিবেচনা ও বান্ধবীদের বিচিত্র আবদারের হাত থেকে শাহেদকে কি করে বাঁচানো যায়, সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে নিজাম এক কৌশলজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বন্ধুকে সে জিজ্ঞেস করেঃ আমায় খুলে বলো দেখি, বান্ধবীদের মধ্যে কারও প্রতি তোমার কোন বিশেষ দুর্বলতা নেই ত, তোমার উত্তরের

ওপর আমি যে পন্থা ফেঁদেছি তার সার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে।

শাহেদ মুচকি হেসে বলেঃ বান্ধবীদের মধ্যে অনেককেই আমি পছন্দ করি, তবে কারও প্রতি বিশেষ কোন দুর্বলতা আছে বলে এখন মনে পড়ছে না, হৃদয়ে কারও প্রতি কোন আকর্ষণ থাকলে পরে হয়ত তা ধরা পড়তে পারে।

—আচ্ছা তা'হলে মাস খানেকের ভিতরই আমরা দু'কামরার এক 'ফ্ল্যাট' এ উঠে যাবার চেষ্টা করবো—এক কামরা আমার, আর এক কামরা তোমার ফ্ল্যাট আমার নামেই থাকবে দেখি তোমার মেহমানরা তার পরে আক্রমণের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

তার সুবিধার্থে বন্ধুর এই আন্তরিক চেষ্টায় নিজামের প্রতি শাহেদ অত্যন্ত প্রীত ও কৃতজ্ঞ বোধ করে। বাস্তবিকই আজকালকার দিনে এমন নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না।

পছন্দমত দু'কামরাওয়ালা ফ্ল্যাট আজকালকার দিনে কলকাতায় খুঁজে পাওয়া নিজাম যতটা সহজ মনে করেছিলো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঠিক তা দাঁড়ালো না। অনেক খোঁজাখুঁজি ও অনেক হয়রানীর পর পাক-সার্কাস অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত সে রকম এক ফ্ল্যাট পাওয়া গেলো যার বর্তমান ভাড়াদাররা অদল'বদল করতে রাজী। কয়েকদিনের মধ্যেই শাহেদ ও নিজাম নূতন ফ্ল্যাটে উঠে এলো সংসারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে।

পিছু হঠবার এমন অনবদ্য কৌশল নিজে ভেবে শাহেদ এতদিন বের করতে পারে নি, সে জন্য নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর বিতৃষ্ণা ও বন্ধুর প্রখর বুদ্ধির প্রতি নূতনভাবে শ্রদ্ধা হয়। কাউকে কিছু না বলে শাহেদ কোথায় ডুব দিলো—আর এমন ডুব যে তার পাত্তাই পাওয়া ভার—তার সম্ভাবিত মেহমানরা কিছুতেই তা ঠাহর করতে পারলো না। তাদের মধ্যে দু'একজন যারা খুব উদ্যোগী, অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলো, কিন্তু তাদের সঙ্গে শাহেদ দেখা করতে রাজী হয় নাই। ফলে শাহেদ আবিষ্কার করে যে, এখন যতটা স্বাধীনতা সে উপভোগ করছে, চাকরি পাওয়ার পর থেকে কখনই তার নসীবে ততটা স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় নি। বন্ধুর পরামর্শ মত বাড়ীতেও সে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছে যে, এখন সে এক বন্ধুর বাসায় অবস্থান করছে, অতএব কেউ যেন মেহেরবানী করে হুড়মুড়িয়ে এখানে এসে হাজির না হন।

মাসখানেকের মধ্যেই সংসারের খরচে শাহেদের অবিশ্বাস্য ব্যয় সংকোচ হয়। যদিও তহরকে নিরস্ত করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু নূতন দিক থেকে আবার বিপদ দেখা দিলো। বান্ধবীদের অত্যধিক উৎসাহের কাছে শেষ পর্যন্ত তার অজ্ঞাতবাস ব্যর্থ হল। র‍্যাডিক্যাল, কমিউনিস্ট উভয় পার্টির নারী-সভ্যরা তাদের বিপ্লবমূলক অথচ সংঘাতমুখী বক্তৃতায় শাহেদের অবসর মুহূর্তকে শিক্ষাঘন করে তুললো। বিপরীত দিকে আবার 'নিউ এম্প য়ার' ও 'ফাপো', সেণ্ট. মাঝে মাঝে 'ভ্যানিটি ব্যাগ'; কি কমসে-কম এক ভাল প্রচ্ছদপট-ওয়ালা বই।

শুধু কুলসুম আসে না।

কি করে নারী-মহলের এ সম্মিলিত আক্রমণ এড়ানো যায়, নিজামের কাছে শাহেদ জিজ্ঞেস করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিজাম প্রস্তাব করে: এবার একটা বিয়ে করে ফেলো।

বন্ধুর প্রস্তাব শুনে শাহেদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু হতাশার। সমস্যাটা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু সমস্যার সমাধান নিজাম যা বাৎলালো তা যে দুরূহতর। বিবাহ করাটা কি একটা কথার কথা! করতে চাইলেই করা হয়ে গেলো!

-এ সমাধানটা কিন্তু বন্ধু মনঃপূত হোল না —শাহেদ বলে।

নিজাম ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করে: ব্যাপারটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চলবে না। সব দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তুমি হয়ত মনে করবে আমি বিবাহিত বলেই তোমাকে লেজ কাটতে উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু ঠিক তা নয়। বিবাহের ভালো ও মন্দ দিক দু'টোই বিচার করে দেখা যাক। এখন তোমার যে পূর্ণ স্বাধীনতা, যখন যা খুশী করছে করবার সুযোগ ও সঙ্গতি, বিয়ে করলে তা অবশ্যই পুরোমাত্রায় থাকবে না, কারণ আর একজনের প্রতি তখন তোমার দায়িত্ব জন্মাবে। স্ত্রীকে পুষতে হলে খরচাও তোমার বাড়বে, সন্দেহ নেই। ছেলেপিলে হলে, যদিও সেটা অনেকটা তোমার হাতে, খরচের পরিমাণ আরও বাড়বে। এখন সুবিধার দিক দেখা যাক। এখন তোমার মধ্যে যে চঞ্চলতা, শিকড়হীন চাপল্য, বিবাহ করলে তা যদি মোটামুটি সুখের হয়, নিমেষে দূর হবে এবং নিজের অস্তিত্বটা আর তোমার কাছে ততটা অর্থহীন ঠেকবে না। পরন্তু বিবাহ করলে

অপরে তোমার সহৃদয়তার ওপর এমন নির্লজ্জ ভাবে ডাকাতি করতে পারবে না। অনাবশ্যক খরচ অনেক কমবে, অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমানরা তোমাকে অতিষ্ঠ করবার সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়, বিবাহ করলে দু'একটা বৃহৎ অসুবিধা সত্ত্বেও, মোটামুটি তুমি নিজেকে সুখী না হোক অন্তত তৃপ্ত মনে করতে পারবে। নিজাম এতক্ষণে তার কথা শেষ করে।

শাহেদ অবাক হয়ে ভাবে, ঠিক তার মনের কথাটি নিজাম এমন আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে কেমনভাবে প্রকাশ করতে পারলো। না, সাহিত্যিকদের যতটা সে অনুকম্পার পাত্র মনে করে এসেছে তারা ঠিক ততটা নয়। বন্ধুর দিকে গুণমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে শাহেদ বললো। তুমি ঠিকই বলেছো। বিয়ে করা অবশ্যই দরকার। কিন্তু কাকে?

নিজাম হেসে বলে ঃ তা আমি কি করে বলবো, তোমার এত ক'টা মেয়ে-বন্ধু আছে, তাদের মধ্যে ভেবে চিন্তে একজনকে বেছে নাও না কেন?

তাই নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে পাখা খুলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শাহেদ ভাবতে বসে ঃ নারী-বন্ধুর মধ্যে কাকে সে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং কে তার এই শিকড়হীন চাপল্য (নিজামের ভাষাটা বেশ) দূর করে তার জীবনকে নূতন প্রভাতের অফুরন্ত সম্ভাবনায়, বৃষ্টি-স্নাত ধরিত্রীর স্বচ্ছ-মাধুর্যে, তারা-ছাওয়া আকাশের গভীর রহস্যে ভরে তুলবে?

কে সে নবজীবনদায়িনী?

বান্ধবীদের মূর্তি এক এক করে শাহেদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে, কিন্তু কাউকেও ঠিক সে অনন্যা নারী মনে হয় না যে তার লক্ষ্যহীন ভেসে যাওয়া জীবনে কোন আশ্চর্য এক ঐশ্বর্য আনতে পারে বা অকল্পনীয় কোন এক দ্যুতি।

নিঃস্বার্থ প্রীতি তার বান্ধবীদের মধ্যে ঠিক কার আছে, শাহেদ বুঝতে পারে না। প্রত্যেকেই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। তার প্রতি যদিও এদের মধ্যে অনেকের আন্তরিক শুভেচ্ছা আছে, তবুও ঠিক তারই জন্য বান্ধবীরা তার প্রতি আকর্ষিত হয় কি না, বুঝা ভার।

অবশ্য একজনের কথা বাদ দিলে। কিন্তু তার বাবার সঙ্গে, বয়সে রীতিমতো তফাৎ সত্ত্বেও, শাহেদের প্রায় বন্ধুর মত সম্পর্ক। পরন্তু কুলসুমের বাবার প্রচুর টাকা এবং কুলসুম নিজেও, ঠিক ম্যাডোনা সম

না হলেও, দেখতে মোটামুটি সুশ্রীই। আর মেয়েটা, ভেবে দেখবার পর শাহেদ এখন বুঝতে পারছে, যথার্থই ভালো! সচ্ছলতার মধ্যে প্রতি-পালিত হয়েও তার সরলতা বা মাধুর্য নষ্ট হয়নি। ইঞ্জিনীয়ারের এক-মাত্র মেয়ে হয়েও কবিতা ভালবাসে এবং কবিতার প্রতি শাহেদের মনকে ঝুঁকাতে নানাভাবে চেষ্টা করেছে—সফল হয়নি যদিও, তবে উৎসাহের দোষে নয়।

কুল্‌সুমকে এতদিন কি রকম অদ্ভুতভাবে এক ছোট্ট মেয়ে মনে হোত। ভাবতেই পারতো না শাহেদ যে কুল্‌সুমের মনেও কোনদিন আকাশ-প্রান্তর ছেয়ে-ফেলা উজান আসতে পারে।

বন্ধুকে গিয়ে বলে ঃ তোমার কথাতেই মন সায় দিচ্ছে, নিজাম, এ-বার বোধ হয় সত্যিই আমার একটা বিয়ে করা দরকার।

সহাস্যমুখে কুলসুম বলে ঃ এতদিন কোথায় ডুব দিয়েছিলেন, কত খোঁজাখুঁজি হোল আপনাকে নিয়ে, অফিসে ফোন করেও আপনাকে পাওয়া যায় না। তারপর মুখটা একটু নাড়িয়ে এবং ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে ঃ ব্যাপার কি, বলুন দেখি?

—ব্যাপার গুরুতর, তোমার আব্বাজান সমীপেই খালি জানানো যায়, কোথায় তিনি?

—বেরিয়ে গেছেন।

—ফিরবেন কবে?

—তা'ও জানি না।

—আচ্ছা, তা'হলে চললাম।

—বাঃ তা কি করে হয়, এতদিন পরে এলেন। আব্বাজান না হয় বেরিয়েই গেছেন, আমি বেচারীর কথাও'ত ভাবতে হয়। কুলসুমের মুখে ভারী আশ্চর্য এক হাসি।

—সেজন্যই'ত তোমার আব্বার সঙ্গে, দেখা করতে চাই। শাহেদ ফস্ করে বলেই বসে।

ইঙ্গিতটা হয়ত কুলসুম ঠিক ধরতে পারে না বা ধরতে পারলেও ঠাট্টা হিসেবে নেয়। মদির কণ্ঠে বলে ঃ বসুন, চা খান, তার মধ্যে আব্বাজান হয়ত এসেও পড়তে পারেন।

—আমাকে শেলীর 'দি ক্লাউড' কবিতা পড়ে শুনাবে? শাহেদের বিচিত্র অনুরোধ।

নাক একটু তুলে, চোখে তরঙ্গ এনে মধুর অবজ্ঞার স্বরে কুলসুম খালি বলে ঃ আপনাকে কবিতা পড়ে শুনাবো ? টা রা লা রা লা।

'ইডেন গার্ডেন' এ এসে মন ও চোখ দুই জুড়িয়ে যায়। শ্যামলতার স্নিগ্ধ শান্তি কথা দিয়ে বুঝাবার নয়। এমন পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের সাক্ষাৎ কথা হয়।

আর মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো ত্রস্ত কামনায় শহরকে উন্মুখ করে। বজ্রগর্ভ মেঘ যে ইঙ্গিত বহন করে এনেছে, বিদগ্ধ ধরণী তাতে উল্লসিত এবং চতুর্দিকের গাছপালা প্রান্তর আকাশের দিকে চোখ তুলে কিসের এক ইশারায় সারাদিনের জ্বালা ভুলে যায়। দমকা বাতাস কোথাও লুকিয়ে থাকা ফুলের সৌরভ মন্থন করে আনে।

বাসায় যখন ফিরে যায় শাহেদ, অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। নিজাম জিজ্ঞেস করে ঃ নূতন কোন খবর আছে?

—আছে, বন্ধু আছে, চোখ মেলে বাইরে দেখো।

—আমি'ত খালি দেখছি বিদ্যুৎ।

—সেটা ত বাইরের দেখা, বুকের কি জ্বালা বিদ্যুৎ নিঃশেষ করে দিচ্ছে সে কথা ভাবো দেখি। শাহেদের স্বরে রহস্যময় গাম্ভীর্য আসে যার মর্ম, বজ্র-গর্ভ মেঘই খালি বুঝে—যা হয়ত আর একজনের কাছে তা বহন করে নিয়ে যাবে।

ভয়

কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে মমতাজ যখন কর্মস্থান থেকে কলকাতায় বেড়াতে এলো, তখন তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেই সমানভাবে বিস্মিত ও শঙ্কিত হোল। মমতাজ অবশ্য কখনই খুব পাহ্‌লোয়ান গোছের ছিল না; স্বাস্থ্য কিন্তু তার মোটামুটি ভালোই ছিল। কলকাতায় সে ফিরে এলো একেবারে হৃত-স্বাস্থ্য নিয়ে।

মমতাজকে দেখে মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন: শরীর তোমার একি হয়েছে!

আব্বা বললেন: এর মধ্যে তবিয়েৎ খুব খারাপ করেছিলো নাকি? দাদি আম্মা কপাল স্পর্শ করে ম্লান স্বরে মন্তব্য করলেন: কপাল তোমার গরম যে!

সকলের উদ্বেগ ও আশঙ্কাকে হাল্কা করে দিয়ে মমতাজ সহাস্যে বলে: ও কিছু না, রাজশাহীতে থাকতে শরীর একটু খারাপ করেছিলো, ডাক্তারও দেখিয়েছিলাম, বললো এমনি সাধারণ দুর্বলতা, কয়েকদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। আর ট্রেনে ভীড় হওয়াতে রাত্রে একেবারে ঘুমোতে পারিনি, তাই আজকে শরীরটা একটু হাল্কা দেখাচ্ছে। তোমাদের ভাব দেখে কিন্ত মনে হয় আমি যেন কতকালের রোগী।

মমতাজের সেই আশ্বাসবাক্যে তাঁদের সকলের উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হলেও তাঁরা কেউ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ, নিজের চোখের সাক্ষ্যকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় কি করে। চক্ষু মমতাজের কোটরাগত, মুখ নিষ্প্রভ ও লাবণ্যহীন, গণ্ড দু'টি গেছে ধসে। পরন্তু তার সমস্ত চেহারায় এমন একটা আনন্দহীন অভিব্যক্তি ও ম্লান পাণ্ডুরতা যে তাকে দেখলে মনে হয়, সদ্য হাসপাতাল থেকে উঠে এসেছে। তবুও

তাঁরা কেউ আর উচ্চবাচ্য করেন না, বরং খোশগল্প করে মমতাজের মনকে প্রফুল্ল করবার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন—যদিও সে-চেষ্টা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়।

আত্মীয়-স্বজনদের সে যাই বলুক, নিজে মমতাজ বুঝতে পারে শরীর তার অপটু। বড় ক্লান্ত লাগে, একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে, মনে প্রফুল্লতার চিহ্নমাত্র নেই। বিছানায় একবার শুলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। শরীর কেন্দ্র করে মন রচনা করে যত সব উদ্ভট, অবাস্তব, বেয়াড়া ভাবনা। ফলে মন পড়ে আরও মুষড়ে। সূর্য-কিরণের অকৃপণ ঐশ্বর্য গ্রহণ করতেও দ্বিধা জাগে।

অথচ মাত্র মাস কয়েক আগে মমতাজের মনে জোর ছিল অসামান্য, কিছুতেই সে কাবু হোত না। সব সময় বেপরোয়া, প্রফুল্লভাব। নিজের শরীর সম্বন্ধে একেবারেই ভাবতো না, ভাববার দরকার হোত না বলেই।

অথচ আজকে খালি তার শরীর নয়, মনও ব্যাধিগ্রস্ত। শরীর দুর্বল হয়েছে অবশ্যি, কিন্তু ডাক্তাররা বলে, ভাববার কিছু নেই। তবুও মমতাজের খুঁতেখুঁতে ভাব গেলো না। দিনে অন্তত ছ'বার দেহের উত্তাপ নেয়, থার্মোমিটারে ৯৮·৪ ডিগ্রীর একটু বেশী উঠলেই, তা সে যে কারণেই হোক, তার ভাবনার আর অন্ত থাকে না এবং ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। ডাক্তার দেখে বলে: গায়ে জ্বর নেই। মাত্র সেই সময় মমতাজের বিষাদ-ম্লানমুখে একটু হাসি ফুটে।

মমতাজ নিজেই বুঝতে পারে, অসুখ তার যতটা শারীরিক নয়, মানসিক তার অনেক বেশী। সে-কথা বুঝেও কিন্তু মনে সে প্রফুল্লতা আনতে পারে না। বন্ধুবান্ধবরা মমতাজের রুগ্ন চেহারা দেখে তাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানায় ও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা সদুপদেশও দেয়। ফল হয় বিপরীত। মমতাজ ভাবে, সকলেই যখন তাকে ম্লান রুগ্ন বলছে তখন নিশ্চয়ই তার কোন কঠিন, দুরারোগ্য রোগ হয়েছে। ডাক্তার দেখিয়ে বা চিকিৎসা করেই বা কি হবে! মন তার হতাশার গভীর তিমিরে ডুবে যায়।

সব চেয়ে বেশী আফসোস হয় মমতাজের একথা ভেবে, বিবাহ তার হয়েছে এখনও এক বৎসর পুরো হয় নি। বিবাহের সময় মমতাজের শরীর বর্তমান অবস্থার চেয়ে বিশেষ ভালো না থাকলেও, মন ছিল তার

স্পর্ধিত। তাই তখন তার চোখে স্ফূর্তি ও আনন্দের আমেজ ছিল অফুরন্ত. হৃদয়ে ছিল দূরান্তরের স্বপ্ন ও পাওয়ার তৃপ্তি এবং আশা ছিল অশেষ। নববধূ সেলিমা প্রাণ-চাঞ্চল্যে ও চিত্তমাধুরীর নিত্য নব প্রকাশে প্রায় সারাক্ষণ ঝলমল করত। সময় কেটে যেত দ্রুতগতিতে। মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ও কখনও কখনও কলহ সেই অপূর্ব সুতীব্র আনন্দকে করত আরও ঘনীভূত।

অথচ বছরের চাকা সম্পূর্ণ ঘুরতে না ঘুরতেই মমতাজ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। সব সময় কেমন একটা মনমরা বিমর্ষভাব। তা লক্ষ্য করে সেলিমার মত দুর্জয় প্রাণশক্তিসম্পন্না মেয়েও এক এক সময় নিজেও কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সেটাই মমতাজকে সব চেয়ে বেশী ব্যথা দেয়। স্ফুলিঙ্গের মতো যে যুবতী আনন্দাতিশয্যে নিত্য ঊর্ধ্বমুখী ছিলো, আজকে তারও গভীর কালো চোখের তারার নীচে কালি পড়েছে, থুতনী তার নড়ে যায় কিসের একটা ক্ষোভে যেখানে আগে কৌতুক ও দুষ্টুমী বাসা বেঁধেছিলো। ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে মমতাজের এই কারণহীন আশ্চর্য মানসিক বিষাদ সেলিমার চিত্ত থেকে মাধুরী ও স্ফূর্তি চুষে নিচ্ছে। অথচ মমতাজ এব্যাপারে নিজেকে এতটা অসহায় কল্পনা করে যে মনকে শাসনে আনবার কোন চেষ্টাই সে করে না, ভয় হয়, পাছে মন তাতে আরও বিগড়ে যায়।

ছুটি নিয়ে অসুস্থ শরীরে মমতাজ কলকাতা এসেছে জানতে পেরে বাপের বাড়ী থেকে সেলিমা এসে হাজির হয় এবং মমতাজকে অনেকদিন পরে দেখবার আনন্দকে ছাড়িয়ে সেলিমার মন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভরে যায়।

বস্তুতই মমতাজকে দেখে মনে হয় সে অনেকদিনের রোগী, এত শুকিয়ে গেছে, দেখতে এত ম্লান হয়েছে। চুলগুলি কিন্তু তার এখনও তেমনই ঘন, তেমনি অবিন্যস্ত। সহসা মমতাজের প্রতি গভীর মমতায়, রুগ্ন ছেলেকে মা যেমন স্নেহ করে, সেলিমার সমস্ত মর্ম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অগোছালো নিবিড় ঘন চুলে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

শেষ পর্যন্ত সেলিমা মমতাজের কাছে এসে বসে, যখন আত্মীয়স্বজনরা চলে যান তাদের দু'জনকে একলা রেখে। মমতাজের মুখে কোমলভাবে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেঃ কেমন আছেন?

ভালই। মমতাজ উদ্ধতকণ্ঠে উত্তর দেয়।

এটাই সেলিমা বুঝতে পারে না। সময় সময় মমতাজের ব্যবহার এত নিষ্করুণ মনে হয় যে বলবার নয়। আশঙ্কা হয়ঃ হয় মমতাজ নিবিড়ভাবে স্বার্থপর, নিজেকে ছাড়া কিছুই বুঝে না, নয় সেলিমার প্রতি সেই প্রীতি ও ভালোবাসা নেই। কোনটাই তার মনকে সান্ত্বনা দেয় না।

তবুও সেলিমা আর একবার চেষ্টা করেঃ এত মুষড়ে পড়েছেন কেন, কি হয়েছে আপনার, উঠে বসুন না, গল্প করুন।

— বিরক্ত করো না এখন, বলছি শরীর আমার ভালো নয়। মমতাজ নির্মমের মত বলে।

সেলিমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়, বিষণ্ণ বদনে সে উঠে যায়। ক্ষোভে ও অভিমানে মন তার জর্জরিত হতে থাকে। এত করেও যার মন পাওয়া যায় না, তার জন্য সে আবার এত ভাবে কেন? বিস্মিত হয়ে এক এক সময় সেলিমা নিজেকে এই প্রশ্ন করে।

ভারমুখে বিছানা ছেড়ে সেলিমা উঠে যাওয়ার পর মমতাজ নিজের মনের সঙ্গে এক বুঝাপড়া করবার চেষ্টা করে। সেলিমার মনে ঘা দিবার তার কোন ইচ্ছেই ছিলো না, অথচ কি কথা বলতে গিয়ে কি বলা হয়ে গেলো। কি তার এমন ব্যাধি যে সব সময় এই দশ-মণী বোঝা? কেন সে অপরের মত স্বাভাবিক হতে পারছে না? কি হয়েছে তার যে সব সময় অজ্ঞাত ভয়ে, কল্পিত আশঙ্কায় ও ভিত্তিহীন দুর্ভাবনায় সে খালি তার নিজের জীবনকে নয় অন্তত আর একজনের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে? নিজেকে নিয়ে মনের দুশ্চিন্তায় সে বিভোর থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু একটি হাস্য কৌতুকময়ী সহৃদয় নব-পরিণীতাকে এমন আস্তে আস্তে দগ্ধে মারবার তার কি অধিকার?

মমতাজ হঠাৎ অটল সঙ্কল্প করেঃ কালকে একটা ভালো ডাক্তারকে ডাকিয়ে নিজেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করাতে হবে। কি তার ব্যাধি জানতে হবে, কোন ব্যাধি না থাকলে আবার প্রভাতের সূর্যকিরণের মতো নিজেকে বিস্তার করতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করতে হবে।

রাত্রে পালঙ্কের এক কোণে আড়িমুড়ি দিয়ে সেলিমা পড়ে থাকে। মমতাজ স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার আদরের জন্য রোরুদ্যমানা বধূ অভি-মানক্ষত হৃদয়ে অপেক্ষা করছে। সে একটু সাড়া দিলেই হোল। আনন্দে আবার সেলিমা জ্বলে উঠবে।

অথচ নিঃস্পৃহের মতো মমতাজ চুপ করে শয্যার আর এক দিকে পড়ে থাকে। তার স্থির বিশ্বাস : সেলিমা বেশীক্ষণ অভিমান করে থাকতে পারবে না, কাছে সরে আসবেই। মমতাজ জানে বিবাহের পর থেকেই সেলিমাকে সে মাতাল করে রেখেছে।

হোলও তাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নিজের থেকেই সেলিমা তার কাছে সরে এলো। তখন ভাঙলো মমতাজের নিঃস্পৃহতা। স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠভাবে সে বুকে আঁকড়ে ধরলো। যেন সেলিমাই তার সর্বশেষ আশ্রয় এবং একমাত্র সে আশ্রয়েই সে নিরাপদ।

তারপর বহুদিনের সঞ্চিত কথায় ও ভাবোন্মাদনায় বাকী রাত্রিটা মুখর হয়ে ওঠে যতক্ষণ না পূর্ব আকাশটা একটু ফিকে হতে আরম্ভ করে। তখন আসে ঘুম শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে। সে কি ঘুম!

পরদিন বিকেল বেলায় মমতাজ কলকাতার এক ভালো ডাক্তার ডেকে পাঠায়। ডাক্তার সাহেব এসে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করে কিছুই খুঁজে পান না।

বিমর্ষ মুখে তবুও ডাক্তার সাহেবকে সম্বোধন করে মমতাজ বলে : যদি শরীরে কিছুই না থেকে থাকে, তবে এমন শুকিয়ে যাচ্ছি কেন, আর এমন দুর্বলতা বোধ করবারই বা কারণ কি?

ডাক্তার সাহেব কিছুটা হেসে বলেন : শুকোয় লোকে নানা কারণে, দুশ্চিন্তা তার মধ্যে একটি। তারপর অতর্কিতে : আচ্ছা, আপনার কখনও আমাশা হয়েছিলো?

কখনও হয়েছিলো বলে মনে পড়ে না, আর হয়ে থাকলেও বুঝতে পারি নি। মমতাজের প্রত্যুত্তর।

ডাক্তার সাহেব আবার হাসেন, আমুদে ধরনে মাথাটা একটু নাড়িয়ে বলেন : না, তা হলে হয়নি। তারপর বিদ্যুৎগতিতে : আচ্ছা ঠাণ্ডার ভাবটা কি আপনার একটু বেশী, সহজেই কি সর্দি-কাশি হয়?

বোধ হয় তাই, মাস দুই আগে একবার ব্রঙ্কাইটিস হয়ে গেছে, দিন দশ আগেও আর একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত করেছিলো, আমার শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ হয় তেমন সহ্য করতে পারে না। মমতাজের স্বীকারোক্তি।

ডাক্তার সাহেব আর একবার হাসেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখে বলেন : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় কিছুই পাওয়া গেল না, তবে ঠাণ্ডার ভাবটা যখন আপনার একটু বেশী একবার এক্স-রে করিয়ে

নেওয়াই ভালো। আপনার আসল অসুখ আমার মনে হয়, দুর্ভাবনা থেকে উদ্ভূত। অতএব, তার কারণ দূর করাই ভালো। এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আমার মনে হয়, শারীরিক কোন ব্যাধিই আপনার নেই। কিন্তু ডাক্তারেরও ত ভুল হতে পারে, তাই এক্স-রে একবার করিয়ে নেওয়াই ভালো। তারপরে আমিও নিশ্চিন্ত আর আপনিও বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারবেন।

ফি পকেটস্থ করে সহাস্য বদনে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

অনেকদিন পরে মমতাজ অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে; চিত্তে তার প্রফুল্লতাও।

—ডাক্তার কি বললো? সেলিমার উদ্বেগ বাইরের হাসিমুখেও ঠিক চাপা পড়ে না।

—বলে ত' কিছুই নেই, কিন্তু এক্স-রে করতেও উপদেশ দিলে। মমতাজের উত্তর।

— কিছুই নেই, এক্স-রে করতে হবে কেন? সেলিমার কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও আশঙ্কা ফুটে ওঠে।

—ডাক্তারের উপদেশ, অবহেলা করবার উপায় নেই। মমতাজের ভাব অনেকটা হাল্কা।

—কবে করাবেন? সেলিমা জানতে চায়।

—কালকেই। মমতাজ বলে।

কিছুক্ষণ পরে, সহসা ও অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে মমতাজের মন ভয়ে স্তব্ধ ও বিকল হয়ে যায়। ডাক্তার এক্স-রে করতে বললো কেন হঠাৎ? অথচ মুখে বলে, শরীরে ব্যাধির কোন চিহ্ন নেই। তবে কি ডাক্তার তার মধ্যে মারাত্মক কোন রোগ আশ্রয় করেছে বলে সন্দেহ করে? টি-বি? বা সেই জাতীয় অন্য কোন রোগ? আশঙ্কায় পাণ্ডুর হয়ে যায় মমতাজের মুখ। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন নির্মম হস্তে কালো অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিয়েছে। তার চোখের সামনে আচম্বিতে সমস্ত কিছু বিস্বাদ, বিকৃত ও এমন কি বীভৎস ঠেকে।

বিকেলের দিকে সেলিমা সেজেগুজে মমতাজের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঠোঁটের কোণে কৌতুকের রেখা টেনে ও চোখে গভীর এক ইশারা এনে বলে: চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

সেলিমার আমন্ত্রণ মমতাজ উপেক্ষা করতে পারে না। বিছানা ছেড়ে উঠে বসে, হাতমুখ ধোয়, একটু প্রসাধন করে, কাপড় চোপড় পরে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব যখন লক্ষ্য করে, মন তার আবার মুষড়ে পড়ে। এত অদ্ভুতভাবে শুকিয়েছে সে। স্বাস্থ্যে টগবগ করছে সেলিমা; যৌবনের ঐশ্বর্য তার সমস্ত দেহে ছন্দিত, রেখান্বিত, চিত্ত-উচাটনকারী। তার পাশে মমতাজকে যেন দেখায় কত দিনকার রোগী।

ম্লান হেসে মমতাজ বলে: এ চেহারা নিয়ে বাইরে বেরুতেই লজ্জা করে।

—কেন, কি হয়েছে আপনার চেহারার? সকৌতুকে সেলিমা জিজ্ঞেস করে।

— হবে আবার কি, শুকিয়ে হাড়। মমতাজ একটু রসিকতা করবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না।

—সে আপনার মিছে ভাবনা, আমার চোখে ত' আপনাকে শুকনো লাগে না। সেলিমার আশ্বাস দিবার ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার।

সহসা মমতাজের খেয়াল হয়, নিজেকে নিয়ে সে বড্ড বেশী ভাবছে। আর একজনও আছে, যার কথা তার ভাবা সমান দরকার।

কোমল স্বরে বলে: চলো বেড়িয়ে আসা যাক্।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যুদ্ধাবসানে কলকাতা আর নিষ্প্রদীপ নয়, যদিও আগেকার সেই ঔজ্জ্বল্য শহরের রাস্তায় পাওয়া যায় না। ফিটন চলেছে নিজ খেয়ালে।

পার্ক স্ট্রীটে ফিটন পৌছালে রাস্তার দু'দিকের বাড়ীর দিকে মমতাজ আবিষ্ট, অনেকটা স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তিন পুরুষ ধরে তারা কলকাতায় আছে। কলকাতার হাওয়া ও উত্তাপ, সৌন্দর্য ও জটিলতা, পাপ ও মহত্ত্ব মমতাজের রক্তমাংসে মিশে আছে। তার চোখে কলকাতা অপরূপ সুন্দর। অথচ কলকাতার শোভাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার মত তার স্বাস্থ্য নেই। কিন্তু খোদা, যদি অকালে মরতেই হয় মমতাজকে, তবে কলকাতার মাটির বুকে যেন সে আশ্রয় পায়। তাতে মরণের বিভীষিকা ও কারুণ্য অনেকটা শিথিল হয়ে আসবে।

মৃদু স্বরে সেলিমা জিজ্ঞাসা করে: কি ভাবছেন?

সে-প্রশ্নের কি উত্তর দিবে মমতাজ ? এক কথায় কি করে সেলিমাকে বুঝানো যায় জীবনের দুর্বার আকর্ষণ শহরের প্রতিটি বৃক্ষে, প্রত্যেক অলিগলিতে, সমস্ত মানুষের মধ্যে, এখন-সুষুপ্ত মাঠের প্রতি বিন্দুতে ধ্বনিত হয়ে মমতাজের হৃদয়কে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। কি করে বলা যায় জীবনের প্রতীক এই শহর মমতাজের পার্শ্ববর্তিনীর নিটোল যৌবনের সঙ্গে একাকার হয়ে হৃতস্বাস্থ্য মমতাজের মনে গভীর এক আশঙ্কা ও গভীরতর এক হতাশার চিহ্ন এঁকেছে ?

তাই মমতাজ শুধু বলে ঃ কিছু না।

সেলিমা চুপ করে যায়।

ফিরে এসে অজ্ঞাত আশঙ্কায় মমতাজের মন আবার মুষড়ে পড়ে। তা বুঝতে পেরে সেলিমার মনও খারাপ হয়ে যায়।

সেলিমা বলে ঃ আপনি সব সময় এত মনমরা হয়ে থাকেন কেন ?

স্ত্রীর প্রশ্নকে উপেক্ষা করে মমতাজ জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা ধরো রিপোর্টে যদি আমার কোন খারাপ রোগ বেরোয়, তুমি ভয় পাবে না ত' ?

মুখে সমস্ত আশ্বাস এনে সেলিমা বলে ঃ ভয় পাবো কেন, আর আজকালকার দুনিয়ায় খারাপ রোগ বলে কিছুই নেই, ঠিক মত চিকিৎসা করলেই সেরে যায়।

—যদি আমার টি-বিই হোল, তাহলে চিকিৎসা করাতেই ত প্রচুর টাকা লাগবে, সে টাকা পাবো কই ? মমতাজ ভবিষ্যতের কথা তুলে।

- তা যেমন করেই হোক আমি যোগাড় করবো, কারো কাছে না পেলে নিজের গহনা ত' আছেই, আর নিজে আমি সেবা করে আপনাকে সুস্থ করে তুলবো। সেলিমার কণ্ঠে একাধারে গভীর মমতা ও নিবিড় আশ্বাস।

শঙ্কা-ক্ষুব্ধ স্বরে মমতাজ বলে ঃ আমার কিন্তু মনে হয় আমার খারাপ রোগই হয়েছে।

এইবার সেলিমা ভেঙে পড়ে। মমতাজের বুকের কাছে মুখ এনে করুণ মিনতির স্বরে বলে ঃ বলবেন না ও কথা আর, বলবেন না। নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে মমতাজ স্তব্ধ হয়ে যায় ; নিজের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা জাগে। আর নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে সেলিমাকে।

পরদিন বিকেলে যখন মমতাজ এক্স-রে করাতে যায়, তখন আশ্চর্য, তার মনে ভয় বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র থাকে না। অনেকটা হাল্কা বোধ

করে সে। শরৎকালের স্নিগ্ধ রোদ সারা শহরকে মধুর আবেশে তন্দ্রাহত করে রেখেছে। গাছের গাঢ় সবুজ পাতায় স্বচ্ছ রোদের প্রলেপ ; আকাশ সুগভীর নীল।

রাস্তায়, ট্রামে মানুষের অসম্ভব ভীড়। অসাধারণ কর্মব্যস্ততা চারদিকে। সব কিছুই মমতাজের চোখে সুন্দর মনে হয়। অথচ নিজের মনে সে একপ্রকার অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতা বোধ করে। সহসা তার মনে হয় ঃ জীবনে তাঁর পঁচিশবার বসন্ত এসে ফিরে গেছে, সে তেমন করে লক্ষ্য করে নাই। এই যে পঁচিশ বৎসর সে দুনিয়াতে বেঁচে রইলো তার বিনিময়ে সে অপরকে দিলো কি। জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা রূপান্তর বা সামান্য সার্থকতাও লাভ করলো কিসে? মৃত্যু যদি আসেই, মমতাজের এমন আফসোস করবার কি আছে! এতদিন যে সে বেঁচে রইবে সে প্রতিশ্রুতিই বা তাকে দিয়েছিলো কে?

অবশ্য তাব কিছু হলে সেলিমা বেচারী কষ্ট পাবে। সে জনাই যা দুঃখ। নিজের সম্বন্ধে মমতাজের মমতা থাকলেও তা এমন কিছু দুর্নিবার নয় যে, সর্বক্ষণ মৃত্যুভীতির বিভীষিকায় তার মন আচ্ছন্ন থাকবে। তবে কঠিন কোন ব্যাধি হলে সে খালি নিজের জীবনই নষ্ট করবে না ; সেলিমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনও সঙ্গে সঙ্গে অন্তত সাময়িকভাবে পরাভব মানবে। এই কচি বয়সেই সর্বদা হাস্য-কৌতুকময়ী সেলিমাকে যেন ব্যর্থতার আস্বাদ গ্রহণ করতে না হয় —খোদার দরবারে মমতাজের একমাত্র মোনাজাত।

এক্স-রে পরীক্ষা করবার পর ডাক্তার আশ্বাসছলে বলেন ঃ আপনার শ্বাস নিবার ধরন দেখে মনে হয় না যে, আপনার এমন কিছু রোগ আছে। তারপর দ্রুতকণ্ঠে ঃ অবশ্য রিপোর্ট না দেখে শেষ-পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে নয়, মমতাজ এমনিতেই স্বস্তি বোধ করে। এবার অন্তত ভাবনার আর কিছু থাকলো না। হয় তার রোগ আছে, নতুবা নেই। অনিশ্চয়তার হাত থেকে অতএব পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। সেটা কম কথা নয়।

—করিয়ে এলেন এক্স-রে? নিজের অজাতেই বোধ হয় সেলিমার স্বরটা একটু কেঁপে যায়।

—হুঁ। মমতাজের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—রিপোর্ট কবে দিবে? সেলিমার কণ্ঠে ব্যাকুল অধৈর্য।

—কালকে বিকেলে।

রিপোর্টে যদি কিছু বেরোয়, বৈকালিক ভ্রমণের পর বাসায় ফিরে এসে হাস্যচ্ছলে মমতাজ বলে, তা'হলে বাসায় আর ফিরে আসবো না।

—পারবেন? চোখে অগাধ বিস্ময় এনে সেলিমা জিজ্ঞেস করে।

সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া মমতাজ দরকার মনে করে না।

পরদিন বিকেলে মমতাজ রিপোর্ট আনতে যায়। মনটা অনেকটা ভারমুক্ত বোধ হয়। কিন্তু ডাক্তারের বাসার কাছে এসে শঙ্কায় আবার চিত্তে দোলা লাগে। রিপোর্টে কি বেরোয় খোদাই জানেন। এক নিমিষে হয়ত মমতাজের চোখে সারা দুনিয়ার চেহারাটা বদলে যাবে। এই অনুভূতিটা ভারী আশ্চর্যের। কয়েক মিনিটের ভেতরেই মমতাজ জানতে পারবে, তার ভবিষ্যতের চেহারাটা কেমন হবে! বর্তমানে থেকে ভবিষ্যতের কথা জানতে পারাটা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে।

ডাক্তার তখন অন্য কামরায় ব্যস্ত। নিজের এক্স-রের ছবিটা মমতাজ নিজের চোখের সামনে দেখতে পায়। বুকের ভিতরের সমস্ত হাড়ের নগ্ন চিত্র। মানুষের শরীরের ভিতরটা কি অদ্ভুত। অজ্ঞাত ভয়ে মমতাজের মন আবার ভরে যায়। না জানি তার বুকের ভিতরে কি রোগ আশ্রয় পেয়েছে।

ডাক্তার আসেন। মমতাজ কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে: রিপোর্ট তৈরী?

—দু'মিনিট অপেক্ষা করুন।—বলে ডাক্তার এক্স-রের ছবিটা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন।

প্রতীক্ষা-স্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত অবশেষে অতিবাহিত হয়, মমতাজের বিক্ষুব্ধ মনে আকস্মিক অভাবনীয় জোর এনে।

ডাক্তার তার রিপোর্ট দেন।

স্খলিতকণ্ঠে মমতাজ জিজ্ঞেস করে: বাসায় একটা ফোন করতে পারি, ডাক্তার?

—নিশ্চয়ই। ডাক্তার সহানুভূতিসূচক স্বরে বলেন।

ফোন করতে গিয়ে মমতাজের গলার স্বর কেঁপে ওঠে: কে?

ওপার থেকে জবাব আসে: আমি সেলিমা। রিপোর্টে কি বেরুলো?

—অনুমান করো। স্বরে গূঢ় রহস্য এনে মমতাজ বলে।

—বলুন না কেন! সেলিমার কণ্ঠে অধীর আগ্রহ।

মমতাজ ফিসফিস করে কি যেন বলে।

বাইরে তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। শরৎকালের বৃষ্টি। এখুনি থেমে যাবে। রাস্তায় একটু কাদা কাদা ভাব। যান চলাচল তেমন নেই। কেমন যেন প্রতীক্ষার ভাব।

মমতাজের মনে হয়ঃ সেলিমা যৌবনের প্রতীক হয়ে ঠিক এমনিই প্রতীক্ষা-কাতর দৃষ্টিতে তার আগমনের দিকে চেয়ে আছে!

হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো সূর্যরশ্মি। খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ছাড়া আকাশ আশ্চর্য নীল। বাতাস আশ্চর্য মেদুর। বৃষ্টি-কণা ও সূর্যের আলোতে মিশে গাছের পাতাগুলি আশ্চর্য তাজা।

ভাবনাহীন, লঘু, আনন্দ-ঘন মন নিয়ে মমতাজ আবার ফিরে যায় সেই জগতে যেখানে প্রতীক্ষমানা সেলিমা যৌবনের পুনরাবিষ্কারের মাদকতায় শরতোজ্জ্বল দিনের মতো সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে। আর ভয় মমতাজের মন থেকে উবে যায়। যেমন প্রভাত কিরণের যাদুস্পর্শে কুয়াশা হয় বিতাড়িত।

এবং ঘোর বিস্ময়ে মমতাজ সহসা আবিষ্কার করে—শহরের রাস্তা কী সুন্দর, ভীড় কী সুন্দর! আকাশ কী উদার, প্রশস্ত, সম্ভাবনা উচ্চকিত!

আর এ-দুনিয়াতে বেঁচে থাকাটা কি অপরূপ!

ট্রামে উঠবার সময় চোখ ভরে মমতাজ সূর্যের আলো গ্রহণ করে, আর বুক ভরে বাতাস। নবজীবনের যাত্রী সে। নূতন দিনের আশ্বাস তার সর্বাঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ব্যাপ্ত।

লাজুক

সকলেই বলে শাহরিয়ার লাজুক। এমন কি তার অন্তরঙ্গতম বন্ধুরা পর্যন্ত; শাহরিয়ার নিজে কিন্তু বোঝে না, ঠিক কোন কাজে লজ্জা তার প্রকাশ পায়। সুতরাং যখন কেউ তাকে লাজুক বলে, মনে মনে সে চটে।

অথচ একথা অভ্রান্ত সত্য, বস্তুত সে লাজুক। একদিন তাদের বাড়ীতে কয়েকজন আত্মীয়া বেড়াতে আসেন। আত্মীয়াদের মধ্যে একজন শাহরিয়ারের সম্পর্কে মামাতো কি খালাতো বোন, তরুণী। নিজের কামরায় লক্ষ্মী ছেলের মত বসে শাহরিয়ার হাক্সলী পড়ছিলো (লক্ষ্মী ছেলেরা অবশ্য হাক্সলী পড়ে না)। শাহারিয়ারকে চমকিয়ে বোন বললো ঃ কি পড়ছো?

শাহরিয়ার বই থেকে মুখ তুলে পেছনে চেয়ে দেখে, শ্রীমতী রুবী।

রুবীকে শাহরিয়ার শাদা কথায় পছন্দ করে না। তার মানে এই নয় যে, দেখতে রুবী খারাপ। শাহরিয়ারের অনেক ক'টা আত্মীয়কে রুবী এর মধ্যে ডুবিয়েছে। চটক্ আছে রুবীর, গ্রীবা-ভঙ্গীর মহিমা আছে আর সর্বোপরি আছে তার কটাক্ষের মদির ভঙ্গী। তবুও রুবীকে শাহরিয়ার বরদাস্ত করতে পারে না তার ন্যাকামীর জন্য। মেয়েমাত্রই শাহরিয়ারের মতে কম বেশী ন্যাকা হয়। মেয়েদের মধ্যে রুবী আবার বিশেষ করে ন্যাকা।

তাই রুবীর কথার উত্তরে শাহরিয়ার শুধু বলে ঃ দেখছোই ত, বই পড়ছি।

—কি বই? রুবীর গলার স্বর কেমন যেন মিহি হয়ে যায়।

রুবীর প্রশ্ন শাহরিয়ারের কাছে অসহ্য লাগে, সে কি পড়ছে আর পড়ছে না, তা দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের মধ্যে রুবীই কেন জানতে আসবে শুনি?

রুবী বুঝি মনে করে তার মদির কটাক্ষে শাহরিয়ারের হৃদয় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। স্বরকে একটু চড়িয়ে শাহরিয়ার বলে : হাক্সলী।

রুবী অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে : হাক্সলী নাকি শাহরিয়ার ভাই, খুব পণ্ডিত লোক।

শাহরিয়ার খুব মোলায়েম স্বরে বলে : না, এমন আর পণ্ডিত কি।

শাহরিয়ারের অনেকটা কাছে সরে এসে রুবী বলে : আমায় হাক্সলী একটু বুঝিয়ে দেবে, শাহরিয়ার ভাই?

—সে সাধ্য আমার কই! মধুর আন্তরিকতার স্বরে শাহরিয়ার কথাগুলি উচ্চারণ করে।

এবার রুবী সত্যিই আহত হয়, হতাশার স্বরে বলে : তুমি বড় লাজুক, শাহরিয়ার ভাই। লাল হয়ে যায় শাহরিয়ারের মুখ। ওইটুকু মেয়ে রুবীও অনায়াসে বলে যায়, সে লাজুক—বাই জোভ। শাহরিয়ারকে সকলে কি পেয়ে বসেছে!

শাহরিয়ারের দুর্বার ইচ্ছে করে রুবীকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে যে সে সত্যিই লাজুক নয়। শাহরিয়ার হোল লাজুক? আচ্ছা।

হঠাৎ নাটকীয় ঢঙে উঠে রুবীকে, মনে মনে শাহরিয়ার ভাবে, একটা চুমু খেলে কেমন হয়? তার আগে বরং একটিবার রুবীকে পর্য-বেক্ষণ করা যাক। কিন্তু কোথায় রুবী?

কোন বন্ধুকে গর্বের ভঙ্গীতে শাহরিয়ার হয়ত বলে : এই সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল।

বন্ধু ত হেসেই আকুল : সত্যি!

চটে আগুন হয়ে যায় শাহরিয়ার : সত্যি নয়ত কি, তোমার সঙ্গে আমি মশ্‌কারি করছি নাকি?

—আহা মশ্‌কারি করবে কেন, তা শুনি কি ভাবে আলাপ হোল তোমাদের? বন্ধুর গলার স্বরে তখনও ব্যঙ্গের আভাস।

—আলাপ আর কেমন হবে, এই যেমন ভাবে হয়। অনেকটা নরম সুরে শাহরিয়ার বলে।

—অবশ্যি। বন্ধু শাহরিয়ারকে সমর্থন করে।

—মেয়েটা আমায় বললো, আমি নাকি খুব তুখোড়। শাহরিয়ার বললো।

—তাই নাকি? এ ত ভারী আশ্চর্য্যি! বন্ধুর মন্তব্য।

আলাপ হোল এইভাবে, মেয়েটা একটা নীল রঙের শাড়ী পরে এসেছিলো।

আমি বললাম—বাঃ এই শাড়ীতে ত বেশ মানিয়েছে আপনাকে। মেয়েটা শুধু হাসলো। অবশ্য মেয়েটাকে আমি আগে থেকেই জানতাম। কিছুক্ষণ এমনি কথাবার্তা হবার পর মেয়েটা আমায় জিজ্ঞেস করলো: আপনার কাছে হাক্সলীর 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' আছে? উত্তরে আমি বললাম: হ্যাঁ। মেয়েটা আবার জিজ্ঞেস করলো: হাক্সলী আপনার কেমন লাগে? আমি বললাম: চমৎকার। তারপর আরম্ভ করলাম হাক্সলী সম্বন্ধে বক্তৃতা। জানইত তুমি, হাক্সলী আমার বেশ জানা আছে। আমার বক্তৃতা শুনে মেয়েটা ত অভিভূত। যাবার আগে বলে গেলো: আসবেন কিন্তু আমাদের এখানে মাঝে মাঝে। আমি বললাম: নিশ্চয়ই। হাক্সলী সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনে মেয়েটা সত্যি বলছি ভাই, একেবারে নিবাক হয়ে গেছে।

—আর কিছু হয়নি ত? বন্ধু উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

—আমার কথা বিশ্বাস হোলনা তোমার? শাহরিয়ারের গলায় আবার উগ্রতা ফিরে আসে।

—তুমি আজকাল বেশ গল্প করতে পারো, এটা কিন্তু সুলক্ষণ, গল্প করতে করতেই তোমার লজ্জা ধীরে ধীরে কাটবে এবং লজ্জা কাটবার পর হয়ত একদিন সত্যি সত্যিই একটি মেয়েকে তুমি হাক্সলী বোঝাতে চেষ্টা করবে। চাইকি···

বিহ্বল হয়ে শাহরিয়ার বন্ধুর কথা শোনে। এ যেনো 'সারনন অন দি মাউণ্ট।'

তীব্রস্বরে শাহরিয়ার বলে: যাক্ তোমার চাইকি। বলে অতর্কিতে বন্ধুকে বিব্রত করে সে চলে যায়।

সেদিন থেকে শাহরিয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

বাস্তবিক, শাহরিয়ার এখনও বুঝতে পারলো না, লোকে তাকে কেন লাজুক বলে।

তার প্রায় প্রত্যেক ক'টা বন্ধু ভাবে, অসাধারণ-ভাবে চমৎকার ছেলে শাহরিয়ার, কিন্তু মেয়েদের কথা জানতে শাহরিয়ারের কাছে কেউ যাবে না। এত নভেল পড়েছে শাহরিয়ার, বিভিন্ন রকমের এত নারীচরিত্রের

সাক্ষাৎ পেয়েছে সে বইয়ে, আজ তারই নাকি মেয়েদের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই! পাগলামি আর কাকে বলে! শাহরিয়ার আর সব ব্যাপারেই খুব নম্র, কিন্তু বন্ধুরা যখন ইঙ্গিতে জানায় সে খুব লাজুক এবং ঠিক একারণেই মেয়েরা তার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং হবে, তখন মেজাজ ঠিক রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়। লাজুক বললেই সে লাজুক হয়ে গেলো? এ কি গায়ের জোরের কথা। তাকে লাজুক বলা তাকে অত্যাচার করবার সামিল। বন্ধুরা ভাবে তারা সকলেই এক একটা ডন-যুয়ান আর শাহরিয়ার এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু। কি অহমিকা তার বন্ধুদের!

শাহরিয়ারের মামা এক মফঃস্বল কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, শাহরিয়ার যদি কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁর এখানে আসে তবে তিনি খুব খুশী হবেন। চিঠি পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই শাহরিয়ার মামার বাড়ী এসে হাজির হোল। মস্ত বাড়ীতে মামা একা থাকেন, বাড়ীটা কলেজ-সংলগ্ন।

বাড়ীটির অবস্থান লক্ষ্য করবার মত। একটি দীর্ঘ বারান্দা বাড়ীটিকে কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। মেয়েরা সে-বারান্দা পার হয়ে কলেজের অঙ্গনে গিয়ে পড়ে। কলেজটিতে সহ-শিক্ষা প্রচলিত আছে। ঠিক যে সময়টিতে মেয়েরা শাহরিয়ারের মামার বাড়ীর সামনের বারান্দা দিয়ে কলেজে যায়, সে সময় শাহরিয়ার বারান্দার মুখোমুখী যে প্রকাণ্ড কামরাটা সেখানে বসে, মেয়েদের লক্ষ্য করবার জন্যে। রূপসী মেয়ের সংখ্যা অবশ্য খুব কম, তবে রঙ্-বেরঙের শাড়ী দেখেও মনে রঙ্ ধরার সম্ভাবনা থাকে। যদিই বা তার মনে এখনও লজ্জার ভাব কিছুটা থেকে থাকে তবে এই পন্থা অবলম্বন করে শাহরিয়ার ক্রমে ক্রমে সেটুকু লজ্জা জয় করবে। এবং কলকাতায় ফিরে গিয়ে সকলকে নিজের আড়ম্বর-হীন, সহজ অথচ তীক্ষ্ণ ব্যবহারে চমকিয়ে দেবে। তখন তার সঙ্গে কথা বলতে এসে রুবীর মত মেয়েও থ' ব'নে যাবে সুনিশ্চিত।

মামা একদিন এসে বললেনঃ হাঁরে, তোর কি এখন কিছু কাজ আছে?

না, এমন কিছু কাজ নেই—প্রত্যুত্তরে শাহরিয়ার বলে।

—তবে একটা মেয়েকে দিন কয়েক পড়িয়ে দিবি, বেচারীর ফাইনাল একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

ভিতরে চমক খায় শাহরিয়ার, বাইরে প্রায় উপেক্ষার স্বরে বলে ঃ আই. এ. পড়ে বুঝি ?

—হ্যাঁ, আমার সময় নেই জানিস ত, না হলে আমিই পড়িয়ে দিতাম। ভাল করে পড়িয়ে দিবি – বুঝেছিস।

শাহরিয়ার বলে ঃ তা আপনি কিছু ভাববেন না, মামা। মেয়েটাকে খুব ভালো করে পড়িয়ে দেবো।

মামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন ঃ বাঁচালি তুই আমায়।

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হলে পুরুষদেরও ন্যাকা সাজতে হয়। নতুবা শাহরিয়ার তার ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করতে যাবে কেন ঃ আপনি বুঝি এবার আই. এ. দেবেন ?

মেয়েটি বলে ঃ হ্যাঁ।

—কোন্ সাবজেক্টে আপনার অসুবিধা লাগছে ? শাহরিয়ার ভাবলো, খুব চালাকী করে জিজ্ঞেস করা হোল কোন্ সাবজেক্টে মেয়েটি কাঁচা।

ইংরেজী বুঝতে আমার ভয়ানক অসুবিধা হয়; আর থার্ড পেপারের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝি না—মেয়েটির আড়ষ্টতা কেটে গেছে মনে হয়।

তা'হলে আপনি বরং একটা 'সাবস্ট্যান্স্' লিখুন—শাহরিয়ার মেয়েটিকে একটা 'সাবস্ট্যান্স' লিখতে দেয়।

ক্রমেই বোঝা গেলো, মেয়েটি বুদ্ধিমতি ত বটেই একটু অগ্রসর-পন্থীও। আচরণে, কথাবার্তায় দু'একটি মন্তব্যে মেয়েটি শাহরিয়ারের প্রতি নিজের মনোভাবকে ব্যক্ত করে। সে মনোভাবের কোমল একটি নাম আছে। শাহরিয়ারের পক্ষ থেকে কিন্তু সাড়া পাওয়া দুষ্কর! মেয়েটির মনে হয় ঃ শাহরিয়ার ভয়ানক লাজুক।

শাহরিয়ার ভাবে ঃ মেয়েটি কেমন যেন।

একদিন শাহরিয়ার গভীর মনোনিবেশসহকারে মেয়েটিকে এইচ্.জি. ওয়েল্সের লেখা 'কাণ্ট্রি অব দি ব্লাইণ্ড্স্' পড়াচ্ছে। হঠাৎ মেয়েটির দিকে দৃষ্টি পড়াতে শাহরিয়ার দেখলো, তার দিকে মেয়েটি গভীর করুণ নয়ন মেলে চেয়ে আছে। প্রায় কাঁপন ধরে যায় শাহরিয়ারের মনে। আর লজ্জায় তার গণ্ড দু'টিতে রক্ত জমে যায়।—আচ্ছা, অন্ধ মেয়েরা ভালোবাসতে পারে ? অনেকটা মদির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

—তা পারে বৈকি, ভালবাসার ত কোন হিসেব নেই—মর্মান্তিক আয়াস করে শাহরিয়ার শেষ পর্যন্ত কথাগুলি উচ্চারণ করতে পারলো।

—অন্ধ মেয়েকে কি কোন পুরুষ ভালবাসতে পারে? আলোর মাধুর্য যে বুঝলো না সে কি করে ভালোবাসবে এবং ভালোবাসলেও তার পক্ষে কোন পুরুষের, যার দৃষ্টিশক্তি আছে, ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব কি করে? মেয়েটির গলার স্বরে কারুণ্য ফুটেছে।

—এ হোল সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা। মেয়ে অন্ধ বলেই তাকে ভালো-বাসা অসম্ভব এমন কথা বলা যায় না।

—তবে এ গল্পের নায়ক অন্ধ মেয়ের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে চলে গেলো কেন? মেয়েটির স্বরে বেদনা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—এখানে আমার মনে হয়, আপনি লেখকের উদ্দেশ্যটি ভুল বুঝেছেন। এ গল্পে এইচ. জি. ওয়েলসের এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আলোর প্রতি মানুষের জন্মগত আকর্ষণ, আলোর পিপাসা মানুষের মধ্যে অদম্য। যদি নায়ক অন্ধ মেয়ের প্রেমের খাতিরে নিজে অন্ধ হয়ে অন্ধের দেশে থাকতো তবে সেটা প্রেমের সাফল্য বা মহিমা হোত না, সেটা হোত তার মানুষ্যত্বের পরাজয়। আমার নিজের মনে হয় মনুষ্যত্ব প্রেমের চেয়েও বড়। শাহরিয়ার দরদ দিয়ে কথাগুলো বলে।

আচ্ছা আজকের মত পড়া এখানেই থাক্, আমার একটু মাথা ধরেছে আবার—মেয়েটি বিষণ্ণ হাসি হাসে।

মেয়েটি যখন ঈষৎ ক্লান্ত পদক্ষেপে চলে গেলো শাহরিয়ারের তখন মনে হোল, মেয়েটি বুঝি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

প্রায় দিন দশ হ'ল সুলতানা (শাহরিয়ার এর মধ্যে অবিশ্যি মেয়েটির নাম জানতে পেরেছে) আর পড়তে আসে না। ব্যাপারটা শাহরিয়ারের কাছে একটু আশ্চর্য মনে হয়, এবং চমকিত হয়ে একদিন শাহরিয়ার আবিষ্কার করে, সুলতানা সম্বন্ধে তার এক প্রকার অদ্ভুত আগ্রহ জন্মে গেছে। আগ্রহটা যে ঠিক নৈর্ব্যক্তিক নয় তা বুঝতেও শাহরিয়ারের দেরী লাগে না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শাহরিয়ার তার মামাকে বললো: সুলতানা ত আর পড়তে আসেন না, মামা।

—তাই নাকি, কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত মামা ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করবার সুযোগ পান: বোধ হয় অসুখ-টসুখ করেছে।

—খোঁজ নিয়ে এলে হয় না একবার। অত্যন্ত করুণ স্বরে শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, তাইতো, যা একবার খোঁজ নিয়ে আয়গে। মামা অন্য কাজে চলে যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহরিয়ারের যাওয়া হয় না। পাগল, কি অছিলায় সে সেখানে যাবে। সুলতানাদের ওখানে গেলে শাহরিয়ারের এই অর্থহীন দুর্বলতায় সুলতানা মনে মনে হয়ত খুব একচোট হাসবে ; যা অসহ্য। আর লজ্জাও করে ভারী। এই লজ্জাই তাকে ডুবাবে দেখছি। সে কি তা হলে বস্তুতই মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক। তার দিকে অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাকাতে সুলতানার ত লজ্জা করে না। তবে তার কিসের এত লজ্জা। পুরুষ হয়ে শাহরিয়ার জন্মেছিলো বুঝি খালি লজ্জায় অধোবদন হবার জন্য ?

সুলতানা মেয়েটি সত্যি ভারী লক্ষ্মী। এত নম্র, এত কোমল, এত আশ্চর্যভাবে গভীর। সুলতানার কি হলো ? তড়িৎশিখার মত এক চিন্তা শাহরিয়ার মনে দ্রুত খেলে যায় ঃ সুলতানা তার উপর অভিমান করেছে !

যদিই বা সুলতানা শাহরিয়ারের উপর অভিমান করে থাকে, তবুও তার অভিমান বেশী দিন টিকল না। কারণ, একদিন বইটই নিয়ে আবার এসে হাজির হোল শাহরিয়ারের কাছে। আজ সুলতানা বিশেষ করে কানে দুল পরেছে, কপালে দিয়েছে একটা টিপ, মুখে পাউডারের একটু আভাস, পরনে আসমানী রঙের শাড়ী—সব মিলে তাকে দেখতে হয়েছে চমৎকার !

খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শাহরিয়ার চেষ্টাকৃত নির্লিপ্ত স্বরে বলে ঃ এত দিন যে আপনি আসেন নি ?

—শরীরটা তেমন ভালো ছিলো না—সুলতানা মিষ্টি হেসে বলে।

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না শরীরটা আপনার এমন কিছু খারাপ ছিলো—সাহস করে শাহরিয়ার বলেই বসে।

সুলতানার গণ্ড দুটি রক্ত-কমল।

—আপনার পরীক্ষার ত মাত্র আর দিন কুড়ি বাকী। শাহরিয়ারের কথাগুলোর বিশেষ কোন মানে হয় না।

—হ্যাঁ। জড়িত স্বরে সুলতানা বলে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে শাহরিয়ার বলে ঃ আজকে কি পড়বেন ?

—'ইম্পিচমেণ্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস'টা আজ একবার পড়িয়ে দিন।

সুলতানা প্রায় অনুনয়ের স্বরে বলে।

—আপনাকে যে 'এসে'টা লিখতে দিয়াছিলাম, সেটা লিখেছেন? শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করে।

অপরাধীর মতো নতমুখে সুলতানা বলেঃ না, লেখা হয় নি।

শাহরিয়ার কিছু না বলে সুলতানাকে 'ইম্পিচমেণ্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস' পড়াতে আরম্ভ করে।

যখন সুলতানা চলে গেলো তখন শাহরিয়ারের কাছে সমস্ত কিছু কেমন যেন শূন্য মনে হতে লাগলো। যাবার সময় পেছন ঘুরে সুলতানা তার দিকে চেয়ে ভুবনমোহিনী হাসি হেসেছিলো। বিশেষ করে সুলতানা যখন হাসে—দাঁত একটু একটু ফাঁক করে, তখন তাকে দেখতে যা হয়! মামার প্রতি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ এক আচ্ছা বিপদে পড়া গেলো! মনে মনে শাহরিয়ার এটা জানে, সুলতানাকে সে সাংঘাতিক পছন্দ করে, হয়ত বা ভালবাসেও। অথচ প্রাণান্ত চেণ্টা করেও সে এ পর্যন্ত সুলতানার প্রতি তার আসল মনোভাব কিছুটাও প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নি। তাই নিদারুণ মানসিক অস্বস্তিতে শাহরিয়ারের সময় কাটছে। সুলতানা যে তার উপর খুব অসন্তুণ্ট নয়, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই সে অনেকবার পেয়েছে। তবুও মূল্যবান সময় অতিবাহিত হচ্ছে কুণ্ঠায় এবং লজ্জায়। আনন্দে ঝলসে উঠতে পারতো যে মুহূর্ত তা নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে প্রকাশের অক্ষমতায়। হৃদয়ের অনুভূতি মুষড়ে পড়ছে ক্রমশ; সময়ের পাখা আছে; সুলতানার মন অন্যদিকে ঝুঁকে পড়তেও পারে। সব মিলে সমূহ বিপদ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে এক এক সময় শাহরিয়ারের মাথায় আগুন ধরে যায়। কেন তার এ অপরিসীম লজ্জা, কেন এ বীভৎস কুণ্ঠা, কেন এই নির্বোধের মতো চুপ করে বসে থাকা? সকলে ঘন ঘন লাজুক বলে তাকে সত্যি সত্যিই লাজুক করে দিয়েছে? এই আড়ণ্ট লজ্জা কাটিয়ে তার জাগবার সময় এখনও কি হোল না? এখন না হোলে আর কখন হবে? সুলতানা ত চিরকাল আর তার অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

আজকাল সুলতানা প্রায় রোজ পড়তে আসে। সুলতানা, বোঝা যাচ্ছে, অধীর হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার চিন্তার চেয়ে আর একটি চিন্তাই তাকে পেয়ে বসেছে বেশী। শাহরিয়ারের চোখে সে কি যেন খুঁজতে চায়। কখনো কখনো সুলতানা শাহরিয়ারের চোখে যা সন্ধান করে, তা হয়ত পায়। তখন তার মুখ গভীর সুখে ভরে যায়ঃ পরক্ষণেই তার চক্ষু-তারকা বিহ্বল হয়ে উঠে, মুখাভিব্যক্তিতে কারুণ্য ভাষা পায়। আর তা লক্ষ্য করে তুফানে লক্ষ্যহারা পাখীর মতো শাহরিয়ার গুমরাতে থাকে। তবুও তার নীরবতা ভাঙবে না, তবুও তার কুণ্ঠা।

আজকে সুলতানার পরীক্ষার দিন। পড়া তার কতদূর হয়েছে খোদাই জানেন। শেষে পরীক্ষায় কেলেঙ্কারী না করে বসে সুলতানা। হায়, ভোর ছটার সময় সুলতানা এসে হাজির হয়। সুলতানার চেহারা দেখে ভারী মমতা হয় শাহরিয়ারের। আহা বেচারী, ভেবেচিন্তে অমন সুন্দর মুখখানি কি হয়েছে দেখো।

অত্যন্ত করুন স্বরে সুলতানা বলেঃ আমি কি পাস করতে পারবো?

সুলতানার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে তার প্রতি শাহরিয়ারের মনে করুণা উথলে উঠেঃ ঘাবড়াবার কিছুই নেই, মিছিমিছি ভেবে সারা হচ্ছেন কেন?

আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে, যদি ফেল করে বসি। সুলতানার গলার স্বরে কারুণ্য গভীরতর হয়েছে।

—না ফেল করবেন কেন, নিজের উপর কিছুটা বিশ্বাস রাখুন। মাস্টারের অভিনয় শাহরিয়ার করছে বেশ।

—তাহলে আপনি বলছেন আমি পাস করে যাবো? সুলতানার মুখে উজ্জ্বলতা দেখা যায়।

—তা করবেন বৈকি, নিশ্চয়ই করবেন। শাহরিয়ার আশ্বাস দেয়।

—সে ভরসা নিয়েই তা'হলে আমি পরীক্ষা দেবো—সুলতানার কণ্ঠে আশ্চর্য গভীরতা।

শাহরিয়ার কিছু বলে না, সুলতানার দিকে খালি এক ঝলক চায়। সুলতানার কথাগুলোর পেছনে কোন নিগূঢ়তর সঙ্কেত আছে কি না তাই শাহরিয়ার ভাবতে থাকে। ভেবে অবশ্য সে কোন শেষ সীমানা করতে পারে না। তার সেই অবশ্যম্ভাবী লজ্জা তাকে বাধা দেয় ইঙ্গিতে

সুলতানাকে এ কথা জানাতে : যদি খোদা না করুন, সুলতানা পরীক্ষায় ফেলই করে, তবে সেটা তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে না। কারণ, তখন সুলতানার হতাশাকে লাঘব করবার ভার শাহরিয়ার নিজে সানন্দে বরণ করে নেবে, অবশ্যি যদি সুলতানা সে অধিকার তাকে দেয়। হৃদয়ে যদিও তার সঙ্গীত, ভাষা তার মূক।

দুপুরে হল কামরার এক কোণে বসে শাহরিয়ার নিয়ত এ কথা ভাবছে, এবার সুলতানার সঙ্গে তার দেখা হলে সে একথা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে, সে সুলতানাকে ভালোবাসে।

ঠিক এমন সময় বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে শাহরিয়ার দরজার দিকে এগুতে থাকে। দরজা না খুলেই একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞেস করে : কে ?

—আমি। সুলতানার গলার স্বর মধ্যাহ্নের অলস রূপকে সঞ্জীবিত করে। দরজা খুলে দিতেই সুলতানার প্রসন্ন মূর্তি শাহরিয়ারের চোখে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে দেখা দিলো। সুলতানার মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

—হোয়ে গেলো আপনার ফার্স্ট পেপার ? শাহরিয়ারও খানিকটা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ।

—কেমন হোল ?

সুলতানা অকারণে ফিক করে হেসে ফেলে : ভালো।

হঠাৎ শাহরিয়ারের একথা মনে পড়লো,—দরজার কাছে সুলতানাকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখাটা হাস্যকর। তাই কণ্ঠে উষ্ণতা এনে বললো : এমনভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভিতরে আসুন।

সুলতানা ভিতরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। এখন সুলতানাকে একটু উদ্ব্যস্ত মনে হচ্ছে। কিছু যেন বলতে চায় অথচ বলে উঠতে পারছে না।

লজ্জা কাটিয়ে সাহস করে শাহরিয়ার বলে : আমায় কিছু বলতে চান ?

সুলতানার মৌনতার ভিন্ন এক অর্থ করে কণ্ঠে আরও উষ্ণতা এনে শাহরিয়ার বলে : কিছু বলবেন ত বলুন না।

অনেকক্ষণ উস্‌খুস করে সুলতানা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হোল : বাথরুমটা কোথায় একটু দেখিয়ে দিতে পারেন ?

শাহরিয়ার একটু মর্মাহত হয়। সে ভেবেছিলো এই সুযোগে সে সুলতানাকে জানিয়ে দেবে তার প্রতি সে আসক্ত, এত বেশী আসক্ত যে আর ফিরে যাবার উপায় নেই। আর সুলতানা নাকি শেষ পর্যন্ত বাথরুম কোথায় তাই জানতে চাইলো। মেয়েদের মন বোঝা ভার, শাহরিয়ার মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—কথাটা বলে ফেলে সুলতানা লজ্জায় প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। এখন যদি শাহরিয়ার চুপ করে থাকে বা আমতা আমতা করে তবে ব্যাপারটা আরও লজ্জাজনক হয়ে পড়বে।

তাই সহজ কণ্ঠে শাহরিয়ার বলে ঃ চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

প্রকাণ্ড বাড়ীতে আর একটিও লোক নেই, চাকরটাও অনুপস্থিত। বাথরুমটা বাড়ীর এক কোণে,—বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হয়। বিশেষ করে এখন শাহরিয়ারের মনে দশদিক থেকে লজ্জা ভীড় করে এসেছে। আর লোভও হচ্ছে। এমন অবস্থায় এমন কোন পুরুষ নেই যার কিছুটা মতিবিভ্রম দেখা না দেবে। অতএব শাহরিয়ারেরও। কিন্তু ভাগ্যিস্ এ বিপদ থেকে লজ্জা তাকে বাঁচিয়েছে। লজ্জা সব সময় শাহরিয়ারকে বিব্রতই করেছে, কিন্তু আজকের দিনে লজ্জাই তার সব চেয়ে বড় বন্ধু।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে সুলতানা আগে আগে চলতে থাকে, পেছনে শাহরিয়ার। দু'একবার সুলতানা তার দিকে পিছন ফেরে তাকিয়েছেও, কিন্তু শাহরিয়ার নিজের মাথা গরম হতে দেয় নি। সুলতানার অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করতে হয়ত শাহরিয়ারের পৌরুষে বাধে না, তবে লজ্জায় বাধে।

লজ্জাই তা হলে শাহরিয়ারের সব চেয়ে বড় ভূষণ। সুলতানাকে বোধ হয় আর কোনদিন বলা হবে না, আমি তোমায় ভালবাসি। সুলতানার একটা ভুল ধারণা থেকে যাবে হয়ত—শাহরিয়ার তার প্রতি উদাসীন। অথচ খোদাই জানেন বিপরীতটাই সত্য। কিন্তু লজ্জার এই কঠিন আস্তরণ কি করে ভেদ করা যায়? কেউ বলতে পারে শাহরিয়ারকে—কি করে?

সুলতানা বলে ঃ এবার আমার যেতে হবে, সেকেণ্ড পেপার আরম্ভ হবার আর মিনিট দশ দেরী আছে।

শাহরিয়ার নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সুলতানা আবার বলে খুব মোলায়েম হেসে ঃ আমায় পরীক্ষার হল পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন।

শাহরিয়ার সহজেই রাজী হয়ে যায়। অথচ সমস্ত পথটা সে চুপ করে যাবে, যদিও ইঙ্গিতে সুলতানা তাকে একথা জানাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না যে, এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা শাহরিয়ারের পক্ষে স্রেফ বেকুফী হবে। এবং এটাই বোধ হয় শেষ সুযোগ।

সবচেয়ে বেশী মানাবে যে উপাধি শাহরিয়ারকে—তা হোল লজ্জার বাদশাহ্।

শেষের ঘটনাটি এইরূপ ঃ

তাদের বাসাসংলগ্ন বাগানে শাহরিয়ার সন্ধ্যার সময় ঘুরছিলো। হঠাৎ বাগানের অপর প্রান্তে তার চোখ পড়ে। অনেকগুলি মেয়ে নানারকমের ঝলমলে রঙের শাড়ী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছিলো, ফুল তুলছিলো। আজকের সন্ধ্যাটা বেশ মধুর। আকাশের রঙ্ মেয়েদের শাড়ী এবং হাসি সন্ধ্যার শোভাকে অসহনীয়ভাবে সুন্দর করে তুলেছে।

শাহরিয়ারের কাছ দিয়ে যে দুটো মেয়ে হাত ধরাধরি করে চলে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজনকে শাহরিয়ার সুলতানা বলে চিনতে পারে। হলদে রঙের শাড়ী পরেছে সুলতানা, এই আবছা আলোয় তাকে দেখতে যা হয়েছে!

সুলতানার সাথী শাহরিয়ারকে লক্ষ্য করে ফিসফিস করে কি বলে তার বন্ধুকে। সুলতানা অনুনয়ের স্বরে বলে ঃ ওসব কিছু বলিস্ না ভাই, শুনতে পেলে এখুনি চলে যাবে, ও ভয়ানক লাজুক। বলে সুলতানা শাহরিয়ারের দিকে ত্রস্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে।

আর সুলতানার কথাগুলি শাহরিয়ারের অন্তস্তল চিরে অসহায়তার দুঃখে তাকে প্রায় পাগলের মত করে তোলে। তার গাল দুটিতে শেষ সন্ধ্যার রঙ্ যেন জমে গেছে। সব কিছু তার কাছে বিস্বাদ অর্থহীন দুর্বিষহ মনে হয়।

নিজেকে অভিশাপ দিতে দিতে শাহরিয়ার বাগান থেকে চলে যায় দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে ; "আমি লাজুক, আমি লাজুক! হে খোদা, আমি লাজুক।"

অথচ আজকের সন্ধ্যা কি অপরূপ সুন্দর!

বিলকিশ

জয়নাব ও বিলকিশ দুই সহোদরা বোন। বহু দিন হোল তাদের মা জিন্নতবাসী হ'ন। কোনও এক বিখ্যাত খানদানের মেয়ে ছিলেন তাদের মা। তিনি মারা যাওয়াতে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দুই কন্যার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হওয়ায় মাসে মাসে প্রত্যেকেই পঁচাত্তর টাকা করে মাসোহারা পায়। এবং পরলোকগত মার গহনাপত্রেও সমান অংশীদার হয় তারা।

এখন তারা উভয়েই কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত এক সরকারী এবং মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কলেজের ছাত্রী। বিলকিশ পড়ে দ্বিতীয় বার্ষিকে; আর জয়নাব, যে বড়, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। কলেজ-মহলে দু'বোনেরই বেশ খ্যাতি। চেহারা তাদের উভয়েরই মোটামুটি ভালো, চালচলন নিখুঁত এবং আদব-কায়দাদুরস্তও তারা।

বিশেষ করে জয়নাব ত খুব হাসি ও মিলনসার। গড়ন জয়নাবের বেশ মোটার দিকে হলেও তার মুখে না'কি এমন একটা সুশ্রী মাধুর্য আছে যা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করে। বিলকিশ ছিপছিপে, শ্যামলা এবং তার মাথায় অরণ্যের মত চুল। ছাত্রী-হিসেবে জয়নাব থেকে ভাল; কিন্তু বড় বোনের মত সকলের সঙ্গে ততটা মিশতে পারে না। অনেকে কানাঘুষা করে যে, তার দেমাক আছে। বোধ হয় তার স্বভাবজাত শরম এই ধারণার মূলে। দু' বোনের মধ্যে গলাগলি ভাব। কেউ কাউকে ছেড়ে কোথাও যায় না। না বেড়াতে, না সিনেমায়। পরস্পরের প্রতি তাদের এই অনুরাগ, তাদের পরিচিত সব বন্ধু ও আত্মীয়জন মোহিত হয়ে লক্ষ্য করে। এর কারণও আছে। তাদের মা সেই ছোট বেলায় মারা যাওয়ার পর থেকে তারা দু'জনেই তাদের দাদার সঙ্গে একত্রে থেকে এসেছে। দাদা অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট।

কলকাতায় তিনটা বাড়ী করেছেন; প্রচুর টাকা-পয়সা। তাদের আব্বাজান আবার শাদী করায় মা মারা যাওয়ার পর এখনও তাঁর সঙ্গে তাদের থাকবার সুযোগ হয়নি। এবং সত্যি বলতে কি, আব্বাজানের সাহচর্যের অভাব তাদের দু'বোনের মধ্যে কেউ তেমনভাবে অনুভব করে নি।

তাই দাদার স্নেহচ্ছায়ে একত্রে থেকে দু'বোনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভাব গড়ে উঠেছিলো। কেউ কারও কাছে কোন কথা লুকোত না। এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, একত্রে কলেজে যাওয়া এবং কখনও পরস্পর থেকে তেমনভাবে বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় বিলকিশ ও জয়নাব প্রত্যেকেই একে অপরকে নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করতো।

তাদের আত্মীয়-ভাগ্যও অসামান্য। আব্বাজান, যদিও তাঁর সঙ্গে এখন তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, সহকারী পুলিশ সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত। চাচাদের মধ্যে একজন নামকরা ইঞ্জিনিয়ার, একজন ধনী স্ত্রীর স্বামী এবং একজন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। সকলের কাছেই মা-হারা বাপ, তাদের বেশ খাতির। অতএব কোন ব্যাপারে তাদের সামান্যতম অসুবিধা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

এই রমণী অনুকূল অবস্থার সম্মুখ হেতু তাদের জন্য পয়গামও অসংখ্য আসিতো। কেউ মুন্সেফ, কেউ ডেপুটি। বেশীর ভাগ পয়গামই আসতো বিলকিশের জন্য। কারণ, জয়নাবের অবয়বের কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে অনেকের দাম্পত্য-আকাঙ্ক্ষাকেই অনেকটা নির্জীব করে তুলতো। কিন্তু জয়নাবের প্রশংসা করে এ-কথা বলতেই হবে যে, এর জন্য তার মনে কোন আফসোস ছিলো না বা সহোদরার প্রতি কোনও ঈর্ষা তার মনে কদাপি ভুল করেও জাগে নি। সমস্ত পয়গামই অবশ্য ধন্যবাদের সঙ্গে, এবং কখনও কখনও সেটাও বাদ দিয়ে, প্রত্যাখ্যান করা হোত। আই. সি. এস. বা আই. পি. এর ছাড়া জয়নাব ও বিলকিশের বিবাহের কথা ভাবাও তাদের মহান আত্মীয়দের কাছে এক চটুল বাতুলতা বলে মনে হোত।

ফলে জয়নাবের বয়স তেইশ ছাড়িয়ে গেলো এবং বিলকিশ পড়লো বাইশ বৎসরে, তবুও তাদের কুমারীত্ব ঘুচলো না।

কিন্তু যৌবন যখন আসে তখন তার দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না; ঠেকাতে গেলেই সমূহ বিপদ। প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিপালিত এবং কখনও

অভাবের সম্মুখীন না হলেও যৌবন সকলের অগোচরে উভয় বোনের কাছেই তার মাদকতাময় সওগাত নিয়ে আসে এবং নিভৃতে দুই বোনই কোনও কোনও বিরল মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে যৌবনের ডাকে সাড়া না দিবার ব্যর্থতায়।

বিলকিশ তাও পড়াশুনা এবং মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিজেকে মশগুল রাখবার প্রয়াস করে এবং অনেকটা সফলও হয়, কিন্তু অসুবিধা হয় জয়নাবের। আর সে পড়াশুনায় মন দিতে পারে না; বেড়িয়ে এবং সিনেমা দেখেও আগেকার মত আমোদ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় না; ভিতরটা কেমন খাঁ খাঁ করে।

তাই বেচারী বুঝে উঠতে পারে না, মনের এই সর্বব্যাপী বিষাদকে প্রতিরোধ করবার নিমিত্ত কি অস্ত্র সে প্রয়োগ করবে।

পয়গাম আসতেই থাকে, কিন্তু কোনটাই কারও মনঃপূত হয় না। একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে যায়। ফলে সব কয়টা পয়গামেরই এক দশা হয়। প্রস্তাবিত সম্বন্ধ নিয়ে দু' বোনের ভেতর যে আলোচনা হয়, তাও বেশ নাকউঁচু ধরনের!

জয়নাব হয়ত বলে, নিজের স্ফীতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে: ওমা, ও মুন্সেফটাকে কে বিয়ে করবে, ফুটবলের মত দেখতে।

বিলকিশ বোনকে সমর্থন করে: আর যাই কর আপা, মুন্সেফকে বিয়ে কর না। যা কিপ্টে হয়।

হয়ত এক ডেপুটির সঙ্গে বিলকিশের বিবাহের পয়গাম আসে। বিলকিশ বলে: আহা, ডেপুটিবাবুর কি সাধ, তাঁর সঙ্গে আমি নোয়াখালী আরামবাগ ঘুরে বেড়াই! কি যে চাকরি ডেপুটির! জয়নাব ফোড়ন কাটে: ওকে দেখলেই মনে হয়, ওর গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হবে, তিন চার বছরের মধ্যে তুই বুড়ি হয়ে যাবি, ওকে বল প্রিন্সেস মার্গারেট রোজকে বিয়ে করতে, তা ছাড়া পোষাবে না।

ভদ্রলোকের সন্তানরা তাদের অজান্তিতে এইভাবে নাজেহাল হতে থাকে এবং দুই বোনই তাদের কুমারীত্ব বজায় রাখবার উন্মাদনায় নিজেদের বগল বাজায়।

জয়নাব ও বিলকিশের বাপ-দাদা থেকে আরম্ভ করে মা-নানা পর্যন্ত সকলেই এক পীরের মুরীদ। মুরীদদের মধ্যে পীর সাহেবের অসামান্য প্রতিপত্তি। আশ্চর্য মিষ্টি তাঁর ব্যবহার, সকলের দুঃখেই তিনি শরীক

হ'ন। হাসিমুখে কথা বলে আত্মজনের মনকে হাল্কা করতে অদ্ভুত দক্ষতা তাঁর। খানকা শরীফে অন্যান্য মুরীদদের সঙ্গে জয়নাব বিলকিশও নিয়মিত যায়। সেখানে অনেক আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে খোশগল্প।

জয়নাব মিষ্টি হেসে ও অন্তরঙ্গ স্বরে দু'একটা কথা বলে সকলকেই খুশী রাখতে চায় এবং সফলও হয়। বিলকিশ অতটা মেলামেশা করে না। একদিকে চুপ করে বসে থাকে এবং সকলের কথা নিবিষ্ট মনে শোনে। খানকা শরীফের মার্বেলের মেঝে, ঝালর, দেয়ালে টাঙানো আরবী অক্ষরের বাণী, খাদেমদের ত্রস্ত ভাব, মুরীদদের শ্রদ্ধাবনত মুখ এবং সর্বোপরি হুজুরের স্মিতবদন, তার মনে কেমন এক অজানা অনুভূতির তরঙ্গ তুলে। সে অনুভূতির সঙ্গে অনেক দুঃদেশের স্বপ্ন, অসম্ভব চাওয়া, অশেষ শান্তি যেন মেশানো। এখানে এলে তার মনে এমন সব ভাবনা ভীড় করে, যার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এখানে কত জজ ম্যাজিস্ট্রেটের আনাগোনা; গা-ভরা ঝলমলে গহনা-পরা কত মেয়েমানুষ এখানে তাদের অন্তরঙ্গ দুঃখের কথা নিয়ে এসে হাজির হয়। হুজুরের একটু করুণা লাভের জন্য সকলের সে কি বিরামহীন চেষ্টা! এই ত প্রকৃত ক্ষমতা যা দুনিয়াদারী শান শওকতের ওপর নির্ভর করে না এবং যা কখনও নিঃশেষ হয় না। বাসায় ফিরে এলে দুনিয়াদারী চিন্তায় অবশ্য আবার বিলকিশের মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 'হোমব' থেকে শাড়ী, 'ধলমল' থেকে গহনা কিনতে সাধ যায় এবং মন 'মেট্রো' ও 'লাইট হাউস'এর প্রেক্ষাগৃহে বিচরণ করে। স্বভাবিক, মহার্ঘ এক শাড়ী পরে, সুনির্বাচিত দু'একটা গহনা গায়ে ফেলে সিনেমা যেতে এবং সুবেশধারী পুরুষের প্রশংসা-লোলুপ দৃষ্টি কুড়াতে বিলকিশের মন্দ লাগে না। নিজের যৌবনকে জাহির ও যৌবনের সুরভির সংকেতে অপরকে মোহাচ্ছন্ন করবার মধ্যে এমন একটা উষ্ণ পরিপূর্ণ মাদকতা আছে যা অন্য কোন জিনিসে পাওয়া ভার।

বিলকিশ বুঝতে পারে, মনে মনে সে আমোদ যতটা নয়, ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী চায়। অপরকে নিজের প্রভাবের মধ্যে এনে তার মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বড় ইচ্ছা বিলকিশের। গর্বিতা রাণীর দর্প তার প্রতিটি রক্তবিন্দুর সঙ্গে জড়িত। তাই আত্মীয়দের

মধ্যে যারা তার বিচারে মোটামুটি চলনসই তাদেরকে নিজের আয়ত্তে এনে কাবু করবার মহতী সঙ্কল্প সে করে। মধ্যস্থা হবে জয়নাব।

বিলকিশদের সম্বন্ধে তাদের খালাতো, মামাতো ও ফুপাতো ভাইদের মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ আছে। বিশেষ করে বিলকিশকে নিয়ে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই, বিলকিশ শুনেছে, তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। বর হিসেবে দু'একজন নেহাত মন্দও হবে না, অবশ্য বাইরে তা স্বীকার করতে বিলকিশ একেবারে রাজী নয়।

এ সব ভাইদের মধ্যে মোমিনভাই সব চেয়ে চতুর; কারণ, বুড়ো নানাকে দেখবার অছিলায় সে প্রায়ই বিলকিশদের এখানে আসে এবং সকলের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। আর ছেলেটাও বাস্তবিক ভালো। চটপটে, সব সময় হাসিখুশী ভাব, প্রত্যেকের কথাকেই ঠিক বলে মেনে নেয় এবং অপরের নির্বুদ্ধিতায় হয়ত মনে মনে হাসে

বিলকিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা তাদের মধ্যে খুব কম হলেও নীরব আচরণে বিলকিশের প্রতি নিজের মনোভাব জানাতে মোমিন বিস্মৃত হয় না। মনে মনে বিলকিশ আমোদ পায় এবং কিছুটা খুশীও হয়। একটু একটু করে এগিয়ে সে এমন স্তরে এসে পৌঁছয় যেখানে মোমিনের আগ্রহ তার কাছে মোটেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঠেকে না।

একদিন সন্ধ্যার দিকে মোমিন এসে দেখতে পায় দু'বোন খুব টেবিল-টেনিস খেলা জুড়ে দিয়েছে। মোমিনকে তারা কেউ দেখতে পায় নি। দু'এক মিনিট দু'বোনের মধ্যে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করে মোমিন দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, খেলাটা খুব উঁচুদরের নয়।

হঠাৎ মোমিনকে দেখতে পেয়ে দু' বোনই, এমনি যতই স্মার্ট হোক, একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাদেরকে আর বেশী বিব্রত হবার কোন সুযোগ না দিয়েই মোমিন জয়নাবকে লক্ষ্য করে ফট করে জিজ্ঞেস করে বসে ঃ নানা কোথায়?

নীচে বাগানে আছেন। জয়নাব বলে।

আর কোন কথা না বলে ত্বরিৎ পদে মোমিন সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। তার দিকে বিলকিশ কিছুটা রাগ ও কিছুটা হতাশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নীচ থেকে জয়নাব ও বিলকিশ দু'জনেরই ডাক পড়ে। যাবার সময় বিলকিশ একটু সেজেগুজে নেয় এবং চোখে একটু সুরমা দিতেও ভুলে না। জয়নাবও কিছুটা সাজে। দু'বোন একত্রে নানার কাছে আবির্ভূতা হোলে তিনি তখুনি আবার জয়নাবকে এই বলে উপরে ফেরৎ পাঠান: যাও ত মা তোমার মোমিন ভাইয়ের জন্য এক গ্লাস লেমোনেড নিয়ে এসো। মোমিন একটু মৃদু প্রতিবাদ করে। বিলকিশের দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে জয়নাব ফিরে যায়।

সেই সুযোগে ঝট করে বৃদ্ধ নানার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিলকিশের দিকে অনেকক্ষণ ধরে মোমিন গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। বিলকিশ চোখ ফিরিয়ে নেয় না; দৃষ্টির প্রতিযোগিতা চলে। এক দিকে নানার সঙ্গে খুচরো খুচরো কথা চলে, অন্য দিকে বিলকিশের দিকে দুই চোখ সম্পূর্ণ তুলে ধরে। তার সুরমা ভরা চোখে বিচিত্র ব্যঞ্জনা। বিলকিশের চোখের দৃষ্টিতে, মোমিনের মনে হয়, একাধারে গর্ব, তেজ, অনুরাগ এবং কিছুটা, হয়ত সামান্য কিছুটা, প্রেম। সে দৃষ্টির নিবিড়তায় মন কাঁপন ধরে যায় এবং তারই উন্মাদনায় সে বিলকিশকে সম্বোধন করতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় জয়নাব ফিরে আসে। এবং এক বৃহৎ সম্ভাবনা-পূর্ণ মুহূর্ত নিমিষে নষ্ট

নানা এবং জয়নাবের সঙ্গে মোমিন আবার গল্প জুড়ে দেয়; কিন্তু ফাঁক পেলেই বিলকিশকে পর্যবেক্ষণ করে নানা কৌশলে। তা লক্ষ্য করে জয়নাব মনে মনে হাসে।

এমন সময় অজান্তিতে সন্ধ্যা গোধূলিতে পরিণত হয় এবং পশ্চিমের আকাশে সে এক অবাক কাণ্ড! খালি বর্ণের আশ্চর্য সমারোহের জন্য নয়, সবুজ পাতায় হলদে ফুলের মত আকাশে দু' একটা তারা ফুটবার জন্যও নয়, মনের সুরভির ঐশ্বর্য-সম্ভারের স্পর্শেই হয়ত সেদিনের সমস্ত সত্ত্বা সুপ্তোত্থিত যৌবনের মত গান গেয়ে ওঠে। আর বিলকিশের দিকে চেয়ে মোমিন লক্ষ্য করে, দুনিয়ার সমস্ত রহস্য ও মাধুর্য তার সংযত অথচ গাঢ় কেশগুচ্ছে, বিস্ময়াহত চোখের তারার তাজ্জব কাঁপুনিতে, সূর্যাস্ত-চুম্বিত শান্তির অগাধ কোমলতায় সংকেতের ভারে মদির হয়ে আছে।

ঠিক সেই সময়ে একটা সদ্যরোপিত বেলফুলের চারা যেন অনেকটা ইচ্ছাকৃত নির্মমতার সঙ্গে মাড়িয়ে নিঃশব্দে বিলকিশ ফিরে যায় মোমিনের

বুক দুমড়ে। সেই মুহূর্তে, মোমিন বুঝতে পারে, বিলকিশকে সে কখনও পাবে না।

মগরেবের নামাজ পড়বার সময় হয়েছে বলে নানাও বাগান ছেড়ে ওঠেন এবং অনেকটা সম্মোহিতের মত, মনে পরস্পরবিরোধী চিন্তা নিয়ে মোমিনও বিদায় নেয়। ঘটনাবহুল না হলেও এ সন্ধ্যাটা তার জীবন থেকে সহজে অপসৃত হবে না।

সমস্ত রকম কৌশল প্রয়োগ করে নিজের পথ মোমিন প্রায় খোলাসা করে এনেছে এমন সময় বিলকিশের জন্য এক বিচিত্র পয়গাম এসে সমস্ত কিছুই ওলটপালট করে দিলো। পীর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিলকিশের পয়গাম যখন উত্থাপিত হোল তখন সকলে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিল। আশ্চর্য হবার হেতু ত ছিলো কম নয়। কারণ কনিষ্ঠ শাহজাদার সঙ্গে বিলকিশের বলতে গেলে কোন ব্যাপারেই মিল নেই। বিলকিশ কলেজ-পড়া, সিনেমায় যাওয়া, আধুনিক সভ্যতার আলোক-প্রাপ্তা মেয়ে, শাড়ী গহনা প্রভৃতি ও অর্থের কথা ভাবতেই সে অভ্যস্ত। আর শাহজাদা ইউনিভারসিটি শিক্ষার ধার-কাছ দিয়েও যান নি, আধ্যাত্মিক পুঁজি ছাড়া তার এমন কিছু সম্বল নেই, যা দিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানের ভরণপোষণ তিনি করতে পারেন। পরন্তু, তিনি ভিন্ন জগতের লোক; তার চিন্তার খোরাক অন্য রকম। এমতাবস্থায় কি করে বিলকিশের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা উঠতে পারে অনেকেই বুঝতে পারে না।

জয়নাব, তার নিঃসংশয় পীর-ভক্তি সত্ত্বেও, বোনকে এই বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে বিশেষ উৎসাহিত করে না। কারণ, যে ভাবে বিলকিশ বেড়ে উঠেছে এবং যে রকম জীবন-পদ্ধতিতে সে এখন অভ্যস্ত তাতে মনে হয় না শাহজাদার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পরে সে তার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

বিলকিশের নিজের মনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়। এ-পয়গামের [illegible] সম্বন্ধে তার মনে বেশ এক স্পষ্ট ধারণা হয়। শাহজাদা পীরসাহেবের দুই জীবিত পুত্রের মধ্যে একজন, অতএব তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সমান অংশীদার। পরন্তু, কলকাতায় না হোক অন্য কোন [illegible] যেখানে বর্তমান পীরসাহেবের মুরীদের সংখ্যা প্রচুর, তিনিও [illegible] পীরগিরি করতে পারেন এবং তার থেকেও

মাসিক আয় মন্দ হবে না। অতএব আর্থিক সচ্ছলতার দিক থেকে কোন ভাবনার কারণ নেই।

আর বিলাতী শিক্ষা শাহজাদা নাই বা পেলেন, তার বদলে আধ্যাত্মিক শক্তির তিনি অধিকারী। বিলাতী শিক্ষা যারা পায় নি, স্বামী তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল হয়, বিশেষ করে শিক্ষিতা স্ত্রী পেলে। অতএব শাহজাদাকে নিজের গোস্তাকীর জন্য বিলকিশ মনে মনে মাফ চায়, অনেকটা নিজের বশে রাখা যাবে। তারপর প্রতিপত্তির কথা। সেই বা শাহজাদার কম হবে কি। পার্থিব প্রতিপত্তি তেমন না থাকলেও, ঐশ্বরিক প্রতিপত্তি ত' থাকবেই। ঐশ্বরিক প্রতিপত্তির মূল্যও কম নয়। আর শাহজাদার জীবনের সমান অংশীদার হয়ে শ্রদ্ধা ও খাতির সেও ত' কম কুড়াবে না। কত প্রতিপত্তিশালী লোকের ঝলকদার গহনা-পরা স্ত্রী তাকে পা ছুঁয়ে কদমবুসী করবে। সে দিক থেকেও তাই আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

অসুবিধাও অবশ্যি আছে। জীবন ভরে হয়ত অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকতে হবে। সিনেমা দেখা হবে না, গহনা বাছা হবে না, বান্ধবীদের সঙ্গে কলহাস্য করা হবে না, বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত রকম পরিচয়ের হবে অবসান।

তবুও এই পয়গাম সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভালই বলে মানতে হবে। তাই সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে, বিলকিশ জানায় যে, এ-বিবাহে তার কোন অমত নেই।

নিজের মত জানাবার পর কয়েকদিন বিলকিশ নিজেকে অপর সকল থেকে খুব আলগা রাখে। এমন কি, জয়নাবের সঙ্গেও তেমন কথা বলে না। বিচিত্র ভাবনা তার মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। খানকা শরীফের যে আবহাওয়া বিলকিশের চিত্তকে আবিষ্ট রেখেছিলো নিজের কল্পনায় বিলকিশ তার মর্মোদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করে। ফেরেস্তাদের সঙ্গে হুজুর পাকের নিভৃতে কথা হয়, তেতলার পশ্চিম দিকের ছোট্ট কামরায় দুটা জীন আটক হয়ে আছে; মাজারপাকের গম্ভীর মহিমা চিত্তকে ভক্তি-রসে আপ্লুত করে। সব কিছু মিলে এমন একটা অদ্ভুত স্পর্শাতীত অনুভূতি সব সময় বিলকিশের মনে সঞ্চরমান যার সূক্ষ্ম প্রভাব সে কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারে না।

ধীরে-সুস্থে বিলকিশ বাইরে যাওয়া ছাড়ান দিতে এবং পর্দার জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করতে প্রয়াস্ করে। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগে।

বাইরের জগৎ হাতছানি দিয়ে ডাকে কত অসংখ্য প্রলোভন দেখিয়ে। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী বিলকিশ নয়। যখন খুব খারাপ লাগে তখন কোরান শরীফ নিয়ে সে পড়তে বসে। শব্দের গভীর ঝঙ্কার, ভাবের আকাশ ছোঁওয়া মহিমা, আবেগ-স্নাত বিশ্বাসের চোখে-আঁশু আনা প্রকাশ বিলকিশের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনির্বচনীয় শান্তি আনে।

ভাবতে অবাক লাগে তার কি করে এতদিন খেলো ও অর্থসভ্য আমোদে সে দিন অতিবাহিত করেছে! কি অবিশ্বাস্যভাবে সংকীর্ণ, হাস্যকরভাবে অসফল তার এতদিনকার জীবন ছিলো।

চটুল বিলাসিতায়, ক্ষিপ্র কৌতুকে, পার্থিব ভোগের ঝুটা মোহে আর সকলের মত সেও এতদিন নিজেকে ব্যর্থ জীবনের পঙ্কে নিমজ্জিত রেখেছিলো। আজ আসমান থেকে আলো এসেছে খোদার অভিলাষ নিয়ে যাকে মন ভরে হৃদয় ভরে গ্রহণ করতে পারলে নিজের অস্তিত্বকে বিলকিশ সার্থক মনে করতে পারে। নিজেকে এই মহৎ কর্তব্যের জন্য তৈরী করতে বিলকিশ তার যথাসাধ্য করবে।

একদিন বিকেলে ফুরফুরে হাওয়া দেয় এবং দুনিয়ার শোভাও বিলকিশের চোখে খুলে যায় আশ্চর্য রকম। বারান্দায় বেরিয়ে আসবার প্রলোভন থেকে বিলকিশ নিজের মনকে আর মুক্ত রাখতে পারে না। বাইরের জগৎ বোধ হয় শেষবারের মত তাকে ডাক দিয়েছে।

রওশনীতে বাইরে সব কিছু ছেয়ে গেছে। মন বল্গাহারা করে গাছের নব-পত্রের অবিশ্বাস্য শ্যামলিমা। আসমানের ঔদার্য আজ নূতন করে লক্ষ্য করে বিলকিশ; দরিয়াপারের সংকেত সেখানে। কি যে মন চায়, হৃদয়ে কিসের আকুতি, ভিতরে তার গুমরে মরছে কি রুদ্ধ বাসনা, বিলকিশ বুঝতে পারছে না। তবে কি ঝক্‌ঝক্‌ করছে বাইরের জগৎটা; কি বিচিত্রভাবে সুন্দর!

রাস্তার দিকে আংগিনায় এসে থামে হেলান দিয়ে কৌতুকময়ী প্রেমিকার মত বিলকিশ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। দ্রুত, আচমকা, চটুল ভংগীতে বাতাস বয়ে যাচ্ছে মনে কত এলোমেলো ভাবনা জাগিয়ে। বাইরের পরিপূর্ণ নিটোল উষ্ণতা, অখণ্ড তৃপ্তি তার চোখের তারাকে মদালস এক ভঙ্গী দিয়েছে।

এমন সময় রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে মোমিনকে যেতে দেখে বিলকিশ আর তার সমস্ত আত্মা শিউরে ওঠে। এখনও মোমিন এদিকে চায় নি এবং বিলকিশকে দেখে নি; এখনও দ্রুত কামরার

ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কি যেন হয়েছে বিলকিশের, পা-কে উঠালেও উঠতে চায় না। থামের সংগে তার হাতটা যেন জড়িয়ে গেছে। নড়বার উপায় নেই। খালি বিহ্বল দৃষ্টিতে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এ-দিকে মোমিনের চোখ পড়ে এবং বিলকিশকে দাঁড়ানো লক্ষ্য করে মুখে তার ভারী মিষ্টি হাসি খেলে যায়। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে তার সারা মুখে গভীর হতাশা ও বিষাদের এক অভিব্যক্তি ধরা পড়ে। তার হাসি যেমন ছিলো আকর্ষণীয়, বিষাদের অভিব্যক্তিটাও ছিলো ঠিক তেমনি চিত্ত-দহনকারী। মোমিনের দিকে বিলকিশ আর চাইতে পারে না এবং ঘরের ভিতর চলে আসে।

নিজের কামরায় এসে প্রথম প্রথম মোমিনের প্রতি বড় মায়া হয় বিলকিশের। বেচারা মনে মনে তার জন্য দগ্ধে মরছে; মুখটা শুকিয়ে কি হয়ে গেছে তার! আশা ছিলো মোমিনের, বিলকিশকে শেষ পর্যন্ত হয়ত সে জয় না করলেও মিনতি জানিয়ে পাবে। অন্য একটা পয়গাম এসে সে-আশা তার কি ভাবে ধূলিসাৎ করে দিলো! বেচারার জন্য আফশোস হওয়ারই কথা।

মন থেকে এ-সব পার্থিব চিন্তা দূর করতে হবে; হৃদয়ে যেন কোন রকম অপবিত্রতা প্রবেশপথ না পায়। বিলকিশ ত' আর সকলের মত নয় যে একটা অজানা লোকের সামান্য দুঃখেই অভিভূত হয়ে পড়ে সে নিজের উচ্চতর কর্তব্য অবহেলা করবে। "খোদা, মনে আমার জোর দাও। আলোকপাত কর আমার কামনা-কাতর হৃদয়ে, হে রহমানুর রহিম! পরপুরুষের চিন্তা থেকে আমায় বাঁচাও।"

কোরা'ন শরীফ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়তে বসে বিলকিশ। চোখে তার আঁশুর দরিয়া বয়। মন থেকে তার সমস্ত মলিনতা ঘুচে যায়। হৃদয় ছেয়ে যায় আলোর অরুণাভ দীপ্তিতে। সুন্দর, তার চোখের সামনে সমস্ত কিছু আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে।

কিন্তু সব-কিছু ছাড়িয়ে এক বেদনা-হত বদন তার দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যে বিলকিশ তার কুমারী হৃদয়ে অনুভব করে অশেষ করুণা, অগাধ মমতা যা বাইরের রওশনীর মতই সুন্দর ও নির্মল। বিহ্বলিত জানালার গরাদ জড়িয়ে তার কোলে মুখ গুঁজে বিলকিশ সহসা উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে থাকে, সারা দুনিয়ার সমস্ত রুদ্ধ ব্যথা সে কান্নায় যেন গুমরে গুমরে উঠছে।

—কি হয়েছে বোন, বল! আশ্চর্য গভীর স্বরে জয়নাব জিজ্ঞেস করে।

আর কিছুক্ষণ কেঁদে তারপর ভাঙা গলায় বিলকিশ বলে : তোমাকে ত' কোন কথা এ-পর্যন্ত আমি লুকোই নি, আপা।

—তাইত, জিজ্ঞেস করছি। দুষ্টু, কেন তুই ছোট্ট খুকীর মত কাঁদতে বসলি হঠাৎ। জয়নাবের কণ্ঠ স্নেহ-নিবিড়।

—এখন আমি বিয়ে করবো না, আপা; ভুলে মত দিয়েছিলাম। বিলকিশ তার ক্ষোভের কারণ জানায়।

—কিন্তু এখন তাদের কি বলা যায়, এতদিনইবা তুই চুপ করে ছিলি কেন? অনেকটা বিমূঢ় ভাব জয়নাবের স্বরে।

—এতদিন নিজেকে যে বুঝতে পারিনি, আপা! জানি কথা ভাঙবার জন্য আমি গোনাহগার হবো, তবে এও জানি খোদা আমায় সেজন্য মাফ করে দিবেন, তিনিই আমার চোখ খুলিয়েছেন আজকে প্রথম। বিলকিশ এমন ভাবে কথাগুলো বলে যেন তন্দ্রা থেকে সবে সে এক আলোর জগতে জেগে উঠেছে যেখানে তার হৃদয়ের নিবিড় চাওয়া আনন্দ-স্নাত সমস্ত কিছুর সঙ্গে গভীর এক মিতালি পাতিয়েছে।

বিলকিশের মুখ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাতে ছোট্ট একটা চুমো খেয়ে জয়নাব বলে : দেখ, বাইরের দিকে দেখ, মদ খেয়ে পলাশ-ফুল যেন বুঁদ হয়ে আছে, আর সারা শহরটা দেখতে হয়েছে যেন নওশার মত, তুই কি অন্য কারুর বেগম বনবি?

সহাস্যমুখে বিলকিশ শুধু বলে : তাকেই জিজ্ঞেস করো না কেন, বেগম আনতে যার এত সখ!

বকশিস

এমন মুনিব পাওয়া বস্তুতই ভাগ্যের কথা। প্রায় সাত বছর ধরে শফি চাকরের কাজ করেছে। এ সময়ের মধ্যে ছয় সাত জায়গায় সে কাজ করেছে, মুনিবও দেখেছে নানা রকমের, কিন্তু এমন মুনিব ভাগ্যে তার আর কখনও জুটে নেই। মাইনে আট টাকা। বকশিসও পাওয়া যায় যখন তখন। সময় সময় পুরনো পাঞ্জাবি ধুতিও পাওয়া যায়। সব মিলে শফি মিঞা বলতে গেলে রাজার সুখে আছে।

মুনিবের নাম মকবুল আহমদ। এখনও বিবাহ করে নাই, মাইনে শ' দুই টাকা পায়। দু' হাতে টাকা খরচ করে। কলকাতায় টাকা খরচা করে সুখ আছে। শফি এটা লক্ষ্য করেছে, মুনিবরা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাদের দিলটা থাকে বেশ দরাজ। বিবাহ হলেই প্রধানত স্ত্রীদের উস্কানিতে তারা কেমন যেন বদলে যায়, তখন একটা আধলাও এদিক ওদিক হবার যো থাকে না। মকবুলেরও, শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই বিবাহ হবে। তখন শফিকে বাধ্য হয়েই অন্য ঘর দেখতে হবে।

যার সঙ্গে মকবুলের বিয়ে হবার কথা হচ্ছে তাকে সে আগে থেকেই চেনে। মকবুলের মা-বাবা অবশ্য এ বিবাহে তেমন রাজী নন—তাঁদের ইচ্ছে ছিলো কোন এক ধনিকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে। তবে ছেলে একেবারে বেঁকে বসাতে তাঁদের সে ইচ্ছা আর কাজে পরিণত হতে পারলো না। ছেলের মনের ইচ্ছাকে অত সহজে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষ করে যখন তার মূল্য প্রতি মাসে নগদ দু'শ টাকা দাঁড়ায়। তাই মকবুল যাকে চায় তারই সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

বাবুদের এই একটা বিলাস—পছন্দ করে বিয়ে করা। বাবুদের ভাষায় একে বলে প্রেম। যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম না হোল তাকে বিয়ে করা বাবুরা এক গর্হিত পাপ মনে করেন। কথাটা ভেবে হাসিতে ঠোঁট বেঁকে যায় শফির। তাহলে বলতে হয় ফুলজানকে শফি ভালোবাসে! স্বাস্থ্য আছে ফুলজানের, তার মুখের শ্রী অনেক ভদ্র ঘরের বউকে লজ্জা দেবে। লাস্যে এবং চটুলতায়, দেহ-সৌষ্ঠব এবং প্রাণশক্তিতে ফুলজান কারুর থেকে কম যায় না। আর একটু ভালো ঘরে জন্মালে ও কিছুটা লেখাপড়া শিখলে ফুলজানকেই হয়ত মকবুল পছন্দ করে ফেলতো। তখন ফুলজানের কৃপণতার জন্যই শফিকে এখানকার চাকরিটা ছাড়তে হোত। এ সম্ভাবনা মনে হওয়াতে শফি গাল ফুলিয়ে প্রকাণ্ড হাসি হাসে।

এখন অবশ্য শফির কোন ভাবনা নেই। যা ইচ্ছে খুশী তাই করে, মকবুল কিছুই বলে না। মকবুলের 'গডরেজ' (নং ১) সাবান দিয়ে মুখ ধোয়, জবাকুসুম মাথায় দেয়, হেজ্‌লীন স্নো মুখে মাখে, ৯৯৯নং 'স্টেট এক্সপ্রেস' টিন থেকে যখন যে কটা ইচ্ছে সিগ্রেট তুলে নেয়।

হয়ত কোন দিন মকবুল বলে: টিনে সিগ্রেট একটু কম ম'ন হচ্ছে শফি।

শফি মধুর হেসে বলে: সিগ্রেট আর কে নেবে, আমরা গরীব লোক বাবু, বিড়ি ফুঁকি।

লজ্জিত হয়ে মকবুল তাড়াতাড়ি বলে: না, আমি কি আর তাই বলছিলাম রে।

শফি সন্তুষ্ট মনে নিজের কাজে চলে যায়।

চা খেয়ে মকবুল কাগজ পড়ছে। এমন সময় বাজারের টাকার জন্য শফি এসে হাজির। টাকা চাইবার আগে অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, বাবু, যুদ্ধের খবর কি?

মকবুল যতই ভালো ছেলে হোক্, যুদ্ধ নিয়ে সে শফির সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। একটু বিরক্তির স্বরে বলে: খবর আর কি, এই জার্মানরা জিতছে।

হাওয়া কোন দিকে বইছে তা শফি টের পায়। তাই যুদ্ধের প্রসঙ্গ আর না তুলে সোজা কাজের কথাটি পেড়ে বসে: বাজারের টাকা, বাবু।

চেয়ার থেকে উঠে নিজের কামরায় গিয়ে আলমারী খুলে একটা টাকা বের করে মকবুল শফির হাতে দেয়। শফি জিজ্ঞেস করেঃ বাজার থেকে কি আনবো, বাবু ?

— যা রোজ আনিস তাই। নির্লিপ্ত স্বরে মকবুল বলে।

—-আজকাল বাজারে টোমেটো উঠেছে, আনবো ?

—-কি দিয়ে রাঁধবি টোমেটো—আল্গা আগ্রহের স্বরে মকবুল জিজ্ঞেস করে।

—কেন মাংস দিয়ে। শফি চট করে জবাব দেয়।

—তা আন্‌গে যা। মকবুল আবার খবরের কাগজটা হাতে তুলে নেয়।

ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যায় শফি। তার ভারী মায়া হয় মকবুলের প্রতি। আহা বেচারী এ রকম লোক। বিয়ে না করলে সকলে তাকে একেবারে চুষে খাবে। মকবুলের মুখ দেখলেই কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়। মায়ার আধিক্যে শফির মন বাজার-খরচা থেকে আজকে দু'আনার বেশী লাভ করতে রাজী হয় না। বিবেক বলেও ত মানুষের একটা জিনিস আছে।

মকবুল অফিসে যাওয়ার পর একটু বিশেষ সাজ করে শফি ঘরদোর বন্ধ করে ফুলজানদের ওখানে যায়। ফুলজান তখন কাজটাজ সেরে নিজের টিনের কামরায় এসে বসেছে। শফিকে দেখে এক গাল হেসে বলেঃ তোকে যে আজকে দেখতে রাজপুত্তুর হয়েছে। কাকে ঘর থেকে বের করতে আজকে বেরিয়েছিস তুই ?

—তোরে। শফি বলে।

বেশী ঢঙ করিসনে। তোর জন্য আমি ঘর থেকে বেরুবো এমন মুরোদ তোর নেই।

কেন, চেহারাটা আমার খারাপ হোল নাকি ? শফির গলার স্বরটা একটু চড়ে যায়।

ফুলজান মিটিমিটি হাসে।

ভাঙা খাটের এক কোণে বসতে গিয়ে ফুলজানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় আর কি।

—-এই দুপুর বেলা তোকে ফষ্টি করতে কে বলেছে। ফুলজান তেতো কন্ঠে বলে।

—নে আমার কাছে আর সতীগিরি ফল্গাস নে। বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে শফি বলে।

—অমন কথা যদি আবার বলিস ত তোরে ঝাঁটা মেরে বের করে দিব। ফুলজান রেগে গেছে। ফুলজানের রাগকে শফি রীতিমতো ভয় করে চলে। ফুলজানের রাগ যে কি জিনিস তা এর আগে দু'একবার সে টের পেয়েছে। তাই ফুলজানকে খুশী করবার জন্য বলেঃ আমি এলাম কাজ ছেড়ে তোর সঙ্গে একটু গল্প করবো বলে, আর তুই অমনি চটে গেলি।

—তা চটবার কথা বললে চটবো না? ফুলজান অনেকটা নম্র সুরে বলে।

—চটলে কিন্তু মাইরি বলছি ভাই, তোকে ভারী সুন্দর দেখায়। ফুলজানকে খুশী করতে শফি বদ্ধপরিকর। মনে মনে খুশী হলেও বাইরে গোমড়া ভাবটা বজায় রেখে ফুলজান বলেঃ রঙ্গ দেখে বাঁচিনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙে ফুলজানই: আমায় ত তুই বিয়ে করবি ঠিক, মিনসে আমাকে তালাক দিতে রাজী হয়েছে।

—এখন বিয়ে করবো তোরে কি করে, টাকা পয়সা একটু জমাতে দে। শফি ভাসা ভাসা কথা বলে।

—টাকা জমালে ত বিয়ে করবি ঠিক, খোদার কসম খা। ফুলজানের স্বরে অনুনয়।

—তা করবো রে বিবি সাহেব, করবো।

শফির প্রতিশ্রুতিতে ফুলজানের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শফি ফিরবার উপক্রম করছিলো, ফুলজান বলেঃ ওঃ ভুলেই গিছলাম, একটা কথা আছে তোর লগে।

—কি কথা রে? শফি জিজ্ঞেস করে।

আমায় পরশু দিনের মধ্যে একটা টাকা জোগাড় করে দিতে লাগবো, ভারী ঠেকাতে পড়েছি।

—এখন এই মাসের শেষে আমি টাকা পাব কই? অপ্রস্তুত স্বরে শফি কথাগুলো বলে।

—তার আমি কি জানি, কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।

—এই ত আর একটা মুস্কিলে ফেললি তুই। শফি বিব্রত বোধ করে।

—যে মরদ একটা টাকা জোগাড় করতে পারে না তার আবার পীরিত করা কেন? আবার রেগে যায় ফুলজান।

এবার বুক ফুলিয়ে চড়া স্বরে শফি বলে: কে তোরে বলেছে আমি টাকা জোগাড় করতে পারবো না, মরদের বাচ্চা না আমি।

—সাবাস্ মরদ এই ত চাই। কৌতুকে হঠাৎ উছলে ওঠে ফুলজান।

—আমায় তুই কি ভেবেছিস, এ মিঞা ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে। নওয়াবী চালে শফি বলে।

ফুলজান কিছুক্ষণ নীরব থাকে, তারপর অদ্ভুত স্বরে বলে: যদি পরশু দিন বিকেলের মধ্যে আমায় টাকা এনে দিস তবে বুঝবো তুই আমায় সত্যিই নিকাহ্ করবি, আর যদি টাকা না আনতে পারিস তবে তুইও আমার এখানে আর আসিস না।

—একটা কেন পরশু দিন তোরে দু'টো টাকা দিয়ে যাব দেখিস—অসতর্ক মুহূর্তে শফি প্রতিজ্ঞাই করে বসে।

ফুলজান উৎফুল্ল হয়ে বলে: সাধে কি তোরে দেখে আমি মজেছিলাম।

আমিরী কায়দায় পা ফেলে শফি ফুলজানের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে।

বাসায় ফিরে কিন্তু শফিকে টাকা জোগাড় করবার ভাবনা পেয়ে বসে। মাঝখানে আর মাত্র একটি দিন। এর মধ্যে কোত্থেকে সে গোটা একটা টাকা জোগাড় করবে? মাসের একদম শেষের দিকে তাকে ধার দিতেই যাবে বা কে। যে একটা বন্ধু আপদে বিপদে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো, তার সঙ্গে শফির ফুলজানকে নিয়ে চির-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। জ্ঞানী লোকেরা কথাটা ঠিকই বলেছেন, মেয়েমানুষরাই যত নষ্টের গোড়া। ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াও হোত না, এবং বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া না হলে একটা টাকা ধারও সে পেতো। অবশ্য ভাবনার তীব্রতায় এ কথাটা শফি স্রেফ ভুলে যায় যে, ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে তাকে একটা টাকার জন্য এত ভাবতেও হোত না।

আসল কথা হোল কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায়। বাবুর অজান্তে তার ড্রয়ার থেকে একটা টাকা তুলে নেবে নাকি? না, তা হয় না। অমন করে চুরি করা কিছুতেই ঠিক হবে না। আর বাবু

লোকটা ভারী ভালো। এমন ভাবে তার ক্ষতি করতে থাকলে ফলটা খারাপ না হয়ে যায় না। অতটা অন্যায় খোদা সইবেন না। বাজারের টাকা থেকে রোজ আনা তিনেক করে রাখলেও এক টাকা সঞ্চয় করতে প্রায় ছয়দিন লেগে যায়। আর এদিকে ফুলজান গোঁ ধরে বসেছে; পরশুদিন টাকা না পেলে তার চলবেই না। অসম্ভব ভাবে জেদী মেয়ে ফুলজান। যখন যা মনে হয় তাই করবে, অন্য কারও কথাতে কানও দেবে না। ফুলজানের প্রতি তার নিজেরও কেমন একটা দুর্বলতা হয়ে গেছে। একটা টাকা কেন, একশো টাকা দিলেও ফুলজানের ঠিক দাম দেওয়া হয় না।

টাকার চিন্তায় শফির কাজেও দু একটা ভুল হয়ে যায়। মকবুল বলে ঃ তোর আজকে হয়েছে কি রে, শফি? কাজে একদম মন নেই?

—না, কি আর হবে বাবু।

—কিছু যদি না হয়ে থাকে তবে পানি আনতে বললে খালি গ্লাস আনিস কেন? মকবুল জানতে চায়। শফি খালি বোকার মত হাসে।

মকবুল আবার বলে ঃ এইটুকু ত তোর কাজ, তাতেও ঢিলা দিতে লেগেছিস।

লজ্জিত বদনে শফি তার মনিবের দিকে চেয়ে থাকে।

মকবুল বলে ঃ যা, আর বোকার মত অমন করে দাঁড়িয়ে থাকিস না, এক গ্লাশ ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়। শফি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

একদিন পরে। আজকে বিকেলের মধ্যেই ফুলজানকে টাকা দিয়ে আসতে হবে—এই চিন্তা নিয়েই শফির ভোরে ঘুম ভাঙে। বিমষ মনে বসে উনোন ধরায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে চিন্তা করে কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায়। বাবুর কাছ থেকে চাইবে নাকি? মাসের শেষে বাবু বোধ হয় টাকা দিতে পারবে না। এ এক আচ্ছা ল্যাঠায় পড়া গেলো, যাহোক! চা দেবার সময় বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, মকবুলের মুখে বেশ হাসি খুশী ভাব। বাবুর মেজাজ ভালই আছে। খোদা সত্যিই মেহেরবান।

মকবুল বলে ঃ একটা কাজ করতে পারবি রে, শফি?

—কি কাজ বাবু? শফি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

—দশ নম্বরের বড় বিবিসাহেবকে চিনিস ত?

—তা আর চিনি না বাবু। সেই যে তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। বিবিসাহেব লোক খুব ভালো বাবু, আমাকে প্রায়ই বকশিস্ দেন।

মকবুল হেসে বলে : সেই বিবিসাহেবের কাছেই তোকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে, পারবি ত ?

—খুব পারবো। শফি মকবুলকে আশ্বাস দেয়।

—যদি চিঠিটা ঠিক করে পেঁীছিয়ে দিতে পারিস্ ত তোরে বকশিস্ দেবো। কিন্তু দেখিস আর যেন কেউ টের না পায়।

—তা আপনি কিছুটি ভেবেন না বাবু, আমি কি আর অতই কাঁচা লোক। বলে মনের আনন্দে শফি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলো।

তাকে ডেকে মকবুল বলে : কোথায় যাচ্ছিস রে শফি ?

— যাই বাবু রান্না চড়াতে দশটায় আবার আপনার অফিস।

—আরে বস না, তোর ফুলজানদের ওখানে আজকাল আর তুই যাস্ না ?

—যাই বাবু, হাসিতে শফি প্রায় গলে পড়ে, আজকে সন্ধ্যার দিকে তার ওখানে যেতে বলেছে।

---তোদের নিকাহ্ হবে কবে ? বেশ আগ্রহের স্বরে মকবুল জিজ্ঞেস করে।

—টাকা কিছু আগে জমিয়ে নি, বাবু।

হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে নিজের কামরার দিকে যেতে যেতে মকবুল বলে : যা এবার রান্না করগে যা, চিঠিটা ঠিক জায়গায় পেঁীছিয়ে দিতে ভুল হয় না যেন।

মকবুল অফিসে চলে গেলে নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে শফি বাবুর কামরা গুছাতে আসে।

প্রথমেই তার চোখে পড়ে ৯৯৯নং 'স্টেট এক্সপ্রেস'-এর টিনটা। বাবু তাড়াহুড়াতে দেরাজে বন্ধ করে রাখতে ভুলে গেছেন। টিনটা খোলা পড়ে আছে। বন্ধ করতে গিয়ে সিগ্রেট এর গন্ধে শফির নাক আমোদিত এবং মন প্রলুব্ধ হয়। তবে আজকের দিনটা কিছু চুরি না করাই ভালো। বাবু বলে গেছেন বকশিস্ দেবেন। বাবু লোক খুব ভাল। কয়েকটা সিগ্রেট শফি ন. চুরি করলই বা। বাবুকে এমন ভাবে সর্বস্বান্ত করা তার

কিছুতেই উচিত হবে না। কলেজা আছে তার বাবুর, নইলে কথায় কথায় কেউ এমন বকশিস্ দেয়।

শফি সব কিছু গুছিয়ে একবার কামরাটার দিকে চেয়ে দেখে। মকবুলের রুচি যে অনিন্দনীয় তা তার কামরা দেখলেই বোঝা যায়। একটা কামরা সাজাতে যা-কিছু দরকার তার প্রত্যেকটি মকবুল এনে জড়ো করেছে। তার বিছানাটা দুগ্ধ-ফেনিল শুভ্র। দেখলেই শরীরটা আলস্যে মদির হয়ে আসে।

বিছানায় বেশ আরাম করে শফি গড়িয়ে পড়ে। তার শরীরটা এখন ভারী নরম মনে হচ্ছে। একেই বলে আরাম। ফ্যানটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়। না থাক্। অত বাবুগিরি আবার ভালো না, এমনিই হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

হঠাৎ শফির মনে পড়েঃ তার যদি এ রকম সচ্ছলতা থাকতো! খোদা যে কেন একটা লোককে ধনী এবং আর একটা লোককে গরীব করেন তার রহস্য শফি শত চেষ্টা করেও ভেদ করতে পারে না। শফি যদি কোন সচ্ছল সংসারে জন্মাতো, তবে সে হয়ত মকবুলের চেয়েও বেশী উন্নতি করতে পারতো। শফির আত্মবিশ্বাস দুর্মদ। আচ্ছা, কল্পনা করা যাক, এখন সে-ই এ ঘরের মালিক। এ কামরাটা তার নিজের। ওই যে দক্ষিণ দিকের জানালা ঘেঁষে হাতল-দেওয়া চেয়ারটা তাতে, ধরা যাক, ফুলজান বসে আছে। আর শফি বিছানায় গা এলিয়ে অলস চিন্তা করছে। ফুলজান হয়ত তার সন্তানের জন্য 'সোয়েটার' বুনছে। আড়চোখে কমরত স্ত্রীর দিকে শফি চেয়ে দেখছে এবং নিজের ভাগ্যকে মনে মনে প্রশংসা করছে। বস্তুত, একটু মাজা ঘসা করলে ফুলজানকে বেগমদের মতই দেখাবে। দুত্তোর ছাই, কেবল কল্পনা করে আর কতটা সুখ পাওয়া যায়। বিরক্ত মনে শফি বিছানা থেকে উঠে বিছানাটা ঝেড়ে দেয়। সিগ্রেটের টিনটার দিকে আবার তার লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। দু'তিনটা সিগ্রেট বের করে নিলে মকবুলের কিই–বা আর ক্ষতি হবে! টেরই পাবে না সে হয়ত। টিন খুলে কয়েকটা সিগ্রেট শফি বের করতে যাবে এমন সময় বাইরে কার পদধ্বনি শুনে ধড়ফড়িয়ে সে টিনটা বন্ধ করে দেয়। বাবু কোনো কাজে হঠাৎ ফিরে এলেন নাকি? বাইরে এসে শফি দেখে, মর এ যে ফুলজান!

—তুই আবার এখন এখানে মরতে এলি কেন? শফির কণ্ঠ একটু কর্কশ।

—টাকা জোগাড় করেছিস ? ফুলজান সোজা জিজ্ঞেস করে বসে।

—বিকেলে টাকা পাবি, এখন তুই যা।

—যাবই ত রে। এখানে আমি ঘর পাতবার লগে এসেছি নাকি—টাকাটা দে।

—বাবু অফিস থেকে ফিরলে টাকা দিবে, তখন তোরে দিয়ে আসবো গিয়ে।

—ঠিক দিস যেন, নইলে তোর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। যাবার সময় ফুলজান শাসিয়ে যায়।

দরজার কাছে এসে শফি বলে ঃ এমন করে না বলে কয়ে আর আসিস না, বাবু যদি বাড়ী থাকতো।

রাস্তার দিকে এক পা বাড়িয়ে ফুলজান বলে ঃ বাবুরে তুই এত ডরাস কেন, আমায় দেখে বাবুর পছন্দও ত হয়ে যেতে পারে। আমার কদর তুই বুঝলি না এখনও।

কিছুক্ষণ শফি বোকার মত স্তব্ধ বদনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে তালা বন্ধ করে দশ নম্বরের বড় বিবির কাছে চিঠিটা পৌঁছিয়ে দিতে যায়।

ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শফি ভাবে ঃ যাক্ এবার বকশিস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। আচ্ছা বাবু কত বকশিস্ দিবেন ? এক টাকার কম ত নয়, টাকা দুইও দিতে পারেন। বাবুর দিলটা সত্যিই খুব বড়। আচ্ছা, টাকা দুই বকশিস পেলে ফুলজানকে খুশী করবার জন্য তাকে একটা সিকি বেশীই দেওয়া যাবে। বাকী থাকে বারো আনা। তা থেকে একটা ভাল দেখে আয়না কিনতে হবে। তার আয়নাটা অনেক দিন হোল ভেঙে গেছে, চেহারা দেখার অসুবিধা হয় বড়। আয়না কিনে যা বাকী থাকবে তার থেকে সে 'তাজমহল টকি হাউস'এ 'দিলকি ডাকু' ছবি দেখতে যাবে। ছবিটা নাকি খুব ভালো হয়েছে। ভাবতে ভাবতে শফির গলাটা শুকিয়ে যায়। বিড়ি খেতে এখন ভালো লাগছে না। বাবুর টিন থেকে কয়েকটা সিগ্রেট তুলে আনলে কেমন হয় ? শেষ পর্যন্ত শফি লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ৯৯৯ নং স্টেট এক্সপ্রেস্ টিন থেকে তিনটা সিগ্রেট তুলে আনে।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বাবুর নাস্তা তৈরী করতে বসে শফি। আজকে নাস্তাটা খুব ভালো করা চাই। নাস্তা খেয়ে বাবুর মন যাতে আরও

খুশী হয়। পারোটা শফি চিরকালই ভালো তৈরী করতে পারে, আজকে আবার সে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। পরোটা তৈরী করা হয়ে গেলে শফি উনোনে মাংস চড়িয়ে দেয়। তারপর প্লেটগুলো মাজতে বসে। যতক্ষণ না সেগুলো ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠলো ততক্ষণ অপরিসীম উৎসাহের সঙ্গে সে মেজেই গেলো।

অতর্কিতে এক সময় তার মনে পড়েঃ আচ্ছা, বাবু যদি আজকে আমাকে বকশিস না দেন। পরক্ষণেই শফি তার মন থেকে সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। এ সব ছাই পাঁশ সে কি ভাবছে। তার এত পরিশ্রম কিছুতেই ব্যর্থ যেতে পারে না।

তবে সিগ্রেট তিনটা এমন করে টিন থেকে না তুলে নিলেই হোত। দু'টো সিগ্রেট এখনও আছে তার কাছে, টিনে রেখে আসাই উচিত। সিগ্রেট দুটো হাতে নিয়ে শফি উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বাইরে কড়া নাড়বার শব্দ। সিগ্রেট দু'টো তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বাইরে এসে সে দরজা খুলে দেয়। মকবুল অফিস থেকে ফিরেছে। মুখটা তার খুব বেশী প্রফুল্ল মনে হচ্ছে না, হয়ত অফিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছে বলেই এমন লাগছে। কিছু না বলে মকবুল নিজের কামরার অভিমুখে পা বাড়াল।

বাবুর্চিখানায় ফিরে গিয়ে শফি ট্রে-তে মকবুলের নাস্তা ভাল করে সাজায়। রান্নাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে মাংসের 'কারী' থেকে, শফির নিজেরই খিদে পেয়ে যায়। হাসিমুখে শফি 'ট্রে' নিয়ে মকবুলের কামরায় যায়।

হাত মুখ ধুয়ে গম্ভীর মকবুল বসে আছে হাতল-দেওয়া চেয়ারে। টেবিলে যখন শফি ট্রে-টা রাখে মকবুল তখন নিজের নিস্তব্ধতা ভাঙেঃ চিঠিটা দিয়েছিস?

একগাল হেসে শফি বলেঃ হ্যাঁ, বাবু।

—কাকে দিয়েছিস?

—কেন সেজ বিবিকে।

—চিঠিটা তোকে কাকে আমি দিতে বলেছিলাম?

হঠাৎ শফির প্রচণ্ড আকস্মিকতার সঙ্গে মনে পড়ে বাবু চিঠিটা সেজ বিবিকে নয়, বড় বিবিকে দিতে বলেছিলেন। স্তম্ভিত বদনে শফি দাঁড়িয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে মকবুল বলে : তোকে কাল থেকে আমার আর চাই না, অন্য জায়গায় চাকরি খোঁজ।

এতটা বিমূঢ় হয়েছে শফি যে একটা কথাও সে মুখে আনতে পারে না। আর শফি জানে, মকবুলের কথার প্রতিবাদ করাও নিষ্ফল।

বিমর্ষ বদনে শফি রান্নাঘরে ফিরে যায়। ফুলজানের কথা এখন তার মনে পড়ছে না। বকশিসের কথাও নয়। এমন আরামের চাকরিটা তার সামান্য ভুলের জন্য খসলো, এ দুঃখে তার প্রায় কান্না পায়। এখন কি করবে সে, কোথায় যাবে, ফুলজানকেই বা মুখ দেখাবে কেমন করে? চারদিকে শফি অন্ধকার দেখে। রান্নাঘরের যেখানে সে দু'টো সিগ্রেট লুকিয়ে রেখেছিলো সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ে। সিগ্রেট দু'টার ওপর তার বিজাতীয় বিদ্বেষ হয়। এই সামান্য লোভ সামলাতে পারলো না বলেই ত তার এত বড় ভাগ্যবিপর্যয়!

অসহায় ক্রোধে সিগ্রেট দু'টো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে পায়ের তলায় দাবিয়ে সে তার উপর বসে বসে চক্কোর খেতে থাকে। তেমন অবস্থায় ফুলজান যদি তাকে দেখতো তবে সে ভাবতো একটাকা বকশিস পেয়ে শফি মিঞা মনের সুখে নাচতে বসেছে।

পিথাগোরাস

বেহেস্তের খাস দরবার বসলো। সভাপতি আলেকজাণ্ডার। কোন রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তা দৃঢ়হস্তে দমন করতে বদ্ধপরিকর। সক্রেটিস একদম পেছনের সারিতে, তাঁর স্ত্রী য্যানথিপ্‌কে 'লিম্বো' থেকে বেহেস্তে আনা হবে কি না আজকের সভায়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তাও আলোচিত হবে। প্রথম সারিতে দান্তে, ডিভাইন 'কমেডি'র কথা ভুলে বিয়াত্রিচের চিন্তায় নিমগ্ন; নিউটন, ঈভের আপেল খাওয়ার সঙ্গে 'পপ মিউজিক'-এর কি সম্পর্ক সে-ব্যাপারে সভার পরে বাক্‌ এর সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলে ভাবছেন; প্লেটো, বেহেস্তী অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 'আইডিয়াল রিপাব্লিক'এ কি কি সংশোধন করা দরকার মনে মনে তার এক ফিরিস্তি তৈরী করছেন। প্লেটোর ঠিক পেছনে এ্যারিস্টটল, গুরুকে সম্মান করবার অভ্যাস বেহেস্তেও এসে যায় নি। পেছন থেকে প্লেটোর হাত মৃদুভাবে নাড়া দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ্যারিস্টটল খুব ধীরে সংযত স্বরে বলেন: আলেকজাণ্ডারটা বড় বেয়াদপ স্যার, আপনি থাকতে কি করে সভাপতি হতে রাজী হোল। -ঠিক আছে। যার যা কাজ। মার্কনী 'টেপ' করা আরম্ভ করলে তখন সামলাবে কে। আমিত আবার রয়ে সয়ে কথা বলতে পারি না। হোমারকেও সভাপতি করা মুস্কিল—বেচারা এখনও অন্ধ রয়ে গেছেন। এ্যারিস্টটল আবার আক্ষেপ করে বলেন: এটা সত্যি খুবই দুঃখের ব্যাপার, বেচারা হোমারের দৃষ্টিশক্তি এখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি।

শিষ্যকে প্রবোধ দেন প্লেটো: সব কিছুরই সময় আছে বৎস। এখনই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে তোমার 'ক্যাথারসিস'-এর কি হবে। আর আসল কথা কি জান দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে আমাদের সকলকে দেখে হোমার হয়ত 'এলিসিয়াম' বলে এক মহাকাব্য ফেঁদে

বসবেন, তখন আবার ব্যাখ্যার ভার পড়বে তোমার আমার উপর। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে এ্যারিস্টটল নিমেষে চুপ করে যান।

কিন্তু ততক্ষণে তাঁদের ফিসফিসানি আলেকজাণ্ডারের কানে গেছে, তাই সভার কাজ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দেন তিনি ঃ আপনারা সকলেই জানেন যে আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এখানকার পূত পরিবেশে আসবার জন্য 'লিম্বো'তে যাঁরা তৈরী হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে ক'জনকে এবং কাদের এখানে আসবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের সহোদরারা এখানে তাঁদের প্রতিনিধিত্বে মোটেই সন্তুষ্ট নন তাই অন্তত য্যানথিপ এবং ক্যাথ্‌রিন দ্য প্রেয়টকে এবার এলিসিয়ামে আনা হোক সেই অনুরোধ তাঁরা আমার কাছে লিখিত ভাবে করেছেন।

পেছন থেকে কে যেন ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলেন ঃ এলিসিয়াম কেন 'বেহেস্ত' বলুন যত সব কেরেস্তানি।

আলেকজাণ্ডার তাঁর স্বর অনেকটা নরম করে বলেন ঃ দেখেন হালি সাহেব 'এলিসিয়াম' কিন্তু কেরেস্তানি নাম নয় সেন্ট অগাস্টিনকে জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন—'প্যাগান' এক চিন্তা। অবশ্য বেহেস্ত বলতেও কোন অসুবিধা নেই।

দান্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ বিয়াত্রিচের কথাও বিবেচনা করা দরকার তাকে আর 'লিম্বো'তে কতদিন রাখা হবে।

আলেকজাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে দান্তেকে নিরস্ত করে দেন ঃ বিয়াত্রিচকে এখানে আনা হবে কি না সে ত তার স্বামী বলবে। আপনি কেন ?

দান্তে হঠাৎ রুখে যান ঃ তার স্বামী বলবে কি করে, সে ত নরকে।

এবার আলেকজাণ্ডার নিটোল এক রসিকতা করেন ঃ তাহলে ত বিয়াত্রিচকে নরকে ফেরত পাঠাতে হয়।

সভায় পরিমিত নির্মল হাসির এক রোল শোনা যায়।

চতুর্থ সারিতে বসা চাঁদ সুলতানা উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞীর প্রত্যয়ে নিজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ এখানকার বোনরা তাঁদের তরফ থেকে আমাকে একটা আর্জি পেশ করতে বলেছেন। লিখিতভাবে সে আর্জি আমরা এখনও আপনাকে জানাই নি।

—বলুন। আলেকজাণ্ডারের স্বরে শিভালরি ধ্বনিত হয়।

—এবার শ'কেও আনতে হবে।

সকলে, এমনকি সভাপতি পর্যন্ত থমকে যান। পরে নানারকমের গুঞ্জন শোনা যায়। এ্যাবসার্ড; বেহেস্তের সম্প্রীতি তাহলে ভেঙে চুরমার হবে; কেউ কারও কথা আর শুনতে চাইবে না তখন; 'প্রেফেসর' জ্বালায় মারা যাবে; ব্রিটিশের কারসাজি।

শেষোক্ত জনকে সম্বোধন করে আলেকজাণ্ডার বলেনঃ আপনার মন্তব্যটা ঠিক বুঝলাম না। তিতুমীর তা ব্যাখ্যা করেনঃ প্রস্তাবটা শুনে এত চমকে গিয়েছিলাম স্যার যে আগেকার কথা মনে পড়ে গেলো। পবিত্র বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে এই মালাউন লেখকের মতের সঙ্গে আমরা অনেকই পরিচিত। ওকে এখানে ঢুকতে দিলে আমাদের বোনদের আর ইজ্জত থাকবে না। তাই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া চাঁদ সুলতানা শ'কে এখানে আনবার যে প্রস্তাব করেছেন তা সমর্থন করতে পারছি না বলে আমি খুবই দুঃখিত।

—আমাদের ইজ্জত আমরা নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারবো। এটা ত বাঁশের কেল্লা নয় যে কামানের গোলায় ধ্বসে পড়ে যাবে। আউরাঙজেব তনয়া জেবুননিসা ফুঁসিয়ে ওঠেন। যদিও সাধারণত তাঁর মেজাজ খুব ঠাণ্ডা।

সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখে আলেকজাণ্ডার একটু ভড়কে যান, তবে সংগে সংগে সামলিয়ে নিয়ে বলেনঃ দেখুন তিতুমীর সাহেব, আপনার মতকে আমরা সকলেই যথেষ্ট গুরুত্ব দি। তবে ভেবে দেখেন বিবাহ-প্রথা এখানে চালু নেই তাই শ' এখানে এলেও আপনার বিচলিত হবার এমন কোন কারণ দেখছি না। এখন বেগম সুলতানা আপনি বলুন শ'কে এখানে এখুনি আনা আপনারা এত দরকার মনে করছেন কেন।

চাঁদ সুলতানা এবার বসেই জবাব দেনঃ শ' এলে আমাদের দলটা একটু জোর পাবে, আমাদের দাবি দাওয়া তাঁর মত আর কে গুছিয়ে বলতে পারবেন। The pen is mightier than the sword. তিতুমীরের মত বীর যোদ্ধাও নিশ্চয় সে কথা জানেন।

তিতুমীর বিরস মুখে নীরব থাকেন। নেহাৎ সহোদরা, কিছু বলবারও উপায় নেই। তবে চাঁদ সুলতানা 'অসি'র কথা ভুলে 'মসী'র দলে ভিড়লেন কবে থেকে।

সহোদরারা সকলে 'ব্রাভো ব্রাভো' করে উঠেন।

—চাঁদ সুলতানার কথা যে ঠিক এ্যারিস্টটল তা জানেন। শ'র এখানে আসা সম্বন্ধে ওঁর মত পেলে সভা উপকৃত হবে। আলেকজাণ্ডার সভাপতির প্রাজ্ঞতা বজায় রাখেন।

—এখনও বেশ-কিছু সময় শ'র 'লিম্বো'তে থাকা দরকার। কথা বলবার অভ্যাসটা একটু কমুক। এ্যারিস্টটল তাঁর নিরপেক্ষ মত দেন।

—আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় সক্রেটিস যদি এ-বাপারে কিছু বলেন তবে এই সভা নিজকে গৌরবান্বিত মনে করবে।

—এক শর্তে শ'র আগমনে আমি রাজী। সক্রেটিস জানান।

সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং সে-কৌতূহল আলেকজাণ্ডারের স্বরে প্রকাশ পায়ঃ কি সর্ত।

—এখানে য্যানথিপ্‌কে আনা যাবে না।

অনেকের হাসি পেয়েও কেউ সাহস করে হাসে না। শুধু চাঁদ সুলতানা সে-হাসি সম্পূর্ণ চাপতে পারেন না। তবে সক্রেটিসের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সহোদরাদের তরফ থেকে য্যানথিপের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব বর্জন করা হয়।

সভার কাজ শেষ হয়েছে, আলেকজাণ্ডার যেই ঘোষণা করতে যাবেন এমন সময় নবীনদের তরফ থেকে জন কেনেডীর পরামর্শে চিত্তরঞ্জন দাস উঠে দাঁড়ান ঃ অস্তিত্বের চরম পরিপূর্ণতা বেহেস্তে লাভ করা যায় বলে ভুখণ্ডে অস্তিত্ব কত অসম্পূর্ণ তা আমাদের মধ্যে যারা প্রাচীন তাঁরা হয়ত ভুলে যান। কেনেডী সাহেব জানেন দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক কত বিড়ম্বিত জীবন যাপন করে···

—সেটা'ত আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। তার পেছনে বৃহত্তর এক ইচ্ছে কাজ করছে। সেখানে নিজেদের ইচ্ছে চাপাতে গেলে আমরা ত আর বেহেস্তে থাকতে পারবো না। আলেকজাণ্ডার মনে করিয়ে দেন।

—তা আমি সবই জানি। তবে আমার কথা শেষ করবার অনুমতি যেন আমি পাই। মানব-অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করবার আমার আর কোন ইচ্ছে নেই। মর্ত্যে আইনের ব্যবসা করে সে ইচ্ছা থেঁৎলে গেছে। তবে আমি প্রস্তাব করতে চাচ্ছিলাম যে অনুন্নত দেশে জ্ঞানের বর্তিকা নিয়ে যদি আমাদের মধ্যে অন্তত দু'জন দার্শনিক সেখানে যান তবে পশ্চিম ও পূর্বের ভিতর জ্ঞানের ব্যাপারে যে বিপজ্জনক বৈষম্য রয়ে গেছে তা অনেকটা দূর হতে পারে।

এ-ব্যাপারে আমার মনে হয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নির্দেশ লাগবে। আলেকজাণ্ডার সতর্ক হয়ে যান।

এবার কেনেডী যোগ করেন : অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে জ্ঞানের বৈষম্য কিন্তু অনেক বেশী মারাত্মক। আমাদের তরফ থেকে এ-ব্যাপারে যদি একটা স্টাডী টোরের আয়োজন করা হয় তবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নারাজ হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। সেটুকু ক্ষমতা আমাদের থাকাও উচিত। আর মর্ত্যের সমস্যার ব্যাপারে আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ দায়মুক্ত মনে করাও ঠিক হবে না।

বেকন এবং টলস্টয় কেনেডীর কথাটা খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তার সুযোগ নিয়ে গ্লাডস্টোন প্রস্তাব করেন : এই সভা মনে করে যে মর্ত্যের সমস্যা সাধারণভাবে এর এখতিয়ারের বাইরে হলেও মর্ত্যের অনুন্নত অঞ্চলে এখান থেকে এক গুডউইল মিশন পাঠানো বিধি-বহির্ভূত হবে না। এই সভা আরও প্রস্তাব করে যে দুই সদস্যবিশিষ্ট এই গুডউইল মিশন-এ থাকবেন প্লেটো এবং আবু সিনা। প্রস্তাবের সমর্থনে নবীনদের তরফ থেকে প্রচুর করতালি পড়ে।

আলেকজাণ্ডার সতর্কতা বজায় রেখে বলেন : উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি প্রস্তাবটা পেশ করবো। এ-ব্যাপারে নিজের দায়িত্বে আমি কিছু বলতে পারবো না।

উচ্চতর কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটা শর্তসাপেক্ষ সমর্থন করেন, বেহেস্তে ফিরে এসে মিশনকে তাঁর কাছে এক রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

প্লেটো এবং আবুসিনা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেন। প্লেটোকে সম্বোধন করে আবুসিনা বলেন : দর্শনের দিকটা স্যার আপনারই পুরো থাকলো। আমি না হয় চিকিৎসাবিদ্যার কত উন্নতি হয়েছে সেটাই দেখবো।

—ঠিক আছে, তবে কোথায় কোথায় যাবে তার একটা প্রোগ্রাম করে নাও, ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু তোমার।

খুব বেশী ভীড় আকর্ষণ করা ঠিক হবে না। অসুবিধা দেখলে স্যার ডিসি বা এস ডিওর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। প্রথমে আমরা যেখানে যাবো সেখানে তাদের সাহায্য ছাড়া একপাও এগুনো যাবে না। বেকায়দায় পড়লে তারা ছাড়া আর কেউ সাহায্যও করতে পারবে না। স্বয়ং গ্লাডস্টোন এই 'টিপ' টা দিয়েছেন।

—তোমার ত প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যা বলবে তাই হবে। শুধু দেখো ম্যালেরিয়া নিয়ে যেন না ফিরি। তবে আলেকজাণ্ডার বড় বিরক্ত হবে।

—আপনি কিছু ভাববেন না। যেখানে যেখানে যাবো তার সব কিছু বৃত্তান্ত আমার কাছে থাকবে। সঙ্গে ওষুধও নিচ্ছি।

মর্ত্যের যে জায়গায় প্লেটো ও আবুসিনা অবতরণ করলেন তার অবস্থান লক্ষ্যযোগ্য। সামনে নদী—আর টিপির মত জায়গায় এক প্রাচীন কোঠা। চপটা মসজিদের তবে পেছন দিকের ভেঙ্গে-পড়া প্রাচীরের গায়ে কয়েকটা বুদ্ধমূর্তি আঁকা। চত্বরের–সংগে-লাগা লতা ও ফুল নদীর হাওয়ায় সাপের মত ফনা দুলিয়ে নাচছে। মনে হয়, হঠাৎ সত্যিকারের সাপ হয়ে ছোবলও মারতে পারে। পেছনের দিকে ত্রিভুজ হয়ে নদীর এক রেখা বাইরের জনপদের সংগে স্বাভাবিক এক প্রাচীর তৈরী করেছে। চত্বর থেকে এক হাত দূরেই আসল নদী আরম্ভ হয়ে গেছে। সেখানে এক নৌকা তীরে-গাঁথা এক কাঠের সংগে বাঁধা। নৌকায় বৈঠাও রয়েছে। তীরে অনেক ডাবগাছ।

—বেশ ভেবে চিন্তে জায়গাটা বাছাই করেছো। নিরিবিলি অথচ দরকার হলে বাইরের দুনিয়ার সংগে যোগাযোগও করা যেতে পারে। তোমার অভিজ্ঞতা ছিলো বলেই তুমি এমন একটা জায়গা বাছতে পারলে। তাহলে বৎস বুঝেছো যে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের দিকে এগুবার এক অন্যতম সোপান।

বুঝেছি স্যার, তবে যাদের আসলে বুঝা দরকার তাদের খবর নি। তার আগে স্যার আপনাকে একটা ডাব পেড়ে খাওয়াই। একেই আপনারা বলতেন 'নেকটার'।

ডাব খেয়ে প্লেটো বলেন ঃ বা চমৎকার স্বাদ'ত। সেই কবে খেয়েছিলাম। এখন একটু ঘুমিয়ে নি বৎস। এখানকার হাওয়াতে ঘুম ডাক দেয়।

আপনি ঘুমান স্যার। আমি টাউনে গিয়ে দেখি কতজনকে আপনার কাছে আনা যায়।

প্রথম যার সংগে দেখা হোল তার বেশ কেশ দেখে আবুসিনা অনুমান করলেন সে বোধ হয় নগরের একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা। তাই তার সামনে গিয়ে গলা একটু খাঁকারি দিয়ে বললেন ঃ শুনুন মহোদয়,

আপনাদের এই নগরে প্লেটো আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু আজকের দিনটা থাকবেন, তারপরে কম্বোডিয়া রওয়ানা দিবেন। আপনি কি তাঁর ভাষণ শুনতে আসবেন।

কে পটলা এসেছে। আর হারামজাদা বলেছে মাত্র একদিন থাকবে। শুয়োরের বাচ্চা আমার চারহাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এখন আবার কলকাতায় যেতে চায়। চোর ত ছিলোই। আবার স্মাগলারও বনেছে। কোথায় পটলা, বেটাকে মেরে আমি হাড় গুঁড়িয়ে দিবো। চলেন দেখি সাহেব, আরে আপনি দেখছি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

আবুসিনা বুঝতে পারলেন ভাব আদান-প্রদানে কোথায় একটা ফাঁক থেকে গেছে, তাই ত্বরিতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান : মুখের দিকে তাকিয়ে নেই সাহেব, কপালে আপনার ঘাটা দেখছি।

লোকটা একটু হকচকিয়ে যায়, পরে স্বরটা একটু নামিয়ে বলে : ডাক্তারকে দেখিয়েছি, বলে কাটতে হবে। বউ বেটী কিছুতেই রাজী হয় না। বলে যদি মরে যাই তবে পল্টু তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে সব দখল করে বসবে। পল্টু আমার ভাই।

—তাই বলেন। এরকম একটা লোক আপনার ভাই না হয়ে পারে। এই মলমটা ঘায়ে দিনে তিনবার লাগাবেন, তাহলে ঘা আর কাটতে হবে না। বলে আবুসিনা ওষুধের যে বাক্সটা সংগে নিয়েছিলেন তা থেকে এক কৌটা মলম বের করে দেন।

—আপনি কে সাহেব, চিনতে পারলাম না ত।

—আমাকে কি আর আপনি চিনবেন। আচ্ছা এখানে ডিগ্রী কলেজ কোথায় একটু দেখিয়ে দেন ত। তার প্রিন্সিপাল বোধ হয় আমাদের চিনতে পারেন।

এতক্ষণে লোকটা আবুসিনাকে পাগল বলে ঠাউরালো আর তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ডিগ্রী কলেজের পথটা দেখিয়ে দিলো।

—সালাম ওলায়কুম। আবু সিনা প্রিন্সিপালকে সহর্ষ সম্বোধন করলেন।

—ওলায়কুম আস্সালাম। আপনার পরিচয় কিন্তু ঠিক জানতে পারলাম না।

—আমার নাম আবুসিনা। চিনতে পারলেন না?

—চিনেছি তবে ঠিক কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পারছি না।

—চিকিৎসা শাস্ত্রে একক কালে আমার অবদান ছিলো।

—ওঃ। তাঁহলে বোধ হয় মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল আপনাকে চিনতে পারবেন।

—আপনার এখানে ফিলসফি পড়ানো হয় না?

—হয় বৈকি! এই অঞ্চলে শুধু আমাদের কলেজেই ফিলজফিতে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা আছে।

—ফিলজফি নয় জনাব ফিলসফি! বেন্‌থামের নিজের মুখে শুনেছি!

প্রিন্সিপালের সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে যায়, তাও মেহমানের সম্মান রেখে বলেন: আপনার জন্য আর কি করতে পারি বলুন।

শোনেন জনাব। আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করতে স্বয়ং প্লেটো এসেছেন। আপনি একটা নোটিশ দিয়ে দেন যে আজকে বিকেল চারটার সময় সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপক যেন প্লেটোর বক্তৃতা শুনতে যান। আবু সিনা তাদের অবস্থানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে দেন।

—দেখেন, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। আপনাকে হেড অব ডিপার্টমেন্ট-এর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি নিশ্চয়ই আপনার কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনবেন।

প্রফেসার সাহেব দেখা গেলো অত সূক্ষ্মতার ধার ধারেন না। প্লেটোর কথা শুনে একগাল হেসে বললেন: বেশ বেশ। তা জনাবদের কিসে আগমন হয়েছে। স্পেস্‌-শীপে।

আবু সিনা এবার একটু রেগেই যান, যদিও রাগতে তাঁদের মানা: বেয়াদপীকে যারা বুদ্ধি বলে ভুল করে তারা বড় জোর 'লিম্বো' পর্যন্ত উন্নতি হতে পারে। তাদের জন্য বেহেস্তের দরজা চিরকালের মত বন্ধ থাকবে।

—আপনি নিজেকে দার্শনিকও বলেন আর বেহেস্তও বিশ্বাস করেন দেখছি। গাঁজা টানেন অন্য কোথাও গিয়ে, এখন আমার টিউটরিয়াল ক্লাস আছে।

—দার্শনিকদের অন্তত যাচাই করে দেখবার ইচ্ছাও থাকা উচিত। এক্সপেরিমেন্টের আগে কি কনক্লুজন করা বিধেয়। জায়গাটা ত

আপনার জানা থাকলো। এখন আসবেন কি আসবেন না সেটা আপনার ইচ্ছা।

প্লেটোর জন্য শেষ পর্যন্ত কোন শ্রোতা পাওয়া যায় কি না সে-ব্যাপারে আবু সিনার মনে যখন বেশ খটকা লেগে গেছে তখন গ্ল্যাডস্টোনের একটা কথা মনে পড়ে যায়। জিলা শহরে এখনও সব চাইতে শিক্ষিত লোক কিন্তু ডি. সি. সামান্য দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। তাই যদি দেখেন আপনাদের কেউ চিনছে না বা চিনলেও আপনাদের কথা একেবারে বিশ্বাস করছে না তাহলে ডি. সি.-র কাছে যাবেন। জিলাশহর ছাড়া অন্য কোথাও গেলে খুব অসুবিধায় পড়তে পারেন। আপনাদের মিশন যদি ব্যর্থ হয় তবে আমাদের সকলের ইজ্জত যাবে।

তাই আবু সিনা ডি. সি.-র অফিসের দিকে ধাবিত হ'ন।

ডি সির সঙ্গে দেখা করা কিন্তু তেমন সহজ ব্যাপার হলো না। আবু সিনার অভিনব বেশ ও রাজকীয় ধরন দেখে বেয়ারা তাঁকে খাতির করে বসালেও ভেতর থেকে অনেকক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

প্রায় পনেরো মিনিট চুপ করে বসে থাকবার পর আবুসিনা একটু অধৈর্য বোধ করতে লাগলেন। এতক্ষণে নিশ্চয় প্লেটোর ঘুম ভেঙেছে। আবু সিনাকে না দেখে হয়ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ছুরিটাও আবুসিনা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নইলে অন্তত প্লেটো ভাব খেতে পারতেন। 'আকাদামী'র কোন চিহ্ন আশে পাশে না দেখে প্লেটোর পক্ষে একটু বিষণ্ণ বোধ করাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ প্লেটোর যোগ্য শ্রোতা যদি না জোটে তবে ত মিশনটা আরম্ভের মুখে মস্ত এক মার খাবে। গ্ল্যাডস্টোনের কথা আবার মনে পড়ে : ডি. সি.-র ব্যাপারে কখনও কোন অধৈর্য দেখাবেন না তাহলেই মিশন-এর সর্বনাশ হয়ে যাবে। The D. C. is the pivot of the district administration, please always remember Mr. Sina. গ্ল্যাডস্টোনের স্বরটা যেন সমুদ্রের গর্জন। শেষ পর্যন্ত বেয়ারা এসে বলে : সাহেব ছালাম দিয়েছেন।

—ছালাম ওলায়কুম, আমার নাম আবুসিনা।

—ওলায়কুম আসসালাম।

—আমার লেবাস দেখে বিস্মিত হবেন না। এটা হোল একাদশ শতাব্দীর আরব পোশাক।

—আচ্ছা। তা আপনার জন্য আমি কি করতে পারি।

আমাকে চিনতে পারলেন ত। দেখেন আপনাকে খুলেই বলি। এককালে চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসাবে আমার কিছু খ্যাতি ছিল। এমনকি ইংরেজ কবি চসারও আমার উল্লেখ করেছেন। তবে যে কথা শুনে আপনি বেশ কিছু চমকাবেন তা হোল প্লেটো এখানে মেহেরবানী করে আজকে বিকেলের জন্য তসরীফ এনেছেন। সন্ধ্যার পরই আমরা আবার কম্বোডিয়া চলে যাবো। না না আপনাকে সে ব্যাপারে কোন এন্তেজাম করতে হবে না। আমাদের নিজেদেরই বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আপনার কাছে এসেছি, শাসন ব্যবস্থা কিভাবে চালাতে হয় সে সম্বন্ধে প্লেটো আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করবেন। আপনি আর আপনার অফিসাররা এলে আমরা খুব খুশী হ'ব। হ্যাঁ ব্যাটারীতে কাজ করে এরকম একটা মাইকেরও দরকার হতে পারে। জায়গাটা আপনার অফিস থেকে কাছেই। আবুসিনা নিজে-দের অবস্থান সম্বন্ধে ডিসিকে ওয়াকিফহাল করেন।

খুব ভাল কথা তবে জানেন কি এ-ব্যাপারে সরকারকে একটু জানাতে হবে। সরকারের আপত্তি না থাকলে আমরা নিশ্চয় খুশী হয়ে আসবো। পুলিশ সুপারকেও ফোন করতে হয়।

পুলিশ আবার কেন, প্লেটো ত পুলিশ দেখলে ঘাবড়িয়ে যাবেন।

পুলিশের এমনিতেই দরকার হবে। প্লেটো এসেছেন শুনলে সারা শহরের লোক সেখানে গিয়ে হাজির হবে। তখন যদি ল' এ্যণ্ড অর্ডার সমস্যা দেখা দেয় পুলিশকেই তার মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের সব কিছুই ভাবতে হয় কিনা।

এতক্ষণে বুঝলাম গ্ল্যাডস্টোন আপনাদের এত প্রশংসা করেন কেন। বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম। আসবেন কিন্তু।

দেখি হোম ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলাপ করে। সিগ্রেট? ডিসি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আর একটা আবুসিনার দিকে বাড়িয়ে দেন।

কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

বলুন।

দিনে আপনি কয়টা সিগ্রেট খান।

তিরিশটা।

বুঝেছি, কাজের চাপে। তা এক সপ্তাহ ধরে দিনে এই বড়ি তিনটে খাবেন। ফলাফল জানাবার সুযোগ অবশ্য পাবেন না কিন্তু তাতে ফল পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আসি তাহলে, নইলে ওদিকে প্লেটো আবার খুব বেশী চিন্তিত হয়ে ওঠে হয়ত একটা 'নিউ রিপাবলিক'ই ফেঁদে বসবেন।

আর এক মিনিট দেরী করে অফিস বারান্দা থেকে বেরুলে আবুসিনা শুনতে পেতেন ডিসির আমোদিত মন্তব্য : A charming mad man. Or a criminal in disguise or a spy.

বিকেলে কিন্তু ডিসি পুলিশ সুপার প্রিন্সিপাল ফিলসফির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট মায় সেই পল্টুর ভাই পর্যন্ত এসে হাজির হয়। সঙ্গে কুড়িজন কনস্টেবল পঞ্চাশজন ছাত্র পাঁচজন শিক্ষক আর শহরের কয়েকজন মাতব্বর।

কনস্টেবল ও ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রচীরের বাইরে রেখে আবু সিনা নিজে বৈঠা বেয়ে মেহমানদের নদী পার করিয়ে প্লেটোর কাছে এনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে ডিসিকে একটু নিভৃতে নিয়ে গিয়ে আবুসিনা জিজ্ঞেস করেন : পার্মিশান পেতে ত কোন অসুবিধা হয় নি। কনেস্টবল ও ছাত্রদের কিন্তু ওখানেই থাকতে হবে প্লেটো আবার জনসভায় বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত ন'ন। মাইক আনতে বলবার সময় আমি আবার সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

—মাইক কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। দরকার হলে কাজে লাগাবেন। নইলে এমনি থাকলো। প্লেটোর সান্নিধ্য থেকে বিনা ঘটায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পলটুর ভাই দ্রুত আবু সিনার দিকে এগিয়ে আসে : আমি কিন্তু বক্তিমে শুনবার জন্য আসি নি। বেড়াতে বেড়াতে আপনাকে দেখে আমার কলজে থেকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। মলমটা খুব কাজে লেগেছে, একবার মাত্র লাগিয়েছি কিন্তু এখনই ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। আপনি রাজী থাকলে আপনার জন্য এখানে এক ডিস্পেন-সারী খুলে দি। সব টাকা আমি দিবো।

—চুপ করুন। আবোল তাবোল বকবেন না। পল্টুর ভাইকে ডি সি ধমকিয়ে ওঠেন। তবে নিজের প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখেন আবু সিনার দেওয়া বড়িগুলো আছে কি না। পুলিশ সুপার ডিসিকে একটু পাশে নিয়ে গিয়ে কি যেন পরামর্শ করেন। তাদের দু'জনকেই একটু যেন বিভ্রান্ত মনে হয়।

প্লেটো ফিলসফির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে প্রথমে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন।

—আমার কোন লেখা পড়েছেন ?

—এম এ ক্লাসে 'দি সিম্পোসিয়াম' একবার পড়েছিলাম। এখন ততটা পরিষ্কার মনে নেই।

যাক্ আপনি যখন এ্যালসিবিয়াডিস হতে পারবেন না তখন আপনার কথা শুনে সক্রেটিস হয়ত খুব ক্ষুণ্ণ হবেন না। আপনি হয়ত আমার কথাটা তেমন বুঝছেন না। ফিরে গিয়ে আমাদের আবার আলেকজাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে কিনা।

প্রফেসর সাহেবের চোখটা একটু ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তিনি নীরব থাকাই বিধেয় মনে করেন।

—ডেকার্ত আর বেনথামের মধ্যে তফাত কি ?

—জী, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—তাহলে আপনাকে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। এবার ডি সি আসতে পারেন। প্রফেসার সাহেব প্লেটোর পাদপীঠ থেকে উঠে এলে প্রিন্সিপাল তাকে ধমকান ঃ ছি ঃ, ছিঃ, ডি সির কাছে নিজের অজ্ঞতা এ-ভাবে প্রকাশ করে ফেললেন। আর ওদিকে মাস্টারদের বেতন বাড়াও নিয়ে ত খুব বক্তৃতা করেন। শেম্। আবু সিনার কাছে তিনি নিজে উচ্চারণের ব্যাপারে কি ভাবে সংশোধিত হয়েছিলেন প্রিন্সিপাল অবশ্য সেকথা ভুলে যান।

প্লেটো ডি সিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আচ্ছা আপনাকে যদি নির্দেশ দেওয়া হয় যে আদর্শ এক শাসন-ব্যবস্থার খসড়া তৈরী করো তাহলে কি কি জিনিস আপনি জানতে চাইবেন।

আদর্শের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে বলবো ও কিসের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ সে-ব্যাপারে আলোকপাত করতে বলবো।

—আপনার বিশেষ ক্ষেত্র কি, শাসন-সীমার বাইরে অবশ্য। অর্থাৎ কোন বিষয়ে এম. এ.।

এম এ নই। অনার্স ছিলো, ইতিহাসে।

তাহলে কি শাসন-ব্যবস্থার খসড়া তৈরী করতে আপনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করবেন। এমন সময় আবু সিনা প্লেটোর কানে ফিসফিস করে কি বলেন।

—ও ঃ গ্ল্যাডস্টোন বলেছে। আচ্ছা তাহলে অন্যদিকে···

সীমারেখার বাইরে অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো, সহসা তা চীৎকারে পরিণত হয়। আর সকলের গলার স্বর ছাড়িয়ে বিশেষ করে একজনের গলার স্বর ভেসে আসে ঃ মহামনীষী পল গ্রীক সরকার কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করতে এসেছেন। আমরা জেনে খুবই খুশী হলাম যে আমাদের জনপ্রিয় ডি সি এ-ব্যাপারে পল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করছেন। তবে জাগ্রত ছাত্র-সমাজের তরফ থেকে আমাদের দাবি যে আমাদেরকেও যেন এই আলাপে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। নইলে এ-আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে বলে আমরা মনে করি। পবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যখন গুরুত্বপুর্ণ আন্তর্জাতিক আলোচনা চলছে তখন আমাদের পুলিশ ভাইরা এখানে কি করছেন তা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই ডি সি ও পুলিশ সাহেবের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন পুলিশকে এক্ষুনি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয় আর আমাদের বক্তব্য যেন এই বিশ্ব-বিশ্রুত শিক্ষা-বিদের কাছে আমরা পেশ করতে পারি। আর আমরা এও শুনেছি যে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন আরব চিকিৎসকও পল সাহেবের সঙ্গে এসেছেন। তাকে আমাদের কলেজের সমস্ত ছাত্রদের তরফ থেকে অনুরোধ করবো তিনি যেন আমাদের কলেজে এক ডিসপেনসারি খুলতে সহায়তা করেন। আমাদের গরীব ছাত্র ভাই বোনরা চিকিৎসার অভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ·

—প্রিন্সিপাল সাহেব এটা কি হচ্ছে, পল কে, গ্রীক সরকারই বা এর মধ্যে কি করে এলেন। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। ডি সি সাহেবের গলার স্বর মেঘের মৃদু নাদের মত শোনায়।

—কি আপনি কিছু জানেন কি না। প্রিন্সিপাল রোষান্বিত চোখে প্রফেসরের দিকে চান।

—না স্যার। আসলে স্যার আমার বিভাগের ছাত্ররা হয়ত শুনতে ভুল করেছে। আপনার কাছে ডি সি সাহেবের নির্দেশ পেয়ে গুপ্তচর ধরবার জন্য আমিও বেরিয়েছিলাম। ছাত্রদের এ-ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শে জড়াতে চাই নি। তাই তাদেরকে বলেছিলাম, অনেকটা হাস্যচ্ছলে যে গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো এবং আরব চিকিৎসক আবুসিনার সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি। সে–কথাকে সত্যি মনে করেই তারা এসেছে।

ডি সি তখুনি তৎপর হয়ে ওঠেন। পুলিশ সাহেবকে বলেন প্লেটো ও আবুসিনার উপর কড়া নজর রাখতে আর প্রিন্সিপাল সাহেবকে হুকুম দেন ছাত্রদের কাছে গিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে। বৈঠা বাইতে বলেন পলটুর ভাইকে। তারপর প্লেটো আর আবুসিনার দিকে তাকিয়ে বলেন: আপনাদেরকে গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হোল, পুলিশ সাহেবের ব্যক্তিগত হেফাজতিতে এখন আপনাদের রাখা হবে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে পরিষ্কার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। আর রেকর্ডে যদি আপনাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু না পাওয়া যায় তবে নিজেদের দেশে আপনারা হয়ত ফিরে যেতে পারবেন। এখন আপনাদের পাসপোর্ট দেন।

প্লেটো ও আবুসিনা পরস্পরের মুখের দিকে নিঃসহায়ভাবে চেয়ে থাকেন।

—দেখেন এরকম 'প্র্যাকটিকাল জোক' আর করতে যাবেন না, আরও বেশী বিপদে পড়বেন তাহলে। এখন পাসপোর্ট সারেণ্ডার করুন। পুলিশ সাহেব গর্জে ওঠেন।

ওদিকে ছাত্রদের বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেছে। কি গুপ্তচর। সত্যি বলছেন স্যার। মেরে লাড্ডু করে দিবো না। আমাদের বঞ্চিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এই হীন চক্রান্ত আমরা ছিন্ন ভিন্ন করে দিবো। ঘৃণ্য গুপ্তচরদের নাড়িভুঁড়ি বের করে কুকুর আর শকুনকে খেতে দিবো। আমাদের প্রিয় ও পবিত্র মাতৃভুমির স্বাধীনতা বিপন্ন করবার জন্য কুটিলতার অন্ধকারে যে শত্রু এমন জঘন্য ··

ডি সি ও পুলিশ সাহেব প্লেটো এবং আবু-সিনাকে কিছুক্ষণের জন্য পেছনে রেখে নতুন পরিস্থিতিটা গভীর মনোযোগ আর কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন।

আবুসিনার ইশারায় তাঁর সঙ্গে প্লেটো সন্তর্পণে ঠিক নদীর পারে এসে দাঁড়ান। বিরাট এক মাছ তীরের পানি থেকে তার পুরো মাথা ও মুখ বের করে প্লেটোর দিকে চেয়ে থাকে। মাছের মাথাটা প্লেটোর কাছে খুব পরিচিত মনে হয়। ধীর সংযত স্বরে, ইতিমধ্যে প্লেটো তাঁর দার্শনিক নির্লিপ্ততা ফিরে পেয়েছেন, তিনি মাছকে সম্বোধন করেন : মুখটা যেন পরিচিত মনে হচ্ছে।

অসম্ভব নয়। আমার নাম পিথাগোরাস। আর দেরী করবেন না, আপনি আর আবুসিনা আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরুন। আপনাদের কম্বোডিয়া পৌঁছিয়ে দিবার নির্দেশ পেয়েছি।

বৎস, মাছ হয়ে খুব কাজে দিয়েছো, রিপোর্টে সে কথা উল্লেখ করবো। পানি ছিৎরানোর শব্দ শুনে ভি সি তৎক্ষণাৎ পেছনে ঘুরে তাকান। কোন দিকে প্লেটো এবং আবুসিনার কোন নিশানা নেই। নদীতে শুধু একটা ঢেউ ক্রমে ক্রমে বুদ্বুদ হয়ে চক্রাকারে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে।

তেলেসমাৎ

সারাদিন আলতাফের মনটা খারাপ থাকে। ভোরের দিকে সে তার ছোট বোন শামিমার কান্না শুনেছিল। বুঝ-না-মানা কান্না, মায়ের জন্য। মা যদি মারা যেত সত্যি সকলের জন্যই ভাল হত। আত্মীয়দের টিটকারী ও বন্ধুদের পীড়াদায়ক নীরবতা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠেছে! আহা মাটা কি রকম স্নেহপ্রবণ ছিল! হঠাৎ বিপর্যয়টা হল এবং পরিচিত জগতটাও তখুনি মিসমার হয়ে গেল। যে যুবক-শিক্ষক শামিমাকে পড়াতো তারই সঙ্গে একদিন মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরিবারের কথা এক লহমার জন্যও না ভেবে এবং ছেলেমেয়েদের নিঃসহায় ও বিভ্রান্ত করে। আব্বা কিভাবে দুমড়িয়ে পড়েছেন। সেই পরহেজগার ও দয়ালু লোক আজ-কাল আর কথাই বলেন না আর ছেলেমেয়েদের দিকেও কি কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকান। মা তার শাড়ী আর গহনা সঙ্গে নিয়ে যায় নি। শোনা যায়, কোন এক মেয়ে স্কুলে মাস্টারনীর চাকরি পেয়েছে। আব্বা শামিমার যথেষ্ট যত্ন কবছেন, তবুও সে মাঝে মাঝে এমন ভাবে কাঁদে যে আলতাফ তা সইতে পারে না। অবশ্য এমন সময় কাঁদে যখন সে মনে করে কেউ তা শুনতে পাবে না—মা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় তার সাত বছরের মেয়েকে নিঃসহায়তার মঞ্চে ফেলে দিয়ে তার বিবেচনা বোধ জাগিয়ে তুলেছে। এক হিসেবে ঘটনাটা আলতাফের পক্ষে ভালই হয়েছে। এখন আব্বা তাকে সব কিছুই দেন, কোন কিছুতেই না করেন না। অবশ্য আলতাফ চায় না তার আব্বা দেউলিয়া হয়ে যান। সে শুধু এক টেপ-রেকর্ডার কিনেছে আর 'পপ' ও 'বিটেল' সঙ্গীতের কয়েকটা রেকর্ড। ম চিপা প্যান্ট দুচোখে দেখতে পারত না, তবে ইউনি-ভার্সিটিতে পড়া তাঁর ছেলের পোশাক—রুচির ব্যাপারে আব্বার

মনোভাব অনেকটা উদার। ছেলের উজ্জ্বল হলুদ বা গাড়-লাল শার্ট কিংবা সামনের দিকে চিপসানো ইতালীয় জুতো সম্বন্ধে আব্বা কখনই বিরূপ মন্তব্য করেন না—মা থাকলে গঞ্জনায় ও বক্রোক্তিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়ত।

নীচে এক মোটর গাড়ী থামল, হঠাৎ চাপা ব্রেকের কাৎরানিতে আর্তনাদ করে। নিশ্চয় নিজাম হবে। শালাকে দেখলে ঈর্ষা হয়। তার বাপ নারায়ণগঞ্জের এক শাঁসালো পাটের দালাল আর তাদের অঢেল টাকা। নিজামই একমাত্র ছেলে। তার বোনদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। নিজাম ঢাকা কলেজে বি কম পড়ে। এলিফ্যান্ট রোডে দামী আসবাবে সজ্জিত এক আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। দু'জন চাকর। এক ঝকঝকে মরিস মাইনর এর মালিক—তার বাপের দেওয়া জন্মদিনের উপহার। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের বিদেশী পানি আস্বাদন করতে ডাক দেয় এবং দু'একবার খুবসুরত তরুণীও দু'একটা যোগাড় করে বসে। আলতাফকে পচ্ছন্দ করে। মজিদকেও। খাওয়ানোর ব্যাপারে মুক্ত হস্ত। তার গাড়ীতে নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের প্রায় ঘোরায় আর মর্জি হলে মজিদকে অতর্কিতে আনকোরা নূতন হাওয়াই শার্ট উপহার দিয়ে বসে।

আব্বা মগরীবের নামাজ পড়ছিলেন আর শামীমা একটা 'কমিক' গিলছিল।

—আব্বাকে বলো আমার ফিরতে দেরী হবে। কথাগুলো বোনের দিকে ছুঁড়ে মেরে, 'পপ' সঙ্গীতের এক জনপ্রিয় গান শীষ দিয়ে গেয়ে আলতাফ সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যায়। নিজাম তার কাল মরিস গাড়ীর জানালা থেকে মুখ বের করে আর তার ঢেউ খেলানো চুলের গোছা ঝাঁকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বলে: তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোক।

—তাড়া কিসের, আমরা যাব কোথায়?

আজকে এক মেয়ে চাই! তবে তার আগে মজিদের খোঁজ করে দেখি। শালা দেহ-রক্ষী ভাল। নিজাম দ্রুত ও নিপুনভাবে গাড়ী চালায়। তোপখানা রোড দিয়ে গাড়ীটা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে পিলখানার দিকে এগিয়ে যায়। একবার মাত্র ব্রেক কষতে হয়, এলোমেলোভাবে গাড়ীর সামনে পড়ে যাওয়া এক বুড়োকে বাঁচাতে গিয়ে।

শালা বুদ্ধবক। কথাগুলো দাঁত দিয়ে নিষ্পেষিত করে নিজাম আবার এ্যাকসিলেরেটর চাপে।

গাড়ীর গতি তার জানালায় ছন্দের এক বিন্যাস আনে ; রাস্তার বাতিগুলো বিদেশী এক সুন্দরীর গূঢ় চাউনিতে নূতন এক অর্থে ভরে যায় ; রেল ফটকের কাছে ভিখিরীদের নাকি উপযাচনা আরোহী-দের কোমল তন্ত্রীকে বিপর্যস্ত করে তুলে, রিকসা, স্কুটার, মোটর বাস ও লরী মিলে জটিল এক ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করে ; বাতাসে মশলা ও প্রস্রাবের মিশ্রিত গন্ধ।

হাই। চলমান তরুণীকে নিজাম সম্বোধন করে এমন ভঙ্গীতে যে আলতাফ আমোদিত বোধ না করে পারে না। নিজাম পিল-খানার কাছাকাছি এক বিভক্ত রাস্তার কাছে এসে হর্ন বাজাতে থাকে। মজিদ এক চিপসা গলির ভেতরে এক আধা ভাঙা বাড়ীতে থাকে, সেখানে মরিস মাইনরেরও ঢুকবার উপায় নেই। প্রায় এক মিনিট পরে সেই চিপসা গলির ভেতর থেকে মজিদের মুখ বেরিয়ে আসে। নীল চিপা প্যান্ট তার উরুর চপকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে ; তার পুরো হাতা হাওয়াই শার্ট প্রচণ্ডভাবে বেগুনী। চোখে তার ছায়া-গাঢ় গগলস্। তার কাল চুল 'ব্রিলক্রিম' এর আভা বহন করছে।

—হাই, বস্। নিজামের দিকে সালামের ধরনে মজিদ হাত তোলে।

—ঢুকে পড়, শালা তোর কোমর বেশ্যাকেও হার মানায়।

আলতাফ দুলে দুলে হাসতে থাকে।

—বি আই এস এ আজকে পল ও লেননের ছবি দেখলাম। লেননের বউ এরও। মিস্টি মেয়ে। মজিদ ঘোষণা করে।

—এবার তুই এক মেয়ে যোগাড় কর, দরকার হলে আমি পয়সা দেব। তবে এক শর্তে। শুক্রবার ও রোববার-এ আমার সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে।

—তুমি শালা শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত হবে না। আলতাফ যোগ করে।

সামনের গলির মাঝখানে এক ঢিমে তালে চলা রিকসা মোটরের গতিকে কমাতে বাধ্য করে।

—রিকসার মেয়েটিকে দেখেছো। কমনীয় ষোড়শী। একটু আদর করে দিবো। এই রিকসাওয়ালা, রিকসা হটাও।

—চোখ নাই, রিকসা সরাবো কোথায় ?

মজিদ বন্য এক চীৎকার করে ওঠে ; বাহনচোত, দেখছিস না গাড়ীটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিস। ডান দিকে শীগগীর রিকসা হটাও। নইলে রিকসা ভেঙে চুরমার করে দিব।

আলতাফ ভাবে ঃ গাড়ীতে চড়লে মজিদ সম্পূর্ণ এক আলাদা চিজ হয়ে যায়। তখন বোধ হয় তার মনে থাকে না তার নিজের বাপ ট্রাক চালায়। নিকৃষ্ট আরোহীদের অপদস্থ করার কৌশল সে বোধ হয় তার বাপের কাছ থেকেই শিখেছে।

—ও রিক্‌সা ভেঙে চুরমার করে দিবেন, দেখি না কত বীর পুরুষ।

—নিজাম চালিয়ে যাও আর রিকসাটাকে ড্রেনে ফেলে দাও। ব্যাটা কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শিখুক। মজিদ এত তেতে উঠলো যে রিক্‌সার যুবতী আরোহিণীর কথাও তার মনে থাকলো না।

—ঠিক বলছো, তবে নর্দমায় পড়লে মেয়েটার দশা কি হবে ?

ইতিমধ্যে মেয়েটি রিক্‌সা থেকে নেমে এসে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর মজিদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা রাগের কণ্ঠে বলল ; কেন, রিক্‌সা ঠেলে দিবে কেন ? নর্দমা দেখছ না। তোমার চোখ নেই। রিক্‌সা কোনদিকে হটবে। নর্দমার ভেতর ? পারলে নিজে এসে রিক্‌সাটাকে সরাও। আর একটা মেয়েকে একলা পেয়ে তার সম্বন্ধে এমন বিশ্রী কথা বলতে তোমার বাধে না। অভদ্র, কাপুরুষ কোথাকার !

বিলকুল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কত চলমান মেয়েকে নিয়ে এ-ধরনের কথা বলেছে কিন্তু কেউ ত এমন ঘোরতর ভাবে রুখে দাঁড়ায় নি।

—মেয়েটি অন্য ধাচের রে ভাই, ওকে ঘাটাইস না। এখুনি ভিড় জমে যাবে। এমনকি পুলিশও এসে পড়তে পারে। নিজাম নিজের প্রতি আর ততটা আস্থাবান বোধ করে না আর মজিদ একেবারে চুপ মেরে গেছে। মেয়েটি সম্মুখ সমরে এগিয়ে আসাতে তাদের আত্মরক্ষার ব্যূহ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

আলতাফ বলল : বাদিকে গাড়িটা একটু চেপে বেরিয়ে যাও নিজাম। নইলে গোলমাল হবে।

নিজামের বাসায় নিরাপদে না পৌঁছা পর্যন্ত সকলেই বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। তাদের বাহাদুরীর মুখোস এক লহমায় খসে পড়েছে। 'বিটেল' সঙ্গীতের এক রেকর্ড নিজাম যত্নের সঙ্গে বাছাই করে। বাজনাটা প্রাণ-মাতানো আর রিংসোর গলাও তার সঙ্গে তাল রেখে চলছে। বাজনার তালে তালে তিন বন্ধু নাচের ভঙ্গিমায় শরীর চালনা করতে লাগল। নিজাম মজিদের কোমরে আল্গাভাবে হাত রাখল। সরিয়ে আনল আর তার পরে মজিদের বুড়ো ও মাঝ আঙুলের সমন্বয়ে তৈরি সুরের সঙ্গে সমতা রেখে নাচা আরম্ভ করে দিল।

যৌবনের গতিময়তা ও তরলতা মজিদের বাঁকানো দুমড়ানো শরীরের বিভিন্ন ভাজে ও তার দ্রুত তালে নুতন এক অর্থ পেল। সেই বিশেষ গানটা বিশেষভাবে তৈরী পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেকটা বিশ্বাস্য হয়ে উঠল।

আলতাফ অন্য কিছু ভাবছিল। বেতাল কয়েকটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একশো পাওয়ারে বাল্বটা নিজামের ঢেউ-খেলানো কালো চুলে ও মজিদের সুবিন্যস্ত সিঁথিতে বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক ছাঁদ তৈরী করেছে; নীচের পুকুরের নিস্কম্প পানিতে সাগর-পারের সুর আন্তর্জাতিক এক ঢল এনেছে; প্রতিবাদ-দীপ্ত মেয়েটির চাউনি হঠাৎ এক নিগূঢ় বাসনার প্রতিফলন বলে মনে হয়। কিন্তু মায়ের বেকুনি সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। বাজনা থেমে গেলে নিজাম ও মজিদের নাচও থেমে যায়।

—হুইস্কী? নিজাম হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

— অবশ্যই।

—তুই শালা কখনও না বলবি না। তুই আমার শার্ট নিবি, আমার গগেলস্ পরবি, আমার হুইস্কি খাবি কিন্তু কথা সব সময় বলবি নায়কের মত। আর একটা মেয়ে একটু রুখে দাঁড়ালেই তুই একেবারে চুপ।

—ওত, বস্, মেয়ে ছিল না। দেখলে না ফনাটা কি ভাবে তুলে ধরল।

—ফনাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারলি না। সাপ যখন মেয়ে হয় তোর বুঝি জ্ঞান থাকে না?

—জবর বলেছ, বস্। যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা। মজিদ নিজের হলদে দাঁত ফাঁক করে নিজামের অনুমোদনের অপেক্ষা করে।

নিজাম হুইস্কীর এক বোতল বের করে গ্লাসে এক পেগ্ ঢালে তারপর বরফ মিশিয়ে গ্লাসটা মজিদের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

মজিদ এক চুমুক পান করে হিক্কা তুলে।

—হুইস্কী কি ভাবে খেতে হয় তাও তুই জানিস না। এটা সস্তা পানীয় নয়। তোকে খেতে দিয়ে আমি এটার অসম্মান করি। আলতাফ হয়ত জিনিসটার কদর বুঝবে। এক পেগ্ দিব নাকি, বন্ধু?

—না এখন নয়। নিজের পয়সায় যখন খেতে পারব তখন দেখা যাবে।

—শোন, শোন মজিদ। আলতাফের কাছ থেকে ত তুই শিখতে পারিস।

—মাগ্না পেলে, বস্, আমি বিষও খেতে রাজী, হুইস্কী ত সুধা।

—তুই শালা কি নীলকণ্ঠ যে বিষ খেলেও কিছু হবে না।

বিচ্ছিন্ন সব ছবি আবার আলতাফের চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। ফুল হল কীট, কীট বেলুন হয়ে গেল, বেলুন ফেটে গিয়ে আগুন ছড়াল, আগুনের শিখা থেকে বেরিয়ে এল এক নারী -অনেকটা তার মায়ের মত দেখতে। তার মা তার কথা কি আর ভাবে না। শমিমাকেও ভুলে গেছে? সেই যুবক-শিক্ষকের মুখে কি সে খুঁজে পেয়েছিল যার তাড়ায় নিজের পরিচিত জগৎ সে ফেলে চলে গেল?

মায়ের মুখে সব সময় একটা কচি ভাব ছিল, অপরিচিতরা মনে করত সে বুঝি শমিমার আপা। এখনও কি তার মুখের সেই কচি ভাব রয়ে গেছে, না সে অনটনে আছে?

নিজাম ইতিমধ্যে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে এসে উত্তেজিত স্বরে বলে: মজিদ শোন, একটা বাজি রাখবি? বাইরে চেয়ে দেখ।

—কেন, বাইরে কি আছে?

—চল, দেখবি।

তিন বন্ধু মিলে জানালার কাছে যায়।

—ওই গাছটা দেখছিস যেখানে ডালের ভিতর দিয়ে বাতি জ্বলছে। উপরের দিকে চেয়ে দেখ, সেখানে কিছু দেখতে পাচ্ছিস? বাচ্চা চিলটা চোখে পড়ে, মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে? মা-টা হয়ত ওখানেই আছে। যদিও এখান থেকে দেখা যায় না।

মজিদ বলল হ্যাঁ, বাচ্চা চিলকে দেখতে পাচ্ছি। এতে বাজীর কি আছে!

—আমি তোকে মাগনা হুইস্কী দিব যত গিলতে পারিস আর নগদ কুড়িটা টাকা যদি তুই ওই বাচ্চা চিলকে উপর থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে পারিস। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম তবে ওর নাগাল পাই নি। মেয়েটা ত তোকে চুপ করিয়ে ছাড়িয়েছে এখন দেখা যাক তুই বাচ্চা চিলটাকে চুপ করাতে পারিস কি না।

আলতাফ তীব্র প্রতিবাদ করে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, নিজাম? এটা কি কোন একটা বাজী হল?

নিজাম আলতাফের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে না আর মজিদের দিকে চেয়ে উস্কানির স্বরে বলেঃ কি বাজীটা পছন্দ হল?

—খুব, এটাত পাঁচ মিনিটের কাজ।

—তাহলে আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছিস।

—সত্যি এই বাজী তুমি রাখতে চাও বস্, কোন ফাঁকি নেইত?

—ফাঁকি কিসের? তুই চোন আমি হুইস্কীর বোতল ও কুড়িটা টাকা আলতাফের কাছে জমা রাখতে পারি।

মজিদ আর দেরি না করে বেরিয়ে গেল। নিজাম আর আলতাফ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রল; নিজাম মাঝে মাঝে হুইস্কীতে চুমুক দিতে লাগলো।

ইলেকট্রিক বাতি যেখানে ভৌতিক ধরনের এক আলো ছড়াচ্ছিলো সেখানে নিজাম সহজেই উঠে গেল। তারপরেই সহসা প্রচণ্ড বাধা। এক পূর্ণ-বয়স্ক শক্তিধর চিল, প্রায় ঈগলের মত, তার ধূসর পাখা রাজকীয় নির্ভরতায় মেলে ধরল—সন্তানকে রক্ষা করবার মানসে মায়ের প্রবৃত্তি দিশেহারা ভাবে জাগরূক—আর মজিদের মাথার উপর নেমে এল।

মজিদ এই আকস্মিক দ্রুত আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। চিলের ক্ষিপ্ত আক্রমণে নিজের আহত কপাল থেকে

মজিদ দরদর করে রক্ত পড়তে দেখল। গাছের কালচে-নীল পাতা-গুলো চিলের ধূসর হিংস্রতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ভৌতিক আলোকে যেন মজিদের রক্ত তর্পণ হিসেবে উপহার দিচ্ছে। মজিদ দুর্দান্ত শক্তির সঙ্গে প্রতি আক্রমণ চালাল আর কয়েক তোলপাড় করা মুহূর্তের পর চিলের কাঁধকে নিজের হাতের আওতার মধ্যে নিয়ে এল। তারপরে তার শরীরের সমস্ত জোর একত্রিত করে ও নিশ্ছিদ্র একাগ্রতার সঙ্গে সে চিলের টুঁটিকে চেপে ধরল। ত্রাস-চঞ্চল এক ব্যগ্রতা চিলের শারীরিক প্রতিবাদে মূর্ত হয়ে উঠল আর তার ধারালো নখর মজিদের কাঁধ ও ঘাড়কে বিচিত্র রেখাঙ্কনে চিহ্নিত করে তুলল। মজিদ নিজের দাঁত চেপে ধরলো, কিন্তু নিজের মুষ্টির জোর শেষ আয়াস করে আরও বাড়িয়ে দিল। আরও, আরও—যতক্ষণ না চিলের নখর তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল আর তার পাখনা আর নড়ল না।

বেশ্যা মাগী, বাজিতে আমাকে প্রায় হারিয়ে দিয়েছিলি। চিলের তরফ থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মজিদ চিলের নিস্পন্দ দেহকে একটা ডালের উপর ঝুলিয়ে রাখল। তারপরে বাচ্চা চিলটার উপর তার নজর পড়ল। খড়ের বাসায় বাচ্চাটা বোধ হয় মনে করছে সে বেশ নিরাপদ। শীগ্‌গীরই তার ভুল ভাঙবে। মজিদ যখন বাচ্চাটার সঙ্গে মুখোমুখি হল, সে বেচারা তার পাখা মেলে তার শত্রুকে প্রতিহত করবার করুণ এক চেষ্টা করল। মাথাটা কি বড়, কোন বাচ্চা চিলের মাথা বলে মনে হয় না। তার মাথার দিকে মজিদ যখন নিজের হাত বাড়িয়ে দিল, বাচ্চাটা মজিদের ডাকাতে অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তার চঞ্চুটা আত্মরক্ষার মানসে তুলে ধরল। এক মুহূর্তের জন্য মজিদ দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু এখন মমতার ব্যাধিতে পড়ে গেলে সে নিশ্চিত হেরে যাবে। তাই মজিদ নিজেকে আর চিন্তা করতে দিল না এবং তার ডান হাতের মস্ত এক আঘাতে বাসা শুদ্ধ বাচ্চাটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বাচ্চার মা-টা তখনও ডালে ঝুলছিল, মরণের মুখে যাবার আগে নিজের বাচ্চার ক্ষীণ ডাক তার শুনবার কথা নয়।

গাছের শীর্ষে মজিদকে বস্তুতঃই বিজেতার মত লাগছিল। রক্তের ছোপে চিহ্নিত তার বেগুনী হাওয়াই শার্ট যেন তার বিজয়ের প্রতীক ; নিজের কপালের ক্ষত তার সংগ্রামের এক আনুষঙ্গিক অংশ।

সাবাস মজিদ, আর কয়েকটা টাকা দিলে তুই মানুষই খুন করতে পারবি। নিজাম বলে। মজিদ হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে যায় ; আমাকে কি মনে কর তুমি ? তোমার টাকায় আমি থুথু ফেলি, অন্য কোন এক বাজীর কথা ভাবতে পারলে না। তোমার নিজের কোন মুরোদ নেই, তাই টাকা দিয়ে অন্যের মুরোদ কিনতে চাও। ছোটলোক কোথাকার।

নিজাম মজিদের এই রাগের সঙ্গে পরিচিত। মাঝে মাঝে মজিদের রাগের বিস্ফোরণ হয়, তখন তার সঙ্গে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতে হয়।

রাগ করিস না দোস্ত। তোকে এখন মাটাডোরের মত লাগছে। যা বাথরুমে যা। হাত মুখ ধুয়ে নে। সেখানে ডেটলও পাবি। আর এই হাওয়াই শার্টটা নে। তোরটা বদলে নিস। আমি ওটা লণ্ড্রীতে পাঠিয়ে দিব। হাত মুখ ধুয়ে এসে হুইস্কী খা। তুই যখন রাগ করিস আমি বড় ঘাবড়ে যাই দোস্ত। আলতাফ মানুষ ও চিলের মধ্যে লড়াইটা রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল। অতীতের বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ভৌতিক-দ্যুতিতে আলোকিত পাতার পর্দায় যেন চিত্রিত হচ্ছিলো। পর্দার মাঝখানে মজিদকে এক নতুন তৈমুরলঙ্গের মত লাগছিল, যার কাছে করুণা এক অনাবশ্যক চিন্তা। বাহাদুর বটে, মজিদ। বাথরুম থেকে মজিদ যখন বেরিয়ে এল তখন সে তার আগেকার মূর্তিতে ফিরে গেছে। কিছুক্ষণ আগে যে সংঘাত ঘটে গেছে তার বিশেষ কোন চিহ্ন নেই।

—এই হাওয়াই শার্টটা বেশ আরামের, বস্।

—ওটা এখন তোমারই। এক পেগ্ শীগ্‌গীর সারো তারপর চল রমনা রেস্তোরাঁতে যাই। আলতাফ বেচারা কিছু না খেয়েই আছে।

—একটা মেয়ের খোজ করব, বস্ ?

—নিশ্চয়ই। যদি কাউকে পাও আর কেউ জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটা কে' বল, ফুপোত বোন।

ফুপোত বোন কেন, দরকার হলে ফুপু বলব। পুলিসরা পর্যন্ত ফুপুদের খাতির করে।

রমনা পার্কে ঢুকে গোধূলির আলোতে নিজাম আর মজিদ দেখলো প্রায় তিরিশ গজ দূরে ডান দিকের এক কোণায় এক

দম্পতি বসে আছে। সেখানে আলো তেমন খোলতাই হয় নি, তাই মুখগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। তবুও এক ঝলকেই বোঝা গেলো মেয়েটির মুখে এখনও যৌবনের শ্রী আছে। দম্পতি নিজেদের মধ্যে যেন একেবারে অবিষ্ট, ঠোঙা থেকে বের করে কি যেন খাচ্ছিল।

—খাসা পেয়ারা রে, পাড়বো নাকি? নিজাম মজিদের কনুই-এ অর্থপূর্ণ এক গুঁতো দেয়।

মুখটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না তবে অনেকটা কচি ডাবের মত মনে হয়।

—মেয়েটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল কেন, ভূত দেখেছে নাকি? নিজাম জিজ্ঞেস করে।

ততক্ষণে আলতাফের চোখটাও ওই কোণায় নিবদ্ধ হয়েছে। সে চমকিয়ে একেবারে দুমড়িয়ে পড়ল আর নিজামের কাঁধে মাতালের ভঙ্গীতে হাত রেখে সাপের মত হিসহিস করে উঠল, আর একটা কথাও বলিস না, হারামজাদা। ও আমার মা।

কয়েক মুহূর্ত সকলে একেবারে চুপ। তারপরে মজিদ অপ্রতিরোধ্য আমোদে ফেটে পড়ে নিজের শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে থাকেঃ তার সঙ্গে পুরুষটা কে, তোমার নতুন বাপ? হো হো হা হা হা হা।

রদবদল

গওসের সংসার ছোট আর অভাবের ঠিক ঊর্ধ্বে। বাইরের জগৎ থেকে সম্পদ ও বিলাসের স্পর্শ নফস্‌কে একটু বিচলিত করলেও সে মোটামুটি তুষ্ট। কোন জহরত-দীপ্ত স্মৃতি নেই বা ভবিষ্যতের কাছে বিশেষ কোন বিবৃতি দিবার পরিকল্পনা।

শান্তিনগরে পাঁচ কাঠা জমি তিন বছর আগে কিনে রেখেছিলো। সম্প্রতি নিজের সমস্ত সঞ্চয় ও বাড়তি আয় কাজে লাগিয়ে আর স্ত্রীর গয়না বিক্রির টাকা যোগ করে দুই কামরার এক বাড়ী তুলেছে। বাড়ী তৈরি করতে যে পেরেসানি ও হয়রানি গেছে তা গত চারমাস ধরে নিজের বাসায় অনেকটা মনের শান্তিতে থেকে কিছুটা শুধরে নিবার চেষ্টা করছে।

বাড়ীর সামনে যে এক কাঠা জমি তাতে বাগান করেছে আর পেছনের দুই কাঠা জমিতে সব্জী লাগিয়েছে। বেল, গাঁদা ও গোলাপ চোখে ও নাকে প্রাত্যহিক এক বিলাসের কাজ করে আর শাক, ডাটা ও পুদিনা মাটির সঙ্গে মনের মিতালী ঘটায়।

অধ্যাপনায় গওস এখনও মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য ও শিহরণ খুঁজে পায় আর তরুণদের উষ্ণতায় ও আকস্মিক ভ্রান্ত কৌতুকে প্রবোধ ও আমোদ। স্ত্রী জরিনার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ঘোরতরভাবে পার্থিব, যদিও সে স্বামীর জন্য বেশ কিছুটা আত্মত্যাগ ও একমাত্র সন্তান নাসরীনের মঙ্গলের তাগিদে এমনকি প্রাণদান করতে পারে।

সংসারের আসল স্ফূর্তি ও আলো নাসরীন। ভূ-ভারতে তার মত আর কিশোরী-মেয়ে নেই—মায়ের যদিও তাই ধারণা—গওস সে-কথা বলবে না, তবে নাসরীন ছাড়া তাদের সংসার সে কল্পনাই

করতে পারে না। প্রজাপতির মত অকুণ্ঠ খুশিতে নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয়, পরাগে পরাগে হাসতে থাকে। আর হাঁস মুরগী বিড়ালের পেছনে চরকির মত ঘুরে ঘুরে তাদের ধরতে পারলে আদর করে নইলে নিজের অসফলতায় নিজের সঙ্গে গূঢ় ধরনের আলাপ চালায়।

—পালিয়ে ভালই করেছে। হাতে পড়লে গলা টিপে দিতাম। হতচ্ছাড়ী মিনু বিড়াল, তুমি আমার চুড়ী ভেঙেছো, মা জানলে এক অনাসৃষ্টি করে বসবে না। কানে কথাগুলো ভেসে এলে গওস এমনভাব করে যে কিছুই শুনতে পায় নি, নইলে ক্লাস টু-এ পড়া নাসরীন ভাবতে পারে তার নিভৃত কথোপকথন 'আব্বু' শুনে গর্হিত এক কাজ করেছে।

কালো ঝকঝকে মার্সিডিজ হাঁকিয়ে বন্ধু দিলদার এক রোববারে সস্ত্রীক এসে হাজির হয়। গওস তখন বাড়ন্ত আলোয় বাগানের বাহার দেখছিলো। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করবার জন্য চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলো। নাসরীন আগেই ছুটে এসেছে, 'চাচী'কে দেখে একগাল হেসে বললো: কতদিন পরে যে এলেন, পথ ভুলে বুঝি।

শ্রীমতী দিলদার আসমানী রঙের শাড়ী ফুরফুরে হাওয়ায় ছড়িয়ে গাড়ী থেকে নামেন, নাসরীনকে নিজের আমোদিত কিন্তু কিছুটা ক্ষয়িষ্ণু হাসিতে বেষ্টন করে বলেন: তোমার জন্য দেখো কি এনেছি।

—ওমা পুরো এক বাকস চকলেট। কি মজা। তোমাকে দিবো না কিন্তু আব্বু, সব আমি খাবো। বলে নাসরীন চাচীর হাত ধরে নাচতে নাচতে শোবার কামরার দিকে যায়। ততক্ষণে জরিনাও চুল ঠিক করে শাড়ী বদলিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

দিলদারের স্বচ্ছলতা তার বাঁহাতের হীরার আঙটিতে, তির্যকভাবে প্রতিফলিত এক জ্বলজ্বলে আলো-কণিকার সংঘর্ষে দ্যুতি-বিস্ফোটিত। অন্য এক জগৎ, গওস যার বাসিন্দা নয়।

—অনেক দিন পরে এলে। আরে তোমার চুল দেখছি পাকতে আরম্ভ করেছে।

—বয়স ত আর কম হলো না, তারপর কাজের ঝক্কি। তুমি ত ছিমছামই রয়ে যাচ্ছো।

—আয়ের বাড়তি থাকলে ত স্ফীতি হবে। তোমার পেটেও দেখি স্বচ্ছলতার সুর ভাজছে।

—অধ্যাপক না হলে কথায় এমন ঝলক আসে—হা হা হা—কথাটা খাসা বলেছো কিন্তু। ভাগ্যিস আমার পেটের গুনগুনানি শোন নি। তুমি আছো বেশ, যাই বলো এমন চাপা পেট, এমন সুঠাম সংসার।

মেহমানরা চলে গেলে জরিনা স্বামীকে বলেঃ দিলদারের বউ কি সুন্দর 'কাতান' শাড়ী পরে এসেছিলো।

—দিলদারের হাতে আংটিটাও দেখেছো ত।

—কোথায় হীরার আঙটি আর কোথায় এক 'কাতান' শাড়ী। তোমার সঙ্গে কথা বলাই এক ঝক্কি দেখছি। জরিনা নারীর জটিল যুক্তির আশ্রয় নেয়।

গওস প্রতিবাদ করে না।

সহসা প্রসঙ্গ বদলিয়ে যেন, 'কাতান' শাড়ীটা আদায় না করলেও চলবে, জরিনা স্বামীর দিকে মৃদু এক অশ্লীলতার দৃষ্টিতে চেয়ে বলেঃ দিলদারের বউ সম্বন্ধে কথাটা শুনেছো।

—কি ?

—ছেলে হয় না বলে ভদ্রমহিলা এখন গা ছেড়ে দিয়েছে। এক স্ক্যাণ্ডাল হয়ে যেতে পারে।

—তাতে আমাদের লাভ বা লোকসান কোথায়। এখন আমাদের নিজেদেরও ত এক ছেলে দরকার।

ঘটনাটা তখনই ঘটলো।

—ও ও ও। আম্মা। আম্মা গো। কাতর, ত্রস্ত গোঙানি।

—নাসরীনের গলার স্বর না। ও খোদা কি হোল। বন্ধে আতঙ্কের হাজারো ভোল্টের ধাক্কা খেয়ে জরিনা ছুট দেয়।

পেছনে গওস।

ডান পাটা একটু তুলে নাসরীণ দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের সাদা তালুর মাঝখানের নরম জায়গায় গাঢ়-সবুজ রঙের এক বোতলের টুকরো এক নিটোল জ্যামিতিক বিন্যাসে গেঁথে গেছে—বিন্দু বিন্দু আলো সে ভাঙা টুকরায় খলখলিয়ে হাসছে। নাসরীনের ঠিক মাথার উপরে এক তাল গাছ, পুষ্ট ফলের বদান্যতায় ভরাট। নাসরীনের পায়ের তলায় সবুজ ঝিলমিলানো ঘাস রক্তের তর্পণ পেয়ে নিজের স্বকীয়তা কিছুটা যেন হারিয়ে ফেলেছে।

—ওরে মা মণি আমার। জরিনা তপ্ত মমতায় মেয়েকে কোলে তুলে নেয়।

বাপের স্তব্ধ মুখ আর কাতর চোখের দিকে চেয়ে নাসরীন সাময়িকভাবে নিজের গোঙানি ভুলে যায়। তারপর আরও জোরে কেঁদে উঠে বলেঃ আমাকে হাসপাতালে নিয়ো না, আব্বু। ওরা আমার পা কেটে দিবে।

গওস ইতিমধ্যে নিজের মনকে শক্ত করে ফেলেছে। চাকরকে তাড়াতাড়ি রিক্সা বা স্কুটার আনতে বলে। স্ত্রীর কোল থেকে মেয়েকে নিয়ে জরিনাকে বলেঃ তুমি তাড়াতাড়ি তুলা আর পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে পানি আর 'ডেটল' দিয়ে জায়গাটা মুছে দি।

যে-পরিমাণে রক্তটা পড়ছে দেখলে মাথা ঘুরে যায়। পানি আর ডেটল দেওয়ার পরও রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। তাই কি করবে ঠিক বুঝতে না পেরে বোতলের টুকরা যেখানে বিঁধেছে তার দুদিকের নরম পেশী গওস নিজের হাতে প্রবলভাবে চেপে ধরে তারপর স্ত্রীর সাহায্যে কোনমতে অনভিজ্ঞ ধরনের এক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়।

—কাঁদে না। লক্ষ্মী সোনা আমার। চলো না একটু ডাক্তারের কাছে যাই। টুকরাটা বের করে ফেললেই ব্যাস সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না আব্বু। তোমার পায়ে পড়ি ডাক্তারের কাছে নিও না। ওমা আমি মরে যাবো গো।

বাইরে স্কুটারের শব্দ শোনা যায়।

হাজার কাঁদলেও আর হৃদয়-বিদারক নির্ভরতায় মাকে জড়িয়ে ধরলেও নাসরীনকে জোর করে ছিনিয়ে গওস তাকে স্কুটারে তুলে নেয়। ব্যাণ্ডেজটা এরি মধ্যে মাঝখানে লাল হয়ে গেছে, আর একটু পরেই রক্ত আবার টপর টপর করে পড়তে আরম্ভ করবে।

বাইরের রাস্তায় বরাবরের পাঁচমিশেলী ছবি। গোলাপী শাড়ী পরে দোতলার এক জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে এক যুবতী অবাক বিস্ময়ে আসমানের দিকে চেয়ে আছে—প্রশস্ত আকাশে যেন বিধুর এক বেদনা; ছেঁড়া শাড়ীতে কোনমতে নিজের বাড়ন্ত শরীর ঢেকে এক তরুণী জ্বালানি কাঠের এক বোঝা মাথায় চাপিয়ে ফুটপাথ দিয়ে অস্তিত্বের মন্ত্রণায় এগিয়ে চলেছে।

সেই গূঢ় বৈপরীত্যও গওসের মনে খানখান হয়ে ভেঙে যায় যখন স্কুটার এক অসতর্ক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে হঠাৎ ছন্দহীন এক শব্দ করে 'ব্রেক' কষে।

—আরে স্যার যে। কেমন আছেন? পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক সুদর্শন যুবক স্কুটারের সামনে হকচকিয়ে থেমে গওসের দিকে এলোমেলো চোখ তুলে বলে।

মুখটা পরিচিত তবে কখন ও কোথায় ছাত্র ছিলো এখন ঠিক মনে পড়ছে না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরন বজায় রাখাই গওস শ্রেয় মনে করে : এখন করছো কি, কোথায় আছো?

—ব্যারিস্টারী করি, স্যার। ওই চারতালা বাড়ীটা সব আমার। আসবেন স্যার একদিন। পরণে লুঙ্গী, খালি পা। গওসের ধোঁকা লেগে যায়।

সন্দেহ ভঞ্জন করে নাসরীন ছেলেটা যখন চলে গেলো আর স্কুটারটা আবার স্টার্ট নিতে লাগলো : ও ত আব্বা পাগল। একদিন আমাদের বাসায় এসে বলে—তুমি তখন বাইরে ছিলে—'এটা স্যাবের বাসা না'। তারপর গামছাতে করে অনেক কয়টা কুল রেখে যায়।

মেয়ে তাহলে ডাক্তারের ভয় কাটিয়ে উঠেছে। খুশী হয়ে গওস ভাবে। তবে যুবকটা আবার মনে নতুন এক ঘোরের সৃষ্টি করে। নতুন নতুন দৃশ্য—একটার সঙ্গে আর একটার মিল-মহব্বত নেই—মনকে বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় ভরে দেয়। নাসরীনের যাতনা তার বাপের মনে একক কোন অনুভূতি না হয়ে আশেপাশের খণ্ড খণ্ড ছবির সঙ্গে সূত্র খুঁজবার এক অপ্রতিরোধ্য তাড়া অনুভব করে কিন্তু প্রতিহত হয়ে পৃথকভাবে আবার ফিরে আসে।

নাসরীনের সহনশক্তিতে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। সেই মায়ের আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে আনবার পর থেকে আর কাঁদে নি। যখন ব্যথাটা অসহনীয় মনে হয়েছে তখন সংযতভাবে 'অ আ হ্' শব্দ করে তখুনি চুপ মেরে গেছে। যদিও সে-চেষ্টায় তার পুতুলের মত মুখ কেমন ভৌতিকভাবে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

বাপ হয়ে গওস তা দেখছে, সইছে।

হাসপাতালে এসে স্কুটার থেকে নাসরীনকে শুধু নামাতেই ড্রাইভার সাহায্য করে না, এমারজেন্সী রুম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

—তুমি খামাখাই কষ্ট করছো মিঞা, আমিই পারতাম। গওস কৃতজ্ঞতা-ভেজা কণ্ঠে বলে।

—কি যে ক'ন সাব, এই মেয়েডার মুখ আল্লাহ্ তালা কি দিয়ে গড়ছে যেন, মুখ দেহলেই ক্যামুন মায়া পড়ে যায়।

—মিটারে যা উঠেছে তার থেকে চার আনা পয়সা বেশী দিয়ে গওস স্কুটার-ড্রাইভারকে বিদায় দেয়।

—দোয়া করি সার, মেয়েডার যেন আরাম হয়।

গওসের মনে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের যত্ন পাওয়ার জন্য যে ক্ষিপ্র অধৈর্য তাতে এমারজেন্সী রুমের কেউ শরীক হয় না। ডাক্তারের খোঁজ করতে গিয়ে গওস জানতে পায় যে তিনি তখন ভয়ানকভাবে জরুরী এক 'কেস' দেখতে ব্যস্ত!

—দেখছেন না মেয়েটার কি অবস্থা, পায়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন। এখুনি ডাক্তার দরকার, কতক্ষণ ধরে রক্ত পড়ছে পা থেকে! আপনি গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে ডাক্তার সাহেব নিশ্চয় আসবেন। গওস কিছুটা সম্বিৎহারা হয়ে অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে।

—যে রুগী ডাক্তার সাহেব দেখছেন তার অবস্থা আরও খারাপ। ডেস্কে যে-লোকটা বসেছিলো সে একটু তেরছাভাবে হেসে নেয়। যেন গওসের ব্যাকুলতার মধ্যে আমোদের এক অংশ আছে।

লোকটার মনোভাব আর হাসি দেখে গওসের মাথায় রক্ত চড়ে যায় তবে তাতে সে-অবস্থায় বিশেষ কোন লাভ হবে না মনে করে নাসরীনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়। কেমন কাঠ হয়ে নিঃসহায়ের মত বসে আছে, বাপের দিকে কিছুটা আশঙ্কা কিছুটা মিনতির দৃষ্টিতে চেয়ে।

পাশের কামরা থেকে এক কুড়ি-বাইশ বছরের নার্স এসে হাজির হয়। সঙ্গে এক যুবক। যুবকটার গলায় স্টেথোসকোপ, চটপটে আর মুখ দেখে মনে হয় খোশমেজাজী। শুভ্রবসনা নার্সের হাতে সাদা এনামেলের এক চৌকোণা পাত্র। তাতে যন্ত্রপাতি, তুলা আর ডেটল। ডেটল-মেশা পানির গন্ধ এমারজেন্সী রুমের আবহাওয়াতে পরিশ্রুতির সম্ভাবনা আনে। নার্সের চোখ নাকে একটু পাহাড়ী পাহাড়ী ভাব। তবে চাউনিটা বেশ মিষ্টি। চাউনিটা সুযোগ পেলেই যুবক ডাক্তারের দিকে ধাবিত হতে চায়।

গওস আর দেরি করে না। তখুনি ডাক্তারের দিকে ধাওয়া করে নাসরীনের অবস্থার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। —দেখেন প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে রক্ত পড়ছে। আর দেরি হলে খোদা না খাস্তা...

—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন। স্মিত ভঙ্গীতে ডাক্তার বলে। গওস ডাক্তারকে সবিস্তারে সব কিছু জানায়।

ডাক্তার তখুনি তৎপর হয়ে ওঠে ঃ আচ্ছা পাশের কামরায় নিয়ে আসেন, আমি এখুনি দেখছি। পাত্র ও যন্ত্রপাতি ধুয়ে কাচের আলমারিতে তা রাখবার সময় একটা যন্ত্র নার্সের হাত থেকে ফস্কিয়ে মাটিতে পড়ে ঝনঝন শব্দ করে। সকলে চমকিয়ে সে-দিকে চায়। ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হলে নার্সটা মিটমিটিয়ে হাসে। ডাক্তার পাশের কামরায় যেতে যেতে নার্সকে বলে ঃ মিস নমিতা আপনার কাজ শেষ হলে পাশের কামরায় আসবেন ত। দেখি এ-মেয়েটার কি হয়েছে।

নাসরীন বাপকে জড়িয়ে ধরে ঃ আব্বু আমার পা কাটবে না ত, আমি আম্মার কাছে যাব। আমাকে বাসায় নিয়ে চলো।

- না মা পা কাটবে কেন। আমি আছি না। শুধু বোতলের টুকরাটা বের করে নিবে। তারপরই তোমাকে বাসায় নিয়ে যাবো।

বাপের মুখের দিকে চেয়ে নাসরীন বুঝতে পারে প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। আর সে নিজেও বুঝে বোতলের টুকরো পায়ে রেখে বাসায় ফিরলে যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে না। তবে এ-সময় আম্মাটা থাকলে ভাল হোত।

পাশের কামরায় গিয়ে নতুন এক মুখ চোখে পড়ে। মেয়েটার বয়স বোধ হয় নাসরীনের কাছাকাছি হবে। মুখটা ফোলা, চুলে লালচে জট্ পাকিয়ে গেছে, তালি-দেওয়া ফ্রক ময়লা ও দুর্গন্ধে ভরা। চোখটা কোন এক জায়গায় স্থির থাকছে না, চারদিকে কি যেন হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কেমন বিভ্রান্ত মুখের ভাব। এমারজেন্সী রুমে ঢুকবার সময় গওস মেয়েটাকে একবার করিডরে দেখেছিলো কিন্তু তখন খেয়াল করে নি। এখন মেয়েটার উপস্থিতিতে কামরাটা কেমন যেন একটু ভারী হয়ে উঠেছে।

মেয়েটার দিকে নাসরীনও কেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সুযোগ পেলেই আলাপ করবে এমন ভাব।

নার্স নাসরীণের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে আর সঙ্গে সঙ্গে তাজা রক্ত দরদর করে পড়তে থাকে। গওস সেদিকে আর তাকায় না।

নার্সের সাহায্যে ডাক্তার ততক্ষণে নাসরীনকে চলমান-টেবিলে পাতা বিছানাতে শুইয়ে দেয় তারপর যেখানে বোতলের টুকরোটা

আটকে আছে তার দু-পাশের নরম পেশীতে দুই হাতের আঙুল দিয়ে চাপ দেয়।

নাসরীন ব্যথায় চিনবিনিয়ে ওঠে।

তা উপেক্ষা করে ডাক্তার নার্সকে কি সব যন্ত্রপাতি আনতে বলে। সেই ফাঁকে ফোলা ফোলা মুখওয়ালা মেয়েটা খুব ক্লান্ত ভঙ্গীতে নিজের শরীরকে কামরার পশ্চিম কোণের 'বেসিন'টার দিকে টেনে নিয়ে যায়। কল খুলে পানি খাবার যখন উপক্রম করছে তখন পেছন থেকে নার্স তার খনখনে গলায় খেঁকিয়ে ওঠেঃ এই হারামজাদী দিলো রে জলটা নষ্ট করে, কুষ্ঠ রোগ নিয়ে হাসপাতালে জল খাবার সখ হয়েছে, তখন থেকে আমার পেছনে ঘুরঘুর করছে। কেন আমি কি তার মা হই, না বোন হই? বলে কি না আমাকে ওষুধ দাও। এটা কি কুষ্ঠ হাসপাতাল যে ওষুধ দিবো বা ভর্তি করে নিবো। ভাগ ওখান থেকে। ভাগ ভাগ।

কল থেকে পানি একটু একটু করে গড়াতে থাকে কিন্তু মেয়েটার পানি খাওয়া হয় না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চোখ নামিয়ে সেখান থেকে সরে যায়।

নার্সের নরম চাউনি দেখে তার সম্বন্ধে গওসের মনে যে ধারণা জন্মেছিলো তা নিমেষে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। ডাক্তারের দিকে অনেকটা বিজয়িনীর দৃষ্টিতে চেয়ে—দেখলে ত আমার তম্বির কি ফল—নার্স যন্ত্রপাতি আনতে এগিয়ে যায়। নাসরীন বিছানা থেকে তিরস্কৃত মেয়েটার দিকে গভীর বেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রোগটা কুষ্ঠ না হলে গওসও মমতার প্ররোচনায় মেয়েটার দিকে এগিয়ে তাকে আদর করে দিয়ে আসতো।

নার্স ফিরে এসে শায়িতা নাসরীনের পাশে, ডাক্তারের প্রায় গা ছুঁয়ে, দাঁড়ায়। সেখান থেকে সহসা নার্সের চোখ কোণার চেয়ারে বসা গওসের বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের উপর পড়ে। গওসের শরীরের যতটা দেখা যায় নার্সের চোখ বেশ কিছুক্ষণ তা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়, যেন অন্য এক পুরুষে নার্স নতুন এক সম্ভাবনা দেখেছে।

সে-দৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় গওসের মধ্যেও পৌরুষের কীট চাড়া দিয়ে ওঠে কিন্তু নাসরীনের কচি মুখে প্রতীক্ষার ভীতি দেখে শরীরটা আবার বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

নার্সের চোখ আবার পরিচিতি আশ্রয়ে ফিরে আসে কিন্তু মনের নীরব খেলায় কৌতুককর এক ছেদ পড়ে। কোথা থেকে এক বড় লালচে-কাল মাছি ভনভনিয়ে এসে মুহূর্তের জন্য নার্সের নাকের বড় ছেদায় সোজা ঢুকে পড়ে আর নার্স দেয় প্রচণ্ড এক হাঁচি। তাতে ডাক্তারের মুখে স্বাস্থ্যকর এক হাসি তুমুলভাবে ফেটে পড়ায় নার্সকে বেশ মনঃক্ষুণ্ণ মনে হয়।

নাসরীনও ফিক্ করে হেসে দেয়, কিন্তু গওস হাসি দিয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চায় না। পরের দুই মিনিট জমাট বিভীষিকা। ডাক্তার ছেদহীন একাগ্রতায় যন্ত্রপাতি ও হাত ব্যবহার করে চলেছে আর নাসরীন চাৎকারের বিভিন্ন পর্দা তুলে গওসের বুকের পাঁজরাকে পর্যন্ত বিকল করে দিচ্ছে। ওঃ খোদা, এ-যন্ত্রণাটা আমাকে দিলে না কেন।

নিজের কাজ নিপুণ কৌশলে সেরে ডাক্তার গওসকে আশ্বাস দেয়ঃ বোতলের টুকরাটা আর একটু ভিতরে গেলেই বড় রকমের এক অপারেশন লাগতো। এখন আর কোন ভয় নেই, পুরো টুকরাটা বেরিয়ে এসেছে। একটা প্রেসক্রিপসান লিখে দিচ্ছি।

এন্টিটিটেনাস ইনজেকশান আর একটি এন্টিবাইওটিক। সাত দিন পরে আবার নিয়ে আসবেন '

—কাচের কোন টুকরা ত রয়ে যায় নি? ভয়ে ভয়ে গওস জিজ্ঞেস করে।

—এই দেখেন না আস্ত কাচের টুকরাটা। বলে ডাক্তার সাদা এনামেলের পাত্র থেকে এক যন্ত্র দিয়ে গাঢ়-সবুজ বোতলের টুকরাটা গওসের সম্মোহিত চোখের সামনে তুলে ধরে।

—হাজারো শুকরিয়া ডাক্তার সাহেব, খুব উপকার করলেন।

—এ'ত আমাদের ডিউটী। ডাক্তার গুরুগম্ভীর স্বরে বলে।

—আপনার মেয়েটা বেশ মিষ্টি, কি খুকী এখন ত আর কোন কষ্ট নেই। নার্স সহাস্যে একবার বাপ একবার মেয়ের দিকে চায়।

নাসরীন ফিকে ধরনে হাসে; নার্সকে সম্বোধন করে গওস বলে : আপনাকেও ধন্যবাদ।

বাপমেয়ে একত্র হলে নাসরীন অপ্রত্যাশিত এক প্রশ্ন করে : ও মেয়েটা কোথায়, আব্বু।

গওস অন্য মেয়েটার কথা সত্যি বলতে কি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলো; নাসরীনের প্রশ্নে কামরার চারদিকে চেয়ে দেখে মেয়েটা না পাত্তা। তাই নির্বিকার স্বরে বলে : জানি না মা, বোধহয় বাসায় গেছে। তুমি চেয়ারে এখন বসে থেকো মা মণি, ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপসান লেখা হলে নিও। আমি ততক্ষণে একটা স্কুটার নিয়ে আসি।

—স্কুটার নয় আব্বা, বড় ঝাঁকানি দেয়। রিক্সা এনো।

বেরিয়েই রিক্সা পাওয়া যায়। ফিরে এসে গওস ডাক্তার ও নার্স দুজনকেই আবার ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মনে মনে তাদের মিলনের পথ সুগম হোক সেই কামনা করে নাসরীণকে কোলে তুলে নেয়। পূর্ণ স্বস্তির হাসি হেসে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে : চলো তোমার আম্মার কাছে যাই।

গেট পেরিয়ে বাঁ দিকে ফলের 'স্টল'। আঙুর আর আপেল আর শুকনো ফল। নাসরীন আঙুর খেতে ভালবাসে মনে পড়ায় গওস রিক্সাওয়ালাকে থামতে বলে। ছয় টাকা দিয়ে আধা সের আঙুর কিনে ফেলে. দু একটা ফল চাখবার পর। আঙুর পেয়ে ঢলঢলে খুশিতে নাসরীনের মুখ ভরে ওঠে।

তখন ওই মেয়েটাকে আবার দেখা যায়। ঢিমে তালে মাথা নীচু করে কোথায় যেন চলেছে। এবার নাসরীন রিক্সা থামাতে বলে : আব্বা ওকে কিছু আঙুর দিয়ে দাও। বেচারী পানি খেতে পায় নি।

এই এতক্ষণ ধরে গওসের মনে যে রদবদল হচ্ছিলো তা নাসরীনের কথায় ঝলক খেয়ে চেতনায় আলোর প্রস্রবণ হয়ে দেখা দেয়। নাসরীনের প্রতি যে স্নেহ হৃদয়ে টগবগিয়ে ফুটছিলো তা মহৎ এক চিন্তায় ভোল বদলায়। সেই প্রত্যাখ্যাত মেয়েটাকে আঙুর দিতে গিয়ে হৃদয়ে সমুদ্রের জোয়ার অনুভব করে : বিধির সামান্য ইঙ্গিতে নাসরীনের সঙ্গে সহজেই মেয়েটার রদবদল হতে পারতো।

কিন্তু নিজের চিন্তার বিরাটত্বে ভড়কে গিয়ে গওস ডান হাত দিয়ে নাসরীনের সমস্ত শরীরটাকে পিতৃত্বের অধিকারের ব্যাকুলতায় বেষ্টন করে রাখে—যেন সেই সম্ভাবনাকে তার বর্তমানের সমস্ত নিশ্চয়তা দিয়ে সে প্রতিরোধ ও চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করছে।

প্রত্যাখ্যান

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইউনুসের মনটা বড় দমে যাওয়া আরম্ভ করেছে। যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে যে উন্মাদনা তা বিয়ের পাঁচ বছর পরে তরল হতে চলেছে। টেরেলিন টেট্রন ইত্যাদি শার্ট ও প্যান্টে আগেকার সে অভিনবত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না; এমন কি ভোকসওয়াগনের নির্ভর ক্ষিপ্রতা ছাড়িয়ে তার সামনের দিককার বেহায়াপনা এখন বেশী করে চোখে পড়ে। সূর্যের বাড়ন্ত তাপে শেষ-শীতের হিমেলী হাওয়ায় যখন বসন্তের আমেজ আসে বা পাশের বাড়ীতে বেগুনী অর্কিড হেসে খেলে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় তখন মনটা হায় হায় করে ওঠে। নিজের কোন কাজে বা সামাজিক কোন উদ্যমে সৌন্দর্য বা বিস্তার কোন প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাজগোজ করে বউ সিনেমা দেখবার জন্য, নেহাৎ এক খেয়ালের চক্করে পড়ে, যখন তৈরি হয়ে আসে তখন অমোঘ নিয়তির মত টেলিফোনটা বেজে উঠে।

বউ বিরস মুখে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়—সিনেমা দেখা পণ্ড হোল বুঝি এবং এক সেকেণ্ডে 'হ্যালো' বলে মুখে ঝামটা দিয়ে টেলিফোনটা রিসিভারে রেখে স্বামীকে বলে ঃ নবী সাহেব।

বড় কর্তার আহ্বানে ইউনুস তাড়াতাড়ি টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে যায় ঃ সালাম ওলায়কুম, ইউনুস বলছি।

—ওলায়কুম। একবার আসতে হয় ইউনুস সাহেব, দরকারী এক কাজ আছে। এখনই পারলে চলে আসুন।

—আচ্ছা আধঘণ্টার ভেতর আসছি। সালাম ওলায়কুম।

—ওলায়কুম।

বউ ভয়ানক ভাবে মুখটা বিটকায় ঃ কি যে বিড়ীয়ালার এখনে চাকরী নিয়েছো। যখন তখন ডেকে পাঠায়। যেন তুমি তার কেন গোলাম।

মাসে মাসে হাজী সাহেব কি আর দেড় হাজার টাকা এমনিই দিচ্ছে, কিছুটা গোলামী ত করতেই হবে।

—তামার মত এত গোলামী আর কাউকে করতে দেখি না। আর সকলকে দেখো না বউদের নিয়ে কেমন ঘুরে বেড়ায়।

—যাদের দেখো তারা হয় বড় সাহেব কি সি এস পি। তাদের কথা আলাদা। আহা, তাদের ঘরের বেগম যদি হতে। বলে ইউনুস বউ এর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে যায়।

হাজী নবী সাহেন গ্র্যাণ্ড টোবাকো কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। সারা জীবন বিড়ির ব্যবসা করে গত পাঁচ বছর ধরে সিগ্রেটের দিকে মন দিয়েছেন। হিন্দুস্থান থেকে টেণ্ডু পাতার আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাজারে 'পল্টন' সিগ্রেট ছেড়ে শুধু গত বছর পঁচিশ লাখ টাকা লাভ করেছেন—ইনকাম ট্যাক্সে হিসাব দাখিল করবার সময় তা অবশ্য পনেরো লাখে নেমে গিয়েছিল।

ইউনুস এসে দেখে নবী সাহেব তাঁর বসবার ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন, ঠোঁটের খুথু-ভেজানো কোণে 'পল্টন' সিগ্রেট ঝুলছে। বাতাসে কেমন একটা কটু গন্ধ আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক সুরভি। 'পল্টন' সিগ্রেটের ধোঁয়া প্রায় সেন্টের কাজ করে, যদিও ইউনুস নিজে সিগ্রেট খায় না।

—'লালদীঘির' আজকাল বেশ কাটতি হচ্ছে জানেন ত। আপনাকে ওখান থেকে বেশী মাইনে দিয়ে নিয়ে এলাম, তাতে ত ওদের উল্টো লাভ হচ্ছে দেখছি।

কটাক্ষটার সমুচিত এক জবাব জিহ্বার আগায় এলেও ইউনুস তা সামলিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে ঃ বোধ হয় ওরা আরও ভাল লোক পেয়েছে।

—আরে না তা ঠিক নয়। আসলে আমাদের এজেন্টরা গোলমাল আরম্ভ করেছে। চড়া দর না পেলে নাকি মাল ছাড়ছে না, তাতে লালদীঘির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। শেষে আমাদের কোম্পানীতে লাল বাতি না জ্বালিয়ে ছাড়ে।

নবী সাহেবের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে শেষের দিকে তিনি যেন মহার্ঘ এক রসিকতা করেছেন এমন এক ধরন উচ্চারিত করে ইউনুস কৌশলের সঙ্গে হাসে।

সেলস্-ম্যানেজারের প্রতি খুশী হয়ে কিস্তী টুপী মাথার সামনের দিক থেকে একটু উঠিয়ে আবার একটু তেরছাভাবে সেটা বসিয়ে নবী সাহেব পুলকিত নিশ্চয়তায় বলেনঃ আপনি ইউনুস সাহেব নিশ্চয় এর একটা সুরাহা করতে পারবেন। এলাহিগঞ্জে খলিল নাকি ডাকাতি করা আরম্ভ করেছে। দূর সম্পর্কের জামাই বলে এজেন্ট করেছিলাম, তবে সেজন্য ওকে খাতির করবার দরকার নেই। গলদ পেলে এজেন্সি কেড়ে নিবেন সোজা কথা। ব্যবসাতে ওসব জামাই টামাইয়ের কথা ভাবলে চলে না। ও নাকি আবার ইলেকশনে দাঁড়াবার পায়তারা করছে, তবে আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ওটা হতে দিবো না।

—কবে যেতে বলেন। প্রশ্ন করে ইউনুস কল্পনা করবার চেষ্টা করে নবী সাহেবের কেশ-বিরল মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হলে কি রকম দৃশ্যের অবতারণা হবে।

—কালকেই যান. এ-সব ব্যাপারে আবার দেরী করতে নাই। আর শুনেন, ফিরে এলে আপনার সঙ্গে একটা বুদ্ধি করতে হয়। লালদীঘির ফন্দি ফিকির ত আপনার জানা আছে। নিজের ঘর আগে সামলে নি তারপরে লালদীঘিতে কত মাছ আছে দেখে নিবো। বেটা পল্টনের সঙ্গে ইয়ার্কী মারতে আসো। বলে নিভন্ত 'পল্টনে' জোরে টান দিয়ে নবী সাহেব এক মৌতাতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন।

ইউনুস পানি-ভ্রমণ কিন্তু তেমন পছন্দ করে না। ছোটবেলায় সাঁতার শিখতে গিয়ে নাকানি চুবানি খেয়ে আর শামুকের গুগলি দু'একটা গিলে সেই যে পানি সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক হয়েছিলো সাঁতার শেখা হয় নি বলে আজকেও তা যায় নি। কাল রাতে আবার ক্লাবে গিয়ে 'কাচ্চু'তে চার শ' টাকা হেরে এসেছে। দু শ' টাকা নগদ দিয়ে এসেছে। বাকী দু শ' টাকা ধার। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। যেন দুনিয়া থেকে সব রস এক সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু স্টীমার যাত্রা আসলে আত্মার নূতন এক উন্মোচনের মত হোল। দরাজ-দিল হাওয়ার পৌরুষের আঘাতে নদীর ঢেউগুলো উথলে উঠে আলোর প্রস্রবণে হাজারো হাজারো রজত বিন্দুতে বিভক্ত

হয়ে খামখেয়ালী জৌলুসে ছড়িয়ে পড়ছে। দূরের গাছে-ঢাকা আবছা তীরে হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরা এক রমণী অবগাহন-রতা; চরের কিশোরী-ক্ষিপ্রা কাশবনে সোনালী-ঠোঁট এক কালো পাখী শত শত নৌকার পাল থেকে চোখকে ফিরিয়ে নেয়। কুলতলি থেকে লঞ্চে করে এলাহিগঞ্জে যেতে হবে, মেঘনা ছুঁয়ে এক শাখানদী পেরিয়ে। লঞ্চ পাঁচটার সময় ছাড়বে। এখনও ঘণ্টা দেড় দেরী। আসমানে অতর্কিতে একটু একটু করে মেঘ জমা হচ্ছে। তাই দেখে ইউনুসের আত্মা ছোট হয়ে যায়। একবার ভাবলো রাতটা কুলতলিতে কাটিয়ে পরের দিন এলাহিগঞ্জ যাবে কিন্তু কুলতলিতে দেখা গেলো রাত কাটাবার কোন সুবিধে নেই। আর, একদিন দেরী হয়ে গেলো কেন তারও কোন সন্তোষজনক জবাব নবী সাহেবকে ঢাকায় ফিরে দিতে পারবে না। তাই 'চক্রবাক' লঞ্চে আর সমস্ত যাত্রীর পেছনে পেছনে সেও উঠে পড়লো।

নীচের ডেকে অন্তত দেড়শ' জন যাত্রী ঠাসাঠাসি করে বসেছে। উপরের ফার্স্ট ক্লাসে ইউনুস ছাড়া শুধু আর একজন যাত্রী। পঁচিশ-তিরিশ বছরের মাঝ-গড়নের এক ধর্মযাজিকা। সাদা আলখোলা, সাদা মোজা, কাল জুতা। মুখের রঙ ধবধবে সাদা। ইউনুসের উপস্থিতি মৃদু ভাবে মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করে বসে পড়লো, হাতে এক বই।

বন্দর ছাড়বার ঘণ্টা বাজিয়ে 'চক্রবাক' ছেড়ে দিলো সমস্ত লঞ্চে এক থরথরানি কাঁপুনি জাগিয়ে। বেশ জোরে বাতাস দেওয়া আরম্ভ করেছে, হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে মাফলার বের করে ইউনুস তা গলায় লেপ্টিয়ে বাধলো। ইউনুস যেখানে বসেছে সেখান থেকে আসমানের সামান্য এক অংশ দেখা যায়, মেঘে তরল-কাল। লঞ্চ একটু একটু দোলাও আরম্ভ করেছে। তবে ঘাবড়াবার মত নিশ্চয় কিছু নয়, নইলে নীচের থেকে গানের চাপাসুর ভেসে আসতো না: দয়াল আল্লা পার করে দাও...

নীচের ডেকে গল্পও জমেছে ভাল।

—এবার লাইসেন্স পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

—কেন, টাকার জোর থাকলে হয় না এমন কোন কাজ আছে। না আশরাফ, নূতন সাহেব বড় কড়া। টাকা দিয়ে তাকে নাকি নড়ানো যায় না।

—সাহেব বুঝি কম টাকা নিয়ে হাত ময়লা করতে রাজী নয়। রেটটা একটু বাড়িয়ে দাও, দেখবে সব মুস্কিল আসান। আশরাফ ঘোষণা করে।

—দু'একজনে তা করে বিপদে পড়েছে, তাই ও-পথ আর মাড়াই নি। তবে বুদ্ধি একটা করেছি।

—টাকা ছাড়া আবার বুদ্ধি হয় নাকি।

হয় হয়, কার কি মর্জি মেজাজ তা আগে জানতে হয়, পরে দিতে হয় দাওয়াই।

—তা দাওয়াইটা কি দিলে।

—তিন বোতল হুইস্কী! আজকাল বাজারে পাওয়া যায় না, বহু কষ্ট করে যোগাড় করেছি। শুনে এলাম সাহেব নাকি আমার দরখাস্ত বিবেচনা করে দেখবেন। অন্যদিকে এক মা তার ছেলেকে ফুসলাচ্ছেঃ জানালার অত কাছে বসিস না আমার সোনা, ঠাণ্ডা লাগবে বা'জান। আয় আমার কোলে বসবি বাবা। মাঘ মাসের ঠাণ্ডাতে সর্দি কাশি ধরলে বড় অসুখ হয়ে যেতে পারে, নয়নের মণি আমার। কথা শোন আব্বু। উপরের ডেক থেকে মায়ের ফুসলানি শুনে ইউনুস ভাবে সঙ্গে বোধ হয় বাপ নেই। নইলে ধমকিয়ে ছেলেটাকে সায়েস্তা করে দিতো।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক গলা ভেসে আসেঃ আমি চোখে দেখতে পাইনা বলে ভাতারখাগী মাগী কি সব নষ্টামি আরম্ভ করেছে। আমি তার শ্বাশুড়ী আর আমাকে চুল ধরে হেঁচকা টেনে তার নাগরের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বসত বাটি বিসর্জন দিয়ে বোষ্টমী বনে গেছে। অঙ্গে অঙ্গে পোকা ধরবে, অত রস পার্বতীরও সয় না গো।

হঠাৎ বাতাস ও ঢেউ-এর দাপাদাপি আরম্ভ হয়ে যায় আর সব কলরব ক্ষান্ত হয়। শিশ দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বেগে ধেয়ে এসে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়ে আর ঢেউ ফণার মত ফুঁসিয়ে উঠে লঞ্চে হরদম তার গরল ঢেলে দিতে থাকে।

—হায় আল্লা কি হবে, শফদরের বাপকে যে আর দেখতে পাবো না।

—এই সারেঙ লঞ্চ থামাও, লঞ্চ থামাও।

—চলো কেবিনে যাই। এখানে পানি এলে আর রক্ষে নেই। উপর থেকে তাও লাফ মেরে পড়তে পারবো। এখানে যে দম আটকে মরে যাবে গো।

—দাও মদ ঘুষ, এখন মজাটা টের পাবে।

—খানকীমাগীর নদীতেই বাসর-শয্যা হবে।

—ছুটফটাইস নে আব্বু, বুকে তোকে ধরেছি বাবা, তোর কিছু হবে না।

উপর থেকে ইউনুস দেখে সারেঙ মস্ত এক লাঠি আর দুইজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে নীচের ডেকের বেরুবার দরজায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে-সব যাত্রীরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলো তাদের আচ্ছা করে পিটিয়ে ভেতরে ঠেলে দরজাটা সারেঙ বাইর থেকে বন্ধ করে দেয়।

—হারামজাদা বেকুবরা লঞ্চ ডুবানার তালে আছে। ফুল স্পীড্ দাও। সারেঙ গরজায় আর আদেশ করে।

নীচে যাত্রীদের গরজানি বাতাসে খণ্ডিত হয়ে ভেসে আসেঃ এই খুপরীতে যদি ডুবে মরি সারেঙ বেটাকে একবার দেখে নিবো।

—হারামির পোলা লাঠি দিয়ে এমন বাড়ী দিয়েছে যে কানে এখন কিছু শুনছি না।

ইউনুস ততক্ষণে নিজের মনের সঙ্গে মোকাবেলা করে। বাতাসের বেগ ও ঢেউ-এর ঝাপটা দেখে মন আশঙ্কায় একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে লঞ্চ-ডুবি হতে পারে। তবে সারেঙ্গের দক্ষ পরিচালনায় মাঝারি আকারের লঞ্চটা যে-ভাবে নদীর উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তাতে লঞ্চ ও সারেঙ দু'জনকেই মোবারকবাদ দিতে ইচ্ছে করে। ছাই-রঙা আসমান থেকে মেঘ ও পানি অনবরত নেমে এসে নদীকে একেবারে বেসামাল করে ফেলেছে আর তার রাগ নদী লঞ্চের উপর নিক্ষেপ করছে ঢেউ-এ ঢেউ-এ বিস্ফোটিত হয়ে।

এই অবস্থায় যতটা ভয় হওয়া উচিত ছিলো ধর্মযাজিকার মুখে তার কোন চিহ্ন না দেখে ইউনুস নিজের ভয় অনেকটা দমন করবার চেষ্টা করে। আরও কত যাত্রী আছে তাদের জানের কিমৎই বা একেবারে কম কি। যে-শিশুকে মা ফুসলাচ্ছিলো তার কথাও এখন মনে হয়। লঞ্চ যদি শেষ পর্যন্ত ডুবেই যায় তবে মায়ের সঙ্গে ছেলেও ত, বেচারা দুনিয়ার তেমন কিছু দেখলোই না, শেষ হয়ে যাবে। ব্যভিচার ও ঘুষের সঙ্গে সরল হাসিও লয় পাবে। ইউনুসের নিজের ত ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে। জীবনের বেশ কিছু স্বাদ গ্রহণ করবার সুযোগ হয়েছে। বি কম পাস, চাকুরী, বউ, ছেলে,

গাড়ী পর্যায়ক্রমে এসে মনকে দিয়েছে বিচিত্র অনুভূতির ঘ্রাণ। এখন অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের প্যাঁচে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে ভোকসওয়াগন বিক্রি করে টয়োটা কেমন করে কেনা যায় সেটাই দাঁড়িয়েছে মহৎ এক খায়েশ।

এই প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপ্টার মধ্যেও কোথা থেকে এক কাক উড়ে এসে কেবিনের জানলায় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করছে। বাইরে বিপর্যস্ত প্রকৃতির সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাতের পর হয়রান হয়ে অস্তিত্বের প্রবোধ পেতে চায় যেন।

ছেলে ফরিদের কথা মনে হয়। ঘুম থেকে উঠে বাপকে দেখেই হেসে দেয়। গূঢ় এক অনুমোদনের পরশ তাতে পাওয়া যায়। ছেলে একটু কাঁদলেই মনটা ছ্যাঁত করে উঠে। একটু বমি করলো কি পেট ফাঁপাতে চীৎকার আর অমনি ইউনুসের প্যালপিটেশান আরম্ভ হয়ে যায়। ছেলের সমস্ত অসুবিধা তার উপর দিয়ে যাক তখন মনে সেই মানৎ জাগে। লঞ্চ ডুবে ইউনুস যদি মারা যায় তবে বউয়ের মনে কতটা দুঃখ কতদিন থাকবে বলা যায় না। কয়েক-দিন মন নিশ্চয় বেশ-কিছু খারাপ থাকবে, বিশেষ করে এই শীত-কালে লেপের তলায় স্বামীর অভাব অনুভব করবে। তারপর ধীরে ধীরে ইনসিউরেন্স---চল্লিশ হাজার টাকার এক পলিসি আছে---আর ভোকসওয়াগনের কল্যাণে মন অনেকটা বশ মেনে যাবে। পরে হয়ত বা শাঁসালো এক স্বামীও জুটে যেতে পারে।

প্রেম জিনিসটা কি তার স্বাদ ইউনুসের কাছে অজানা। তার যে আলাদা কোন স্বাদ আছে তাও সে জানে না। বউএর সঙ্গে প্রেমের ছবি দেখেছে প্রেমের গান শুনেছে---কিন্তু যে তাপ দাহন ও সুধা তাতে থাকে বলে শুনেছে নিজের অন্তরের মোচড় খেয়ে ইউনুস তা কখনও অনুভব করবার সুযোগ পায় নি। ডুবে মরে গেলে তার নিজের সে-অনুভূতি অচেনাই থেকে যাবে তবে বউ হয়ত তা একদা অনুভব করবে। আমি মরে যাবো আর বউ বেটী মওজ করবে---আমারই খাটে, আমারই গাড়ীতে চড়ে। আমোদ আহ্লাদে যৌবনের তাড়া নুতন করে অনুভব করবে আর বেগমের দেমাকে বায়তুল মোকাররমে সেণ্ট সাবান কি স্টেডিয়ামে পাবনাই শাড়ী কিনতে যাবে। আর নদীর তলায় তখন আমার পচতে-থাকা শরীর থেকে কোন বড় মাছ হয়ত চোখটা আলাদাভাবে ঠুকরে খাবে।

প্রবলভাবে লঞ্চটা দুলছে। কাকটা জানালা থেকে ভেতরের দিকে নেমে এসে ধর্মযাজিক'র পাশে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। হঠাৎ খেয়াল হয় ধর্মযাজিকা বেশ সুন্দরী। কাকের পর্যুদস্ত কালো অবয়বের পাশে তার আভ্রাস্থ মর্ম্মর-শুভ্র মুখ মনকে নির্মলতার তৃষ্ণায় ভরে দেয়। এখন হাতে আর বই নেই। শুধু তন্ময় বিশ্বাসের প্রগাঢ় নিশ্চয়তা। কাকের সহ-অস্তিত্ব প্রশান্ত ঔদার্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছে। সঙ্গে যে একজন পুরুষ সহযাত্রী আছে সে-চেতনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

পাশ থেকে ধর্মযাজিকাকে দেখতে দেখতে ইউনুসের মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায় আর তার শরীরটাও একটু উষ্ণ হতে থাকে। সব অতীত সব সংস্কার ভুলে গিয়ে এক ঝলকে ইউনুসের মনে হয়ঃ বাড়ন্ত বয়স হলে হবে কি এই নারীর রমণীয়তা এখনও ছেঁচে বের করা যায়। এমনই হতে হয় নারীর মুখ, অতীতের সব রূপসীর সম্মিলিত ছাঁচে ঢালা। এতক্ষণ তার সাদা আবরণে ধর্মযাজিকা ঢাকা ছিলো, এই মুহূর্তে ইউনুসের চোখে নারী হয়ে তার আবির্ভাব হয়েছে।

বাইরে বাতাসের ঝাপটা তখনও অপ্রতিহত আর লঞ্চের গোঙানিতে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত। সম্পূর্ণ বিলয়ের সম্ভাবনা মনকে আকাঙ্ক্ষার আতঙ্কে তীক্ষ্ণভাবে উদ্যত করে তুলেছে। ফেলে দাও তোমার আবরণ, পরিহার করো লজ্জা, আদিম এক অভিসারে সম্মতি দাও। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে তুমি মনে কোন কুণ্ঠা রেখো না। আমাকে দয়া করো।

ধর্মযাজিকা হিমের মত শীতল হয়ে নিজের তুহিন শুভ্রতায় আশ্রয় নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত কাকের দিকে গভীর মমতার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর বাতাসের ঝাপটা যখন একটু কমতে থাকলো তখন পেছন ঘুরে ইউনুসের দিকে চেয়ে অনবদ্য এক হাসি হেসে গভীর প্রবোধের স্বরে বললো ঃ আর ভয় নেই, বিপদ কেটে গেছে।

ইউনুস উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে ধর্ম-যাজিকা কিছুটা রক্তাভ মুখে সেই বইটা তুলে নিয়ে আবার ঘুরে বসেছে—যেন ইউনুসের প্রত্যাশা-বিক্ষুব্ধ চাউনি দেখে তার মনের আলোড়ন সে টের পেয়েছে।

খালাস

পরিবারের সঙ্গে বহুদিন কোন যোগাযোগ নেই। শেষ চিঠি এসেছিলো তিন সপ্তাহ আগে। মেয়েটার ঘুসঘুসে জ্বর হয়। বদ্যি পথ্যিতে কিছু কাজ হচ্ছে না। ছেলেটার উৎপাতে নাসিমাকে বাপের কাছে বড় বিব্রত বোধ করতে হয়। বাপের এমনি অকুলানের সংসার, তার উপর ছেলেটার খিদে কিছুতেই বাগ মানে না। পরন্ত, মাঝে মাঝে গ্লাস পিরিচ ভাঙে। বরকত যেন তাড়াতাড়ি আরও কিছু টাকা পাঠায়।

চিঠি পেয়ে বরকত অবশ্য টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডার করে দুই শ' টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলো; প্রাপ্তি সংবাদ এখনও পায় নি। শালার টাকাটা ঠিকমত পৌঁছেছে কি না কে জানে। এখন টাকাটা কেউ মেরে বসলেও খোঁজ খবর করে কোন কূল কিনারা পাওয়া যাবে না। উল্টো ফ্যাসাদ হতে পারে।

বন্ধু বান্ধব যে দু'একজন আছে তারাও আসে না। নিজেকে নিয়েই চারদিকে সামাল সামাল ভাব। মিলিটারী কখন আসে, কাকে ধরে নিয়ে যায়, আঁচ করা মুস্কিল! অতর্কিতে দেখা হলেও কথা হয় অত্যন্ত মামুলী ধরনের। যেন প্রাণ খুলে কথা বললে অদৃশ্য কিন্তু সদা-উপস্থিত কোন শক্তি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে। তারপর কেউ ফিরবে, কেউ লাপাত্তা।

সপ্তাহে দু'এক সন্ধ্যায় এখনও তাস খেলা হয়। মদ খাওয়ার চেয়ে তাস খেলাতেই বরকত জুত পায় বেশী। 'ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট' কিম্বা 'সিগ্রাম ভি' পান করলে ক্লান্ত সন্ত্রস্ত স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে কেমন এক খুশির ভ্রম আনে, কথায় দেখা যায় স্ফুলিঙ্গ। হতাশা হয় আবেশে দমিত। কিন্তু সে-প্রত্যয়ের ভাবটা ক্ষণিক।

পরে নিরাশা হৃদয়কে আরও কুরে কুরে খায়।

তাসের আমোদ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। হারজিতের দোদুল দোলায়, খেলোয়াড়দের রকমারী মেজাজে, ঘনীভূত নেশার বিশুদ্ধ তন্ময়তায়। শালা হারামি প্রভৃতি প্রীতি সম্ভাষণে পরিবেশ এত গুলজার হয়ে ওঠে যে বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ সরে যায়।

সাময়িকভাবে। পরের দিনই শোনা যায় রব তিনদিন ধরে নিখোঁজ। তার বউ ক্রন্দসী হয়ে পরিপাটি শাড়ীতে দু'একটা অসতর্ক ভাঁজ ফেলে বরকতের কাছে ছুটে আসে। আত্মনির্ভরতার নিপুণ কমণীয়তা সব জলাঞ্জলি দিয়ে, চোখের কোণে না-মোছা পিচুটিতে মানবীয় হয়ে, দীন মর্মভেদী আবেদনের স্বরে বলেঃ এক কর্ণেল ত বরকত ভাই, আপনার বন্ধু। ওকে বলে আমার ভাই একটা ব্যবস্থা করে দেন। আপনার বন্ধু জানেন ত কিছুর মধ্যেই থাকে না। যেমন করে পারেন ওকে ছাড়িয়ে আনেন।

দুঃখ যখন পরিচিতা এক শ্রীময়ী হয়ে দেখা দেয়, যদিও তার নাভি ব্লাউজের তলায় দৃশ্যমান, মনকে কেমন নাড়া দেয়। অথচ কয়েকদিন আগে বকসীবাজারে তালগোল পাকানো দু'টা বীভৎস মৃতদেহ দেখেও মনে তেমন কোন অনুভূতি জাগে নি। একজনের পা ছিলো নর্দমার কালচে নীল কাদায়, বাঁ চোখ ঠিকরিয়ে বেরিয়ে এসেছে; অন্যজনের মাথায় চুল আলাদাভাবে অত্যন্ত জীবন্ত মনে হচ্ছিলো। সব বৃত্তান্ত জেনে বরকত ছল করে এক সান্ত্বনা দিলো ঃ খোঁজ করে দেখি, আপনি অত উতলা হবেন না।

খোঁজ অবশ্য করে নি। রবের বউ ঠিকই বলেছিলো বরকত এক কর্ণেলকে চিনে। পাঞ্জাবী। নাম শোভান আলি। নামের দিক থেকে বাঙালী হতেও কোন বাধা ছিলো না। তবে বাহ্নচোদ এক নম্বরের হারামি। মদ ও মাগী সরবরাহ করে বরকত তার দোস্তি আদায় করেছিলো। তারই কল্যাণে তার নিজের নিরাপত্তা এখনও বজায় আছে। হারামির দোস্তির উপর বেশী চাপ দিলে সে শালাও মদ ও মাগী বেশী চাবে।

পরে জানা গেলো রবের হাতের চামড়া তুলে মস্ত এক দেকচিতে টগবগে গরম পানির ভেতর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। কথোপ-কথনে এক বেলুচি ক্যাপ্টেন মন্তব্য করেঃ দু'একজন মিসক্রিয়েণ্টকে

এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে ইণ্ডিয়ার ফেউরা অচিরেই শায়েস্তা হয়ে যাবে।

পিওন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেলো। আবার টাকার তাগিদ নাকি। এখন আর পাঠানো যাবে না, দু' এক দিন তাস খেলায় খুব হেরেছে। শালা নিঃস্ব হওয়ার মধ্যেও একটা নেশা আছে, নিজেকে কিছুক্ষণের মতো এক নায়ক বলে মনে হয়। তবে চিঠিটা বউ-এর নয়। অন্য আর একজনের হাতের লেখা। পরে পড়লেই হবে। কি আর এমন খবর হতে পারে। এখন রেবাকে ফুসলিয়ে রাজী করাতে হবে শোভান আলির সঙ্গে যেন এক রাত কাটায়। যেমন তেমন নয়। কলেজে সাইকলজি পড়ায়। তবে বরকতের পরিপুষ্ট সঙ্গমে নিমজ্জিতা। খোশ মেজাজে থাকলে মুদ্রার বিনিময়ে অন্যের কাছেও নিবেদিতা। বিনিময়ে শোভান আলির কাছ থেকে একটা কন্ট্রাকট্ যোগাড় করে বরকত বলবে ঃ শোভান আল্লাহ।

'স্ট্র্যাটেজি' টা কাজ করে। বউকে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে মনটাও হাল্কা হয়। মেয়ের ঘুসঘুসে জ্বরের কথা মনে হওয়াতে হাল্কা ভাব তখুনি মার খায়। পঁয়ত্রিশ বছরের বউ ও ষোল বছরের মেয়েকে ঢাকায় আনাও নিরাপদ নয়। শোভান আলি ও তার বন্ধুদের দৃষ্টি কখন কার উপর পড়ে কিছুই ঠিক নেই। হায়রে, দৈনন্দিন স্বস্তি কি আর কখনও ফিরে আসবে না। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চিকণ সবুজ পাতায় রোদে-হাসা লাল জবার মৃদু নাচনের দিকে কি আর কখনও তাকাতে পারবো না। সঙ্গে কেউ থাকলে এখন 'ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট' ঢালা যেতো।

খামের দিকে নজর পড়ে। দেখি না কে লিখলো চিঠিটা। ওমা, শাহানা আপা চিঠি লিখেছে। এতদিন পরে, হঠাৎ। কি খেয়াল হোল। চাচার সম্বন্ধীর মেয়ে। বছর দুই-এর বড় হবে। কৈশোরে যৌবনে বহুদিন ধরে যাওয়া আসা ছিলো। কখনও কখনও লেবেনচুস কিনতে পয়সা দিতো, বরকত যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন শরৎচন্দ্রের 'বড় দিদি' পড়তে দিয়েছিলো। তারপর থেকে বরকত শরৎচন্দ্রকে গিলে খেয়েছে। একদিন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটাও শাহানা আপা পড়ে শুনিয়েছিলো। সে-দিনের স্মৃতি এখনও প্রত্যেক রেখায় অক্ষয়। শরৎ-এর সবুজ-মোহিত বিকেল, হাওয়া যখন একটু

বুঁদ হয়েছিলো, এলোকেশী শাহানা আপাকে মনে হচ্ছিলো যেন এক ভিন্ জগতের নারী। লালপেড়ে শাদা শাড়ীতে তার বিমল সুধা যেন আর একখানা কবিতা হয়ে উঠেছে। তাকে সেদিন শাহানা আপা নিয়ে গিয়েছিলো যোজন মাইল দূরে এক বর্ণ বিধ্বস্ত ও শোভা-মেঘলা দ্বীপে। চিঠিটা খুব বড় নয়। উপরে ডান দিকে তারিখ ও ঠিকানা। মাত্র চারটা ছত্র।

'বহুদিন তোমার কোন খোজ খবর না পাইলেও আশা করি ভাল আছো। আমার একশত টাকার জরুরী প্রয়োজন। সম্ভব হইলে তাড়াতাড়ি পাঠাইও। তোমার নিজের আসিবার দরকার নাই।' একটু রহস্যের ভাব থেকে গেলেও চিঠিতে শাহানা আপার চরিত্রটা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কোন ভ্রান্তি নেই। কোন ভনিতা বা কোন কুণ্ঠা। চিরকুমারী, মেয়েদের এক জুনিয়ার হাই স্কুলের মাস্টারনী শাহানা আপা নিশ্চয় কোন এক গুরুতর বিপর্যয়ে পড়েছে নতুবা এতদিন পরে বরকতকে মনে করবে কেন বা তার কাছ থেকে টাকাই বা কেন চাবে। এখন বোধ হয় বছর চল্লিশ বয়স হবে। বাপ মা থেকে অনেকদিন ধরেই আলাদা। স্কুলের প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অখ্যাত মফঃস্বল শহরে বিশ বছর ধরে আছে। মা বাবা মাঝে মাঝে দেখতে আসে, ছুটিতে পরবে সেও বাপের বাড়ী যায়। প্রথম দিকে বিয়ের কয়েকটা ভাল প্রস্তাব এসেছিলো, সাড়া দেয় নি। আর কোন বৃত্তান্ত জানা নেই।

কৌতূহল প্রবলভাবে চাড়া দিয়ে ওঠে। শাহানা আপার মা বাপের কি হোল, মিলিটারী সেখানেও গেছে নাকি তাদের ঘরদোর পুড়িয়ে দিয়েছে, লোকজন মেরেছে? তার কথাই বিশেষ করে এখন শাহানা আপা মনে করলো কেন, কোন আত্মীয় স্বজন নেই। তার ঠিকানাই বা শাহানা আপা যোগাড় করলো কি করে। হয়ত তার চাচার কাছ থেকে নিয়েছে। নেসেশিটি ইজ দ্য মাদার অব ইনভেনশন। হঠাৎ 'আর কত দূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী' লাইনটা ফিরে এসে মনে এক চিড়িক জাগায়।

দেখতে ইচ্ছে করে শাহানা আপাকে। এতদিন তার শরীর হয়ত বিষম ভোল বদলিয়েছে। তবুও বর্তমানের লোমহর্ষক অনিশ্চয়তার মধ্যে অতীতের এক ললিত স্মৃতি ভবিষ্যতের আশা নতুন করে জাগায়। যাই গিয়ে দেখে আসি শাহানা আপাকে। সেখান থেকে

শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বউ বাচ্চাদেরও খোঁজখবর নিয়ে আসবো। দৃশ্য ও পাত্র পাত্রীর পরিবর্তনে বিকার পঙ্গু মনটাও একটু তাজা হবে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ ধরতে হয়। শীতলক্ষ্যা নদীতে আগে যত নৌকা স্টীমার লঞ্চ দেখা যেতো তার সিকিও এখন চোখে পড়ে না। খাকী উর্দি অবশ্য শীতলক্ষ্যার কিছুটা উছলিয়ে ওঠা স্রোতকে তুষ্ট করছে। মিলিটারীর চালচলন ও ভাবভঙ্গীতে অতিরিক্ত আত্ম-নির্ভরতা ফুটে উঠেছে।

এক অফিসার হঠাৎ বরকতকে ডাক দেয়ঃ এই ইধার আও।

সম্বোধনের চিন্তাহীন রুক্ষতায় আত্মসম্মানে ঘা লাগলেও বরকত এগিয়ে যায়। তিন তারকার ক্যাপ্টেন। চোখদুটো খুব গভীর আর অবাস্তবভাবে নীল। শরীরে বোধ হয় কোন হারামি রক্ত আছে। বাঁ দিকে যেখানে কাল গোঁফের রেখা শেষ হয়েছে সেখানে একটা আঁচিল সুপুরুষ ক্যাপ্টেনকে এক অনুচ্চারিত বন্য ভাব দিয়েছে।

বরকত কাছে এসে দাড়ালে ক্যাপ্টেন বলেঃ কাহা যাতা হ্যায়?

নিজের গন্তব্যস্থান পুরোপুরি ফাঁস না করে লঞ্চ যে---পর্যন্ত যাবে বরকত তা জানায়।

---কাঁহাসে আয়া।

বরকত নিজের বাসার ঠিকানা বলে।

---আইডেনটিটি কার্ড কাঁহা?

বরকত এইবার একটু অসুবিধায় পড়েঃ ঘারমে ছোড়কে আয়া।

---বাঙ্গালী সাব শালা ঝুট বাৎ বলতা হ্যায়। মুক্তিকো মাদাদ কারতা আর বাহার বলতা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। এই মারতোবা সাব কুছ আচ্ছাসে 'পাকিস্তানাইজ' কার দেগা। রেশ্যাল স্টক ভি 'ইমপ্রুভ' কার দেগা।

অপমানগুলো গায়ে না মেখে ক্যাপ্টেনকে ইংরেজী বলতে দেখে বরকতও সেই ভাষার আশ্রয় নেয়ঃ I know Colonel Sobhan Ali quite well. He will tell you everything about me.

ক্যাপ্টেনের মুখে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দেয়, কিছুক্ষণ বরকতকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে শেষ পর্যন্ত বলেঃ All right. You may go now.

লঞ্চ ছাড়লেও মনে গভীরভাবে গ্লানি লেপ্টে থাকে। নিজেকে চরমভাবে অপদস্থ মনে হয়। এই তাহলে আমাদের সম্পর্কে 'ভাইয়া'

দের ধারণা। কি ভ্রমের ফাঁদেই না আমরা নিজেদের গত পঁচিশ বছর ধরে ধরা দিয়েছি। হারামির থুতনিটা যদি থেৎলে দেওয়া যেত। অথচ প্রকৃতি যেন কিছু জানে না এমনিই তার ভঙ্গিমা। হেমন্তের মিষ্টি রোদ সৈকতের ধূসর মমতাকে কেমন যেন বিধুর করে তুলেছে। নুয়ে পড়া বটগাছের প্রাচীন পাতা লাল ফলের প্ররোচনায় কালচে-নীল পানিকে প্রলুব্ধ করে তুলছে। সবুজ-সোনালী আমন ধান সামনে প্রহরীর মত রেখে পেছনে নারকেল সুপারী গাছের ব্যূহে সুরক্ষিত হয়ে এক-গম্বুজ তকতকে সাদা মসজিদ আত্মার গূঢ় এক কামনা হয়ে হঠাৎ দেখা দিচ্ছে।

কলসী কাখে কথা-চটুল হাস্যরত তরুণী যুবতীদের কিন্তু নদীপারে দেখা যাচ্ছে না বা চোখে পড়ছে না খামখেয়ালী খুশির মত্ত কোন কিশোরের কারণহীন উল্লাস। তারা বোধ হয় ওই দূরের কুঁড়ে ঘরেই নিজেদেরকে কোনমতে কুঁকড়িয়ে রেখেছে।

লঞ্চের যাত্রীরাও অস্বাভাবিকভাবে কথা কম বলছে। যা বলছে তা এত নিয়ন্ত্রিত যে তার মধ্যে কোন প্রাণাবেগ বা ঔজ্জ্বল্য নেই।

—এখানে বেশ চরা পড়ে গেল, আগে এতটা ছিলো না।

—দিনকাল ভাল নয়। একজন অসাবধানে একটা মন্তব্য করে সঙ্গে সঙ্গে বড় গম্ভীর হয়ে যায়।

—পুঁটলির মার পেচ্ছাবের ব্যারাম হয়েছে। খালি ঘুম ঘুম ভাব। সারবি কিনা কে জানে।

—ঘাটে গিয়ে পাঁচ ঘণ্টা 'Wait' করতে হবে। বাড়ী পৌঁছতে সেই mid-night. সহসা সারা লঞ্চে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জড়তা ও শঙ্কা কাটিয়ে মুহূর্তের এক উদ্দাম মুক্তি। সারেঙ পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে লঞ্চ-এর শীর্ষে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার উন্মাদনায় শরীক হয় বর্ধিত-বেগ বাতাস। আকাশ হঠাৎ আরো উদার মনে হয়, প্রান্তরের শ্যামলতায় নূতন স্বচ্ছতা আসে, নদীর ব্যাপ্তিতে নিজের এক গহন সাধ ধরা পড়ে।

—এই অঞ্চলটা বিদ্রোহীদের দখলে। পতাকা বদল না করলে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। সারেঙ যেন অদৃশ্য এক উপস্থিতিকে সম্বোধন করে বলে।

আর সকলে বোঝে। যেন মসজিদে নামাজ পড়ছে যাত্রীদের মধ্যে এমন এক গম্ভীর পত ভাব। পাশের বাঁকে স্পষ্ট দেখা

যায়, এক প্যাটরোল বোট। বাঙলাদেশের পতাকা উড়ছে প্রকাশ্য বিক্রমে, চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে এক সহর্ষ মিতালি পাতিয়ে। একদিকে স্টেন-গান ধরে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা ডান তীরের দিকে বাজপাখীর চোখ মেলে চেয়ে আছে, অন্যদিকে আর একজন তরুণ রাইফেল হাতে তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ঃ হয় শত্রু নিধন কিম্বা প্রাণ নিপাত।

অন্তরের সেই গহন সাধ আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কলজে পুড়িয়ে দেওয়া এক প্রবঞ্চনার মত পাকিস্তানের পতাকা নূতন এক বিভীষিকা নিয়ে আসে।

শাহানা আপা যেখানে থাকে সেখানে বাসে করে যেতে ঘণ্টা দুই লাগবে। ঘণ্টা খানেক পরে বাস ছাড়বে। এখানে কয়েকজন আল বদর রাজাকার দেখা যায়। ধর্মের বিকৃত উন্মাদনায় দু' একজনের চোখ অস্বাভাবিকভাবে জ্বলজ্বল করছে। পরণে পিরহান ও পায়জামা, সযত্নে ছাটা দাড়ি ও গোফ মাথায় গোলাকার সাদা টুপি। যে গরীব তার লুঙ্গি ও গেঞ্জী আছে, তৈলাক্ত কিস্তি টুপিটা মাথায় ঠিকমত বসে নি। বাকী সকলে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে। একটা শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ভাব চোখে খুব পরিস্ফুট না হলেও ভেতর থেকে অনুভব করা যায়। বরকতের স্নায়ুও তটস্থ থাকে। বাস যখন ছাড়লো তাদের দলের একজন যাত্রী হয়ে চলেছে। একজনের উপস্থিতিই করাল এক ছায়ার মত বাসের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যাত্রীদের ভঙ্গী আড়ষ্ট, দৃষ্টি সন্ত্রস্ত, কথোপকথন সতর্ক। জনপদ নিরালা। হঠাৎ দেখা যায়, বিলে এক নৌকা, ঝিমুবার ভঙ্গীতে এক প্রৌঢ় বৈঠা বেয়ে চলেছে। বাছুর, মুরগী, হাস, ছাগলও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তাদের বিভিন্ন রবে তেমন কোন ফারাক দেখা যায় না। তবে তাদের সঙ্গের মানুষগুলো কেমন যেন নিস্তেজ।

তারপর নারকীয় বীভৎসতায় চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠে। বোধ হয় আগে বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিলো ; কিন্তু এখন জ্বলে পুড়ে ছারখার। জায়গায় জায়গায় মাটির ঘাস পর্যন্ত পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। বাশের দু' একটা খুটা দেখা যায়। জ্বলতে জ্বলতে ডগায় এসে নিস্তার পেয়েছে মনে হয়, পেতনীর এক ভ্যাঙচানি চারদিকের শ্যামল শ্রীময়তাকে নিত্য টিটকারী দিচ্ছে। এক পুকুর পাড়ে তিনটা লাশ। শেয়াল খাওয়ার পর একটা লাশের বুকের

পাঁজরা দেখা যাচ্ছে, তবে মাথায় চুল আর নাকে দুল দেখে অনুমান হয় এক কিশোরী ছিলো। আর একজন মা, ভক্ষিত নাক ও ঠোঁটের নীচে মলিন দাঁত দেখা যায়, শেষ চেষ্টায় তার নিহত ছেলেকে রক্ষা করবার জন্য তার দিকে নিজের ডান হাত খ্রীস্টের দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। লাশগুলোর পাশে এক বাড়ন্ত কলা গাছ কেমন করে অক্ষত রয়ে গেছে, কচি মোচার গাঢ় বাদামী আভা হৈমন্তিক বিকেলের রোদে বেশ খোলতাই হয়েছে।—ঠিক হয়েছে। 'ট্রেয়টারদের' সকলকে এ-ভাবে থেৎলে পিষে মেরে ফেলবো। ইণ্ডিয়ার ফেউ, ইসলামের দুষমন—আল বদর খোৎবা পড়বার ধরনে বলে। আর সব যাত্রী চুপ থেকে তার প্রতিবাদ করে।

এত দ্রুত ভাব পরিবর্তন, ঘৃণা বিদ্বেষ আশা আতঙ্ক রাগ নিঃসহায়তার জ্বালা পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে বরকতের মনকে কুরে কুরে খেয়ে তাকে একাধিক জন্মের অভিজ্ঞতায় বিভ্রান্ত করে তুলেছে। একক কোন কিছুতেই মন ঠাঁই পায় না। গতকাল পর্যন্ত জীবনে যা ঘটেছে সব কিছুই খণ্ডতায় ভঙ্গুর। আজকেই যেন আত্মার ক্ষণিক উন্মোচন। অস্তিত্বের সওগাত চেতনার গহনতম কন্দরে বোধনের ইঙ্গিত এনেছে।

কিছু দূরে রাস্তার পাশে চা ও মনোহারী দোকান খোলা দেখা যায়। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছুটা খোশগল্পও হচ্ছে, নেড়ী কুকুররাও নিজেদের ভাষায় বচসা ও প্রেমালাপ করছে। মেয়েরা বলতে গেলে সকলে উধাও, তরুণ যুবকরাও পর্দানশীন হয়ে গেছে। এক জনপদের কাছে বাস থামিয়ে আলবদর নেমে গেলো। কালো ছায়া সরে গেলো বটে, তবে আগামী দিনের অনেক আতঙ্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে।

আল-বদর দূরে সরে যাওয়ার পরে এক যাত্রী, তামাটে মুখে দুনিয়ার সমস্ত ভ্যাটকানি মূর্ত করে, বাস থেকে দ্রুত নেমে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সারা শরীরকে আন্দোলিত করে কলেরা রোগীর মত বমি করতে আরম্ভ করে দিল।

শাহানা আপার বাসা খুঁজে পেতে একটু দেরী হয়। পাকা দালানই, তবে চুন-সুরকী খসে-পড়া বিবর্ণ জানালার ডান কোণ ঘেঁষে এক বড় ছ্যাদা, তার পাশেই ঘুণের ঢিপি। ঢিপিতে বেশ কয়েকটা ছিদ্র। সিঁড়ির দু'দিকেই ঘন আগাছা, নাগদেবতারও আশ্রয় হতে পারে।

বরকত সিঁড়ি দিয়ে উঠে কড়া নাড়ে। কিছুক্ষণ কোন শব্দ হয় না। শুধু ভেতর থেকে বিড়ালের এক 'মিউ' শব্দ ভেসে আসে। তারপর কার সতর্ক পদধ্বনি শোনা যায়। বরকতের ধমনী দপ দপ করতে থাকে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে টাকার বাণ্ডিলটা আছে কিনা। আল-বদর যদি সেটা চেতো, বিনা প্রতিবাদে দিয়ে দিতে হোত। তবে শাহানা আপার নসিবই জয়ী হয়েছে। না জানি এতদিন পরে শাহানা আপাকে দেখতে কেমন লাগবে।

দরজা খট করে খুলে গেলো, তবে এ-মুখ ত শাহানা আপার কিছুতেই হতে পারে না। সিটকানো চামড়া। বেঢপ থলথলে শরীর, কুঁচকানো চোখ।

—শাহানা আপা আছেন? কিছুটা অনিশ্চিত ধরনে বরকত জিজ্ঞেস করে।

—আছে, আস্তে কথা কও বাবা, মেয়েটার শরীর ভাল নেই।

শব্দ না করে সন্তর্পণে চৌকাঠ পেরিয়ে বরকত ভেতরে ঢুকে। একটাই চেয়ার। তা-ও বাঁ-দিকের হাতল ভেঙ্গে গেছে। তাতে কিছু পাঠ্যপুস্তক সাজানো। সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ঝুল জমেছে। এক কোণে মাকড়সা দিব্যি স্বস্তির সঙ্গে জাল বুনছে।

—সব কিছু মিলিটারী লুট করে নিয়ে গেছে। মেয়েটার অবস্থা দেখলে বুক ফেটে কান্না আসে। এমন অবস্থা অথচ বাপ-মাকে পর্যন্ত খবর দেয় নি। তুমি বুঝি কোন আত্মীয় গো।

—কার সঙ্গে কথা বলছো মাজেদা ফুপু? ভেতর থেকে যে স্বর ভেসে আসে এতদিন পরেও বরকতের মনে যেন প্রলেপ জুড়ে দেয়।

—তোমার এক আত্মীয় এসেছে গো। নাম ত শুধাই নি।

—আমি বরকত, শাহানা আপা?

—বরকত নাকি। তা তোমাকে নিজে আসতে কে বলেছিলো? স্বরে বিরক্তির সঙ্গে একটু সঙ্কোচও ধরা পড়ে।

—কতদিন তোমায় দেখি নি শাহানা আপা। তোমার একটু খোঁজ-খবর করতে আসা কি মানা।

—বউ-ছেলে-মেয়ে কেমন আছে। বাসার খবর সব ভাল ত? ভেতর থেকে সেই অভিজাত ধরনের গলার স্বর ভেসে আসে; কিন্তু দরজার কড়া খোলে না।

—তোমার জন্য কিছু সঙ্গে এনেছি শাহানা আপা, কিন্তু দরজা খুলছো না ত।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। দুর্বোধ্য ও কিছুটা রোমাঞ্চকর। দৈনন্দিন ঘটনার বাইরে কিছু একটা হচ্ছে বা হতে যাবে।

—মাজেদা ফুপু, তুমি একটু বাইরে যাও ত। আমার আত্মীয়ের সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।

কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও খানিকক্ষণ দ্বিধার পর মাজেদা কামরা থেকে বেরিয়ে ভিতরের অঙ্গনের দিকে যায়। বাইরে দরজা বা জানলায় কান রেখে ভেতরে কি কথা হচ্ছে তা মেয়েলী কৌতূহলে হয়ত শুনবার চেষ্টা করবে।

—টাকাটা এনেছো? ভেতর থেকে শাহানা আপার স্পষ্ট দ্বিধাহীন প্রশ্ন।

—এনেছি।

—আমি দরজাটা ভেতর থেকে একটু ফাঁক করছি, টাকাটা ফেলে দাও।

—তুমি এমন করছো কেন শাহানা আপা? তোমার কি হয়েছে? প্রবল কৌতূহলের চাপুনিতে বরকতের গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

—আমার কিছুই হয় নি, কিন্তু তোমায় আমাকে দেখবার দরকার নেই। শাহানা আপার গলার স্বরে এবার যেন একটু প্রত্যয়ের অভাব।

—কেন দেখবার দরকার নেই, তোমাকে দেখা কি পাপ? তোমাকে দেখবার জন্যই ত এতটা পথ এসেছি। তোমাকে না দেখে কিছুতেই যাবো না। আমি তোমার শত্রু নই—শাহানা আপা।

—দেখতে চাস! শাহানা আপার কথার ধরন বদলে যায় আর কণ্ঠে চাপা রাগের হিসহিসানি।

—নিশ্চয়।

—তবে এক মিনিট সবুর কর।

সেই অপেক্ষমাণ মুহূর্ত বরকতের জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। রহস্য কৌতূহল রোমাঞ্চ প্রত্যাশা দ্বিধা প্রকম্পিত মিশ্রণে এক অসহনীয় তেলেসমাৎ হয়ে মনের উপর প্রচণ্ড হাতুড়ি পিটুচ্ছে। পায়ের তলার মাটিতে হঠাৎ যেন মাতম দেখা দিয়েছে।

—আয় এবার।

ভেতর থেকে খিল খুলবার শব্দ হয় আর দরজাটা ফাঁক হয়ে যায়।

—আসবো? এবার বরকতেরই কেমন যেন অনিচ্ছা জাগে।

—এত দূর থেকে এসেছিস আমার খোঁজ-খবর করতে। এত দরদ তোর। আয় শুয়োর আয়। বরকতের মনে একটু বুঁদের ভাব দেখা যায়। তারই সম্মোহনে টলমলে পায়ে এগিয়ে দরজা আর একটু ফাঁক করে ভেতর ঢুকে পড়ে।

ইয়া আল্লাহ, না, না, মাগো।

শাহানা আপা সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। এক ঝলক সেদিকে চেয়ে বরকত তখুনি চোখ নামিয়ে নেয়। পাশে ক্ষয়-ধরা মলিন মেঝেয় শাহানা আপার শাড়ী-ব্লাউজ পেটিকোট এলিয়ে পড়ে আছে। একটা খাট। একটা ছোট টেবিল, একটা চেয়ার। খাটের নীচে দু'টা স্টীলের বাক্স।

—এখন দেখছিস না কেন হারামজাদা।

চোখ আবার শাহানা আপার দিকে উঠে তার শরীরে আটকে থাকে। আশ্চর্য শাহানা আপার স্তনটা, এই বয়সেও মজবুত রয়ে গেছে আর সারা শরীরে নূতন এক সামর্থ্যের ভাব—কিন্তু মুখে এক এক করে রাগের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে নিভছে। সেদিকে বেশীক্ষণ চোখ মেলে রাখা যায় না।

—দেখ, চোখ ভরে দেখ। মিলিটারী পেট কেমন করেছে, খতিয়ে খতিয়ে দেখ। তারপর ফিরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করিস।

বিমূঢ়, কাতর, পরাজিত দৃষ্টিতে বরকত শাহানা আপার দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর শক্তিশালী চিলের প্রচণ্ড ছোঁ মারবার মতন শাহানা আপা বরকতের দিকে এগিয়ে এসে তার নাক-কান-মুখ খামচিয়ে স্বরে হলাহলের স্রোত উগলিয়ে যান: শুয়োর হারামি, বলেছিলাম টাকা পাঠিয়ে দিতে। এখন এসেছিস যখন, এ-পেটে লাথি মার। মার মার মার।

বেড়া

কায়সার হঠাৎ মাটিতে ঢলে পড়ে মারা গেলো।

... ...

কায়সার হাঁটছে কিন্তু নিজের হাঁটবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। চেতনাও আছে কিন্তু কি রকম পরিবর্তিত যেন মনে হয়। নিজের চেহারা বলে কিছু নেই; শুধু একটা রেখা। মাঝে মাঝে তরঙ্গ। অস্তিত্বটা বড় হাল্কা মনে হয়। রক্ত পেশী স্নায়ুশিরা সব-কিছুর বন্ধন ভেদ করে এই অতি-নূতন কিন্তু স্বস্তিকর অস্তিত্ব চারদিকের রেখা ও তরঙ্গের সঙ্গে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য হু হু করে এক শূন্যতাবোধ আসে, কি যেন খুব মহার্ঘ পেছনে ফেলে এসেছি অথচ তার বিন্দুমাত্র কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘর বাড়ী কোথাও নেই, কিংবা রাস্তা ঘাট। অথবা পুকুর ও প্রান্তর। আকাশ যেন সীসায় ভারী। ছাই রঙা। কখনও রঙ বা পট বদলায় না। শুধু আলোর একটা ক্ষণিক সম্ভাবনা আসে কিন্তু মরীচিকার মত দ্রুত মিলিয়ে যায়। তাতে ছাই রঙা সীসা-ভারী আকাশ বিনষ্ট আশার এক প্রতীক হয়ে ওঠে।

বালির রঙ বালির মতই কিন্তু স্পর্শ লাগা মাত্র কনকনানি শিরা উপশিরা হয়ে চেতনার সর্বত্র তুহিন নির্দয়তায় ছড়িয়ে পড়ে; অবশতা চেতনাকে বিভ্রান্ত করে তুলে। হাওয়ার কোন হিল্লোল নেই। সব স্থির, চিত্রবহ। শুধু জবুথবু বুড়োর দাড়ির মত কয়েকটা শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট সাদাটে ঘচঘচে আগাছা বালি থেকে প্রায় দু'ইঞ্চি উঠে বামুনের ব্যর্থতায় আশা-রহিত আকাশের দিকে চেয়ে আছে। যেগুলো একটু বাড়তির দিকে ডাইনীর ঝাড়ুর মত

তাদের চেহারা, চির-ধূসর আকাশের নীচে তাদেরকে খণ্ড খণ্ড হতাশা বলে মনে হয়।

—এসেছো? কোথায় যেন একটা তরঙ্গ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

—কে?

—চিনতে পারো না?

—আর একটু খুলে বললে হয়তো চিনতে পারবো।

—তোমারই এক রুগী।

—তা বেশ। ভাল আছ ত?

—তোমার মতই।

—তা তুমি এখানে করছো কি?

—তুমি যা করছো।

—খুব খোলাশা হল না।

—কি, পায়খানা?

—ও, তুমি বুঝি কন্‌স্টিপেশান-এ ভুগতে?

—রক্তের দোষ ছিলো, একবার ফি দিতে পারিনি বলে তুমি আমাকে দেখো নি।

—ফি ছাড়া ডাক্তারের চলবে কি করে?

—আমি মরছিলাম জেনেও তুমি আমার যন্ত্রণাকে লাঘব করবার কোন চেষ্টা করো নি। তবে তোমার স্ত্রী যথার্থ দয়াবতী: আমাকে দরকারের সময় টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন।

—তা জানি, তিনি মানুষ হিসেবে আমার চেয়ে অনেক বেশী ভাল।

—যাক, একটা সত্যি কথা বলেছো। তাঁর বিবেচনা বোধও উঁচুদরের ছিলো। অনুরোধ করলে আমাকে তাঁর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করতেন না। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে গরীব হলেও আমি বেশ প্রিয়দর্শন ছিলাম। আর দুপুরে গিন্নীরা কি করেন তা তাঁদের স্বামীরা কি সব জানেন?

—অদ্ভুত, আমি জানবার চেষ্টা করি নি। আমার গিন্নীর ফস্টি-নাস্টি করবার কোন অভ্যেস ছিল না বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

—তা বটে। মনের স্বস্তি হারিয়ে লাভ কি?

তরঙ্গটা একটু উদ্বেল হয়ে হঠাৎ একেবারে মিশিয়ে যায়।

জায়গাটা এখন বড় বিচিত্র ও অজানা বলে মনে হয়। কেমন যেন স্তূপীকৃত অনিশ্চয়তা, এক অদৃশ্য কিন্তু মজবুত ফাঁদ। যার থেকে বেরিয়ে আসবার কোন উপায় নেই। যে চক্রের মধ্যে অবিরাম ঘুরতে হবে। আশ্চর্য, এ-আসমানে কোন তারা নেই। সূর্য উঠে না। চাঁদ গরহাজির। বড় মজার ব্যাপার ত! এ আবার কোন্ রকমের দুনিয়া। এ অস্তিত্বকে ডাক্তারী পরিভাষায় কি বলে? নিশ্চয় কোন একটা নাম আছে।

ঠিক দৃষ্টির সামনে ডায়নীর ঝাঁটার মত জিনিসটা প্রবলভাবে নড়ে ওঠে। যেন অদৃশ্য কোন দুরন্ত বায়ুচক্র তাকে খেপানির গান শুনাচ্ছে। কিন্তু স্বরটা শেষ পর্যন্ত মেয়েলী নম্রতায় ভেসে আসে।

—কতদিন পরে তোমাকে দেখছি।

—কই আমি ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

—এখানে এক এক জনের জন্য এক এক রকম নিয়ম। আমাকে মনে পড়ে?

—না দেখলে মনে করবো কি করে?

—স্বর শুনে ত চিনতে পারো।

—মুখ দেখেও অনেক সময় চিনতে পারি নি। নাম বললে অবশ্য অন্য কথা।

—রেহানা।

—সে ত এক সিনেমা অভিনেত্রীর নাম ছিল। দেখা হয়েছিল এক 'মিউজিক কনফারেন্স'-এ।

—'মিউজিক কনফারেন্স'-এ ডাক্তার।

—আরে তুমি বোধ হয় জানো না, ধ্রুপদ সঙ্গীতে আমার বরাবরের নেশা।

—তোমার মুখে 'তুমি' শব্দটা বেশ মিষ্টি লাগছে। তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে চটছো না ত? তোমার নেশার কথা জানবো কি করে, তুমি ত আমাকে নাও নি। এখন চিনতে পারছো এই রেহানাকে?

—ওঃ সেই তুমি নাকি। সে কত দিনের কথা। কিন্তু তোমাকে ত আমি ঠকাই নি।

—ঠকাবার কথা কে বলছে। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলে। পছন্দও নাকি হয়েছিলো কিন্তু গরীব বলে ও-পথ আর

মাড়াও নি। আমি তোমার লাজুক লাজুক হাসি দেখে মজেছিলাম। বিয়ে আর ছেলে-মেয়ে হওয়ার পরেও তোমার হাসি ভুলতে পারি নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার হাসি আমাকে লায়লীর মত উতলা করে তুলতো।

—তোমার ভাষা ত বেশ, তবে এখনও ছেলেমি রয়ে গেছে। একজনের হাসি একবার দেখেই সারা জীবন কি কেউ মজে থাকে নাকি!

—তুমি শরীরের কথা জান, মনের কতটুকু বুঝেছো?

—তা বটে।

—তুমি বিলেত যাওয়ার জন্য একটা বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করলে। আমি একেবারে নিভে গেলেও ভাবলাম অন্তত ওই মেয়েটা ভাগ্যবতী হবে। কিন্তু তার সঙ্গেও তুমি প্রতারণা করলে। তুমি ঠক্।

—তোমার এত মর্মজ্বালা কেন?

—নারীর জ্বালা তোমরা পুরুষ বুঝবে না। স্ত্রী ও মা হয়েও তোমার কথা ভুলতে পারি নি। তবে জ্বালাটা আরও বাড়ল যখন শুনলাম নিজের স্ত্রীকেও তুমি ঠকাচ্ছো।

—আহারে, স্ত্রীকে ঠকিয়েছি তুমি জানলে কি করে?

—শুনেছি, আর তুমি নিজেই ত বললে সেই আর এক রেহানার কথা। আচ্ছা বল ত আমার কথা তোমার কখনও মনে পড়তো?

জবাবের অপেক্ষা না করেই তরঙ্গটা যন্ত্রণার কাঁপুনিতে মিলিয়ে যায়।

চারদিকের ধূসর ধোঁয়াটে শূন্যতায় প্রতিশ্রুতির এক সাময়িক নম্রতা আসে। কিন্তু অচিরেই ছাই-রঙা ভারী আকাশ ত্রাস হয়ে চক্রে চক্রে নেমে এসে মনকে গ্রাস করে ফেলে।

এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে অথচ তার রূপ ও প্রকৃতি ঠাহর করা যাচ্ছে না। দেহের খোলস ত বদলিয়েছেই। মনের ভোলও। নিজের অজান্তিতে, কোন এক চমকপ্রদ অলৌকিক লীলায়, অন্য এক পদে এসে হাজির হয়ে অতীত চেতনা কিছুটা ফিরে পাওয়ার জন্য কেমন এক আকুলি বিকুলি শুরু হয়ে গেছে।

চশমার কাচে অবিন্যস্ত ভ্রূ প্রতিফলিত হলে যে বর্ণ ও আকৃতি দেখা যায় সামনের উপস্থিতিটা অনেকটা সে-রকম। ডাইনীর বাঁকানো দুমড়ানো চুলের মত সেই উপস্থিতিটা সহসা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। যেন একসঙ্গে অনেক কয়টা কালো রঙের ছিপছিপে সাপ হিসহিস করে উঠেছে।

—এখানে কার হাসি শুনি?

—সেটা তোমার জেনে লাভ নেই, তবে তুমি আমাকে কি অনুরোধ করবে সেটা জেনেই হাসছি।

—তোমাকে আমি চিনিই না। তোমাকে আমি কি অনুরোধ করতে যাবো। তবে বলতে পারো আমি কোথায় আছি?

—এই ত শুরু। কোথায় আছো নিজেই পরে জানবে।

—তুমি জানো?

—তা বলতে আমাদের মানা।

—হঠাৎ মনে কিসের প্রদাহ বয়ে যাচ্ছে। কি যেন চাইতে ইচ্ছে করছে।

—ওষুধটা ধরেছে। খিলখিলানি হাসি আতঙ্কের হিসহিসানি হয়ে দেখা দেয়।

—আমার মেয়েকে বহুদিন যেন দেখি নি। তাকে কত ভালবাসি তা তোমাকে বলতে পারবো না। কি করে তাকে দেখতে পাব বলো।

—তাকে দেখতে চাও?

—এখুনি, চোখ ভরে। দীর্ঘদিনের পিপাসায় ভেতরটা কেমন শুকিয়ে গেছে। মা মণিকে দেখে ভেতরটা ঠাণ্ডা হোক।

—দেখাতে পারি। তবে আর কিছু চাইতে পারবে না।

—তাই সই।

—তবে কাছে আসো।

ধীরে ধীরে, চারপাশের মৃত ধূসরতার মধ্যে, স্বচ্ছ এক সাদা জিনিস ভেসে ওঠে। কেন যেন মনে হয় কাফন দিয়ে তৈরী। সে-রকমই লম্বাটে, ভাঁজ-বিভক্ত আকৃতি। লোবানের গন্ধ ভেসে আসে, মানুষ মারা গেলে যেমন হয়।

সেই সাদা জিনিসে অজাগতিক এক রশ্মি দেখা দেয়। একটা লম্বাটে সাদা রেখা আলোর ঝলকানিতে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

তারপর স্থির। একটা কামরা। টেবিল চেয়ার। দু'একটা অভিনেতার ছবি। সিনেমা পত্রিকা। হাল্কা খয়েরী রঙের পুরু পর্দা। কাচের। গাঢ় সবুজ ফুলদানিতে দোলন-চাঁপা। সেগুন কাঠের আলনাতে শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, পেটিকোট, তোয়ালে অপরিপাটিভাবে ঝুলছে। জানালার এক কোণে বেশ কিছুটা ময়লা জমে আছে, সেখানে এক টিকটিকি নেমে এসেছে।

ওমা, ওই ত লতিফা। লাবণ্যে পরিপুষ্ট হয়ে টেবিলের দিকে মুখটা একটু ঝুঁকিয়ে ডায়রির পাতা উল্টাচ্ছে। এখনও নাকের মাঝখানে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে থাকে। লতিফাকে বড় আদর করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখান থেকে জানাবারও উপায় নেই যে তার বাবা তার দিকে পিতৃস্নেহের ব্যাকুলতায় চেয়ে আছে। সে-চেষ্টা করলে এই অদৃশ্য ডাইনী বুড়ী হয়ত ছবিটাই সরিয়ে ফেলবে।

ডাইরীর যে-অংশ লতিফা পড়ছিলো তার অক্ষরগুলো সেই সাদাটে উজ্জ্বল জিনিসে কালো রেখার মত ফুটে ওঠে।

"আম্মাটা এখন কেমন যেন হয়ে গেছে। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে দিব্যি কথা বলে যায়। আমার যে লজ্জা লাগে সে খেয়াল একেবারে নেই। বছর খানেক আগে আব্বার এক রুগীর সঙ্গে ঢলাঢলি করতে দেখেছিলাম। বোধ হয় ভাবে আমি টের পাই না। এ-নিয়ে বাইরেও কিছু কথাবার্তা শুনেছি। আব্বাকে বড় ভালবাসতাম। একটা আদর্শ নিজের সামনে খাড়া করে তুলেছিলাম। মনে হোত এ-রকম একটা মহৎ পরোপকারী মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ডাক্তার হিসেবেও বেশ সুনাম ছিলো। অনেক জটিল রোগ তিনি ভাল করে দিয়েছিলেন। একদিন আমার আদর্শের ছবি ভেঙে গেলো। সেদিন 'ফ্ল্যাশ' খেলা খুব জমেছিলো। আম্মাও খেলছিলো। হঠাৎ কে বললো 'প্যাক'-এ একটা তাস পাওয়া যাচ্ছে না। হরতনের টেক্কা। অনেক খোঁজাখুঁজি হোল। পাওয়া গেলো না। সেই গোলমালের মধ্যে আব্বা উঠে বাথরুম-এ গেলো। তখন বুঝতে পারিনি। পরের দিন সকালে সব্জি ক্ষেতে টোমেটো কেমন হয়েছে দেখতে গিয়ে একটা ডগার নীচে দেখি দুমড়ানো এক তাস। হরতনের টেক্কা। চোখের সামনে সবকিছু কেমন

যেন অন্ধকার হয়ে গেলো। মনে হোল কোথাও কোন খুঁটি নেই।"

আকস্মিক পর্দা সরে যায়। সবকিছু আবার নিষ্প্রাণ, ধূসর। কোথাও কোন তরঙ্গ বা রেখা নেই। খিলখিলানি হাসি যেখান থেকে আসছিলো সেখানেও দম বন্ধ করা নীরবতা।

দেখবো, দেখবো। মেয়েটাকে আবার দেখবো। তাকে বুঝাবো। দরকার হলে মাফ চাইবো। কিছুতেই তাকে আর মনে করতে দিবো না তার কোন খুঁটি নেই। সপ্তদশী মেয়ের এই দ্রুত, হৃদয়-বিদারক বোধন থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। ভাগ্যিস, অন্য সব ব্যাপার মেয়েটা এখনও জানে না। এই অবস্থায় স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে তাকে ঢেকে দিলে হয়ত এখনও তার মন ফেরানো যেতে পারে।

আল্লাহ্ রে, আমি কেন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না. সব্জি ক্ষেতে ডাগর টোমেটো দেখতে পাচ্ছি না।

তবে এখান থেকে এখুনি পালাও। এক মুহূর্তও আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। দৌড় দাও, দৌড় দাও। এই মৃত ধূসরতা থেকে এই অবয়বহীন জগৎ থেকে দ্রুত পালাও। নইলে এর খপ্পরে এমন গভীরভাবে পড়ে যাবে যে, সেখান থেকে নিজেকে আর ছাড়াতে পারবে না। এখানে আতঙ্ক নীরব, শব্দহীন। এখানে বালির প্রতিটা কণায় সাপের ছোবল, এখানে প্রাণ-নাশী তুহিন হিম।

যতই পালায় ততই পেছন থেকে ধূসরতা জমাট হয়ে আসতে চায়, ততই হিম কনকনে হয়ে ওঠে। কাঁটা কাঁটা হয়ে শঙ্কা চেতনাকে রক্তাক্ত করে তোলে। যতই এগুচ্ছে ততই জালে জালে আটকা পড়ছে। আকাশ থেকে ত্রাস শূন্যতায় নেমে এসে মাথার উপর ভাসছে। ভৌতিক ছাতার মত সেই জিনিসের অবস্থিতি কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না। তাও ক্লান্তিহীন দৌড়, দৌড়, দৌড়।

ওঃ আল্লাহ্! চোখের সামনে একি! সামনে একটা রূপালী বেড়ার উপর সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় চুপ করে বসে আছে। তার পেছনেই বিরাট এক উঁচু প্রাচীর। পরিষ্কার আলোতে সোনালী হর্ষে এক গ্রহাতীত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সেই উঁচু প্রাচীর ছাড়িয়ে ধবল শুভ্রতায় এক বিশাল গম্বুজ নীল্ আসমানকে তস্‌লিম জানাচ্ছে।

আর কিছু দেখা যায় না, অথচ নিশ্চিত প্রত্যয়ের মত মনে হয় বেড়ার ওপারে আলাদা এক জগৎ।

—আমাকে একটু বেড়া পার হতে দাও।

—সময় হলে পেরুবে।

—এখন যে অবস্থায় আছি মনে হয় তার চেয়ে মওতও ভাল।

—তুমি কি মনে কর তুমি বেঁচে আছো?

—বেঁচে নেই, তবে আছি কোথায়? যেখানে আছি তার চেয়ে ত দোজখও ভাল।

—তুমি কি মনে করো তুমি অন্য কোথাও আছো?

ছিনতাই

শুক্রবার বিকেলের এলিফ্যান্ট রোড। চলমান পথিকের সংখ্যা কম তবে মোটরগাড়ির বেহায়া বিজ্ঞাপন নূতন-বিজ্ঞানের প্রকোপ প্রকট করে তুলেছে। ক্রীম রঙের ২০০ মার্সিডিজ-এ উৎকট হলুদ রঙের পর্দা ভেতরের আব্রু রক্ষা করবার জন্য যেন কোন অনাচার-ক্লিষ্ট মনের উদ্ভাবন। সদ্য আমদানি করা এক চকোলেট রঙের টয়োটায় রেডিওর অস্তিত্ব বাইরে লতার মতো হেলানো নূতন কালো এরিয়ালে অভ্রান্তভাবে স্পষ্ট।

চালক, দেখা যায়, বেশির ভাগই নবীন যুবা। তবে কোন্ বেকুবে বলবে বাঙালী তরুণের নম্রতা বা সৌজন্য তাদের চেহারায় বা দৃষ্টিতে। পরিপুষ্ট মুখে এক বেলুচী কাঠিন্য; হিপি জুলপি ও আকস্মিক ভল্লুক-গুম্ফে এক আন্তর্জাতিক চমক ও আরণ্যক সংকল্প তাদের সহজেই দৃষ্টি-গ্রাহ্য করে তুলেছে।

বিপণির নামকরণে কিন্তু বাঙালী উচ্ছ্বাস! যদিও বিদেশী সওদা তাদের মালিকের সমকালীন বৈষয়িক ধূর্ততার নমুনা। কী চান আপনি, বলেন? মুদ্রাবান হলে প্রায় সব-কিছুই পাবেন। 'বুটিক'-এর শার্ট, অভিজাত টাই, ইয়ার্ডলি সাবান, রেভলনের লিপস্টিক, নিখুঁত এক আধুনিক ডিজাইনের আরামকেদারা, টেলিভিশন, ক্যামেরা, রেকর্ড প্লেয়ার, থ্রিইন ওয়ান, জর্জেট শিফন মাদ্রাজী শাড়ী।

আর আপনার সচ্ছল সংসারে যদি কঠিন অসুখে পড়ে কেউ রুচি-বিকৃতির পরিচয় দিয়ে থাকেন, ঘাবড়াবেন না। দুর্লভতম ওষুধটাও পেয়ে যাবেন। সব দোকানে নয়। দু-একজন কেমিস্টের নাক এখনও একটু উঁচু রয়ে গেছে। তারা দামের ব্যাপারে বেশি এদিক ওদিক

করতে পারে না। তবে বাঘাটে কেমিস্টও পাবেন যিনি সে-ওষুধটা সহাস্যে আপনাকে দেবেন যদি আপনি হাসিখুশি ধরনের দাম দিতে রাজী হন আর কথা বেশি না বলেন।

মাঝখানের ও আশেপাশের বস্তিগুলোই বিপাক বাধায়। বদ্ধ নর্দমায় কীট-কলোনির মতো তারা কিলবিল করে। কোনই সুঠাম ভাব নেই বা আলাদা এক আকৃতি। ইত্যাদি ও প্রভৃতির মতো চুলকানি ও পাঁচড়া ও উকুন ও ন্যাকাটি পেটের ঝোলায় তারা নামহারা। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'ও তারা বোধ হয় চোখ তুলে কখনও দেখে না।

পি. জি. হাসপাতালের দালানে নূতন বিপণি-বিতান পটুভাবে পট বদলায়। ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল-এ কোন বিদেশী আগন্তুকের কক্ষে কিছু আমোদিত প্রহর কাটিয়ে অষ্টাদশী রাহেলা বা সাহেলা বা জমিলা বিলাসী পণ্যের দিকে নূতন সম্ভাবনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেউ বা সাহস করে ভিতরে ঢুকে দু-একটা পছন্দসই সওদার দাম করে—গ্রামীণ কলহাস্য ও বিদেশী আগন্তুক-অভিনন্দিত পাছার দোলানি বাইরের পথচারীকে উপহার দিয়ে।

তবে কেন্দ্রীয় এক ঘটনার মতো পথের বাঁকটা প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পরে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। শাহবাগ অ্যাভিনিউর মাঝখানের ফোয়ারাটা বিকল হয়ে পড়েছে। ভরাপানি যা আছে তা সন্ধ্যার বিজলীবাতির বিজুরিতে খোলতাই হবে, তবে বিকেলের রোদে একটু গদ্য-গদ্য ভাব। অধিকাংশ যানবাহন কোনও কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে লোমহর্ষক দ্রুততার চলন অব্যাহত রেখেছে, তবে ডানদিকের একশ গজ জুড়ে মোটরগাড়ি বাস বেবী ট্যাক্সি রিকশা এক অস্বাভাবিক ব্যাসের সৃষ্টি করেছে। তাদের আরোহী ও চালক প্রত্যেকের মুখে আশু এক কর্মতৎপরতার কঠিন সংকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে জটলা করে পথচারীরা এসে জড়ো হয়ে সে ব্যাসের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলছে ও আসন্ন নাটকের পটভূমি তৈরি করছে।

—না! এর একটা বিহিত করতেই হবে, এটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। পুরু কালো ফ্রেমের চশমা পরা মাস্টারি চেহারার

একমাঝ বয়সী ভদ্রলোক চোখের ঈষৎ-রক্ত তারাকে রাগের দ্যোতনায় নেকড়ে-কুটিল করে বলে।

সর্দির তাড়নায় নাক থেকে অবিরত পড়া নোনতা পানিকে কিছুটা জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে কিছুটা হাত দিয়ে মুছে এক মিশকালো রিক্শা-চালক অনির্দেশ্য এক লোকের দিকে অব্যবহৃত বাঁ হাতটা বাড়িয়ে কী এক কল্পিত তামাসায় হাসতে থাকে আর হেঁক হেঁক করে কেসে শিক্ষিত বাঙলায় বলেঃ ধর শালাদের ধর, পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে দে, শালারা হাইজ্যাক করার তালে আছো, হারামির পোলা।

ততক্ষণ বেশ প্রশংসনীয় তৎপরতা ও নিপুণ পন্থায় ছিনতাইয়ের কাজটা সম্পন্ন হচ্ছিলো। এক ছোট্ট ছাই-রঙের ফিয়াট থেকে নেমে তিনজন তরুণ মিলিটারি ধরনে গুরুত্বপূর্ণ কোণগুলো দখল করে এক ল্যাণ্ডরোভারকে থামায়। তারপর দরজাটা অনুশীলিত দ্রুততার সঙ্গে খুলে ড্রাইভারকে মস্ত এক হ্যাচকা টানে নামিয়ে পাশের আরোহীর হাত থেকে মাঝারি ধরনের এক সুটকেশ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে পেছনের আরোহীর কাছ থেকে আচানক বাধা পায়। পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রিয়া সম্পাদনার আগে থেকে আঁচ করতে পারে নি এমন এক বাধা পাওয়ায় তরুণটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিনা দ্বিধায়, যেন দৈনন্দিন এক অনুত্তেজিত কাজ করছে, স্টেনগান উঠিয়ে পেছনের আরোহীকে তাৎক্ষণিক পটুতায় গুলিবিদ্ধ করে সুটকেসটা পেশাগত স্বাচ্ছন্দ্যে ছিনিয়ে নেয়ঃ তার লোম-ধনী হাতটা সুটকেসবহনকারী জিন্দা আরোহীর হাতে লাগলে কাপুরুষ নাগরিক খরগোশের মতো কাঁপতে থাকে। তিন মিনিটে নিজেদের কাজ সেরে তিনজনই চারপাশে জমা পথচারীদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ফিয়াটে চড়ে ঢাকা ক্লাবের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে সবেগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্স্টিটিউটের দিকে ধাওয়া করে, কিন্তু হঠাৎ একটা টায়ার ফেটে যাওয়ায় মাঝপথে থেমে গাড়ি ফেলে রেখে দুজন রমনা পার্কের দিকে আর একজন সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে দৌড় দেয়।

এদিকে ল্যাণ্ডরোভারের পেছনের সীট নিহত আরোহীর রক্তে কালচে লাল হয়ে ওঠে আর ড্রাইভার ও তার পাশে-বসা আরোহী কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কৌতূহলী ও ক্ষিপ্ত জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

কে একজন জিজ্ঞেস করে,—সুটকেসে ছিলো কী সাহেব?

—টাকা। ড্রাইভারের পাশে-বসা আরোহীটা ঘোলা চোখে বিশেষ কারুর দিকে না চেয়েই বলে।

—টাকা নয়ত কি মার্বেল ছিনতাই করতে এসেছিলো? টাকা ছিলো কত?

—তিন লাখ।

—কী মজা, শালা আমি পেয়ে গেলে ধানমণ্ডিতে একটা বাড়ি কিনে ফেলতাম। তারপর আমার ঠাট দেখে কে।

কোন এক কোণা থেকে ছুঁড়ে মারা এই বিদগ্ধ মন্তব্যে সমবেত জনতার মধ্যে আমোদের এক সাময়িক হিল্লোল খেলে যায়।

দূর থেকে একজন চিৎকার করে বলে; সুটকেস হাতে ছোকরা-টাকে দেখতে পাচ্ছি। রেস কোর্সের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি চললাম শালাকে ধরতে। আপনারাও আসুন।

আর নিমেষে ওলটপালট কাণ্ড। জনতার প্রায় সকলে লোকটার দিকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়। শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না, চলন্ত এক মোটর প্রচণ্ড আকস্মিকতায় ব্রেক কষে বিকট এক শব্দ করে থেমে পড়ে, ঠেলাঠেলিতে কয়েকজন রাস্তা থেকে ছিটকিয়ে ফুটপাথে নিক্ষিপ্ত হয়। হাঁটিতে গর্জনে হাসিতে ও তড়িৎ বেগে জনতা নিজেদের সম্মিলিত শান্ত রাগকে এক আনন্দীয় মুখোশ পরতে দেয়।

—কোথায়, কোথায় লোকটা?

—ওই যে। হাতে সুটকেস দেখছেন না।

—সুটকেস দেখছি, তবে লোকটার তাড়া আছে বলে মনে হয় না। স্থির গতিতে চলেছে।

—হারামজাদার হাতে স্টেনগান আছে, তাই অত সাহস। ওরই স্টেনগান দিয়ে এবার ওকে মারবো। এবার দেখি তুমি কোথায় পালাও।

বর্ণালী সব হাওয়াই শার্ট আলোতে চমকায়। মাথার চুল ঝুলপি গোঁফ, পায়ের বিবিধ আকৃতি, দৌড়াবার বিভিন্ন ধরন, পায়জামা প্যাণ্ট ও লুঙ্গীর উঠতি পড়তি হাঁপানি ও হিক্কা বিকেলের বিশেষ নম্রতায় ও স্মিত প্রাঙ্গণের বিস্তারে তামাটে শালগাছের পশ্চাদভূমিতে ও সামনের মন্দিরের চূড়ার আশ্বাসে সহসা এক কেন্দ্রীয় অর্থে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

জনতা সামনের দিকে প্রচণ্ডভাবে-উত্থিত এক সামুদ্রিক ঢেউ-এর মত এগুতে থাকে। তার বিস্তারিত ও বলবান বাহুতে যেই আটকা পড়ুক না কেন ভয়াল ক্ষিপ্রতায় সে অমোঘভাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—ধর শালাকে ধর, এবার দৌড়াতে আরম্ভ করেছে। দেখি কত দৌড়াতে পারে।

হঠাৎ তাকে কেন্দ্র করে নিত্য-বাড়ন্ত এক জনতার মারমুখী অভিযান দেখে যুবকটা একেবারে হকচকিয়ে যায় আর নিজের স্বাভাবিকত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে উন্মাদের মত দৌড়াতে থাকে। আচানক ভয়ে তার নাড়ী পর্যন্ত ক্রিয়ারহিত হয়ে যায়, সম্বিত তো সম্ভ্রান্তভাবে আলাদা।

কিসের জন্য জনতা তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে খেঁচিয়ে মারমুখী হিংস্রতায় এগিয়ে আসছে। সে করলো কী! তার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। তার নাছুম চোখ অব্যক্ত এক আশঙ্কায় ভরে গিয়ে তাকে সাময়িক ভাবে ব্যক্তিত্বহীন এক ত্রাসে রূপান্তরিত করে। তার বুকের লৌহ-পিঞ্জরে তার তড়পড়ানো হৃদয় কিছুটা স্বস্তি পাবার জন্য কেমন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে।

তাকে কি ঠাহর করেছে জনতা? চোর, পকেটমার। তাকে মারবার জন্য ছিঁড়বার জন্য ক্ষিপ্ত জনতা হাজারে হাজারে তার পেছনে ধাওয়া করা আরম্ভ করেছিলো কিসের প্ররোচনায়? যুবকের স্বাভাবিক চিন্তা-ক্ষমতায় কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না। পা-টা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে আসতে চায়। আক্রমণের কারণ একেবারে জানা না থাকায় বোধহীন আতঙ্কে যুবকের উচ্চকিত চেতনা ভরে যায়।

—আপনারা সকলে আমাকে তাড়া করছেন কেন? আমি তো কিছু করি নাই। জাগ্রত আশার মন্ত্রণায় যুবক জনতার ন্যায়বোধের কাছে আবেদন করা মনস্থ করে।

—কিছু করে নাই! কিছু করে নাই! শুধু একটা লোককে খুন করেছে আর সুটকেসে তিন লাখ টাকা নিয়ে পালাচ্ছে।

—স্বাধীনতা পেয়েছো বলে শালা লোক খুন করবে, বাহনচোদ টাকা ছিনতাই করবে। তোমাকে মেরে একদম গুড়গুড়িয়ে দিবো না।

—অনেক সয়েছি, আর না। কেউ যখন কিছু করবে না, আমরাই এর বিহিত করবো।

বাড়ন্ত রোষের তাড়নায় জনতা দ্রুততর গতিতে ধেয়ে যুবককে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো যদি মাঝখানে জনতার একাগ্রতায় আকস্মিক এক ছেদ না পড়তো।

রমনাপার্কের কাছ থেকে কোলাহল ও গুঞ্জন এই পর্যন্ত ভেসে আসে আর তামাটে শালগাছ হঠাৎ আগুনের হলকায় সাময়িক এক রোশনাই ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য আগুনের তাপে কিছুটা জ্বলতে থাকে।

দূর থেকেও জনতা দেখতে পায় পরিত্যক্ত মোটরগাড়িটা আশে-পাশে আগুনের লেবাশ পরে মাঝখানে একেবারে পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। সে দৃশ্যই জনতার একাংশের কাছে বেশী নয়নাভিরাম মনে হয়। হল্লা করতে করতে তারা সে-দিকে ছুট দেয়। কিন্তু জনতার সামনের সারি নিজের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় না। কলগুঞ্জনে ও পরিত্যক্ত মোটরটাকে আগুনে পুড়তে দেখে তারাও অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য পেছন ঘুরে চেয়েছিলো তবে মানুষ-শিকার ছাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আবার সামনের দিকে দৃষ্টি ঘুরায়। সেই অবসরে যুবকটা প্রায় পাঁচ শ গজ দূরত্বের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধান রচনা করতে পেরেছিলো। তা দেখে ধাবমান জনতা আরও দৃঢ়সঙ্কল্প ও ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকের দিকে বিপুল বিক্রম ও বেগে এগুতে থাকে।

জনতার আকস্মিক নীরবতা ও পাগলা ঢেউ-এর মত উল্লসিত অগ্রগতি যুবককে আবার নূতন করে তার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সন্ত্রাসের সঙ্গে সচেতন করে তুলে। তার মাথার চুল বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকে তার ধাবমান ও ত্রাস-পিষ্ট শরীরের স্পন্দিত নীড় হয়ে; তার ছানাবড়া চোখ দুটা আসমানের অঙ্গনের দিকে চেয়ে খামাখাই কার যেন করুণা ভিক্ষা করছে।

আর ঠিক সে সময় ঘুঘু দেয় এক ডাক। বড় উদাস মধুর। ভেতরের কোন খবর যেন দিতে চায় অতীতের অনেক বিচ্যুতির ডাকহরকরা হয়ে।

যুবক তখন নিশ্চিত বোঝে তার আর পরিত্রাণ নেই। উদ্যত বন্যতায় মরণ-ছোবল মারবার জন্য ভুল নিশানার দিকে তারা ধাওয়া করেছে, এই যুক্তির কথা বলে জনতাকে এখন নিরস্ত করা যাবে না। পুরো দম দেওয়া এক যন্ত্রের মত ছাড়া পেয়ে তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের

দিকে অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মত কোন মাস্টারী হাত কোথাও দেখা যায় না।

তবু যুবক একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। উচ্চলম্ফনে অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব দেখিয়ে যুবক বেড়াটা এক ফুট ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যায়। বাঙলা একাডেমি এখন প্রায় মুখোমুখি। ন্যাশানাল লাইব্রেরির পাশেই শিল্প ও চারুকলার মহাবিদ্যালয় তার অস্তিত্বকে মৃদুভাবে জাহির করছে। সেখানেই সে যাচ্ছিলো নাসিমার সদ্য-সমাপ্ত প্রতিকৃতি নিয়ে। সস্তা বাদামী রঙের প্লাস্টিকের ব্রিফ কেসটা এখনও হাতে রয়ে গেছে। সেটা পালাবার এক অতিরিক্ত কারণ। প্রতিকৃতিটা যেমন করেই হোক একবার নাসিমাকে দেখাতে হবে। একই মহাবিদ্যালয়ে নীচু ক্লাসে পড়া এই মেয়েটিকে যুবকটি কোন গণিতের ধারায় না গিয়েই হৃদয়মন দিয়ে বসে আছে। বড় জনপ্রিয় নাসিমা। প্রায় সব ছাত্র আর দু-একজন মাস্টারও তার পেছনে হরদম ধাওয়া করছে। কিন্তু গত সপ্তাহে নাসিমা যুবকের হাতে এক গোলাপফুল উপহার দিয়েছিলো। আজকে তার প্রতিকৃতি নাসিমাকে দিয়ে চমকে দিতে তাই যুবকের বড় সাধ ছিলো।

নাসিমা বলেছিলো প্রায় প্রতি ভোরে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ধানমণ্ডি লেকের দিকে বেড়াতে যায়। তাই একদিন ভোরের আজানের পর পরই তাদের টিনের বাসা থেকে বেরিয়ে যুবকটি ধানমণ্ডি লেকের দিকে পুরো পথ অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হেঁটে এসেছিলো।

দেখাও হয়েছিলো। নাসিমার বান্ধবীটি সুন্দরী না বটে তবে কালচে পাড়ের হালকা পীতরঙের এক শাড়িতে নাসিমাকে জবর দেখাচ্ছিলো। ভোরের হাওয়া তখন আবার একটু ইয়ারকি দেওয়া আরম্ভ করেছে। আর এক কোকিল মুখ খোলার পরে অন্য এক বেল্লিক কোকিল তার সঙ্গে তাল রেখে ভোরের বাড়তি-আলোর আসমানকে একেবারে সুধায় ভরে দিয়েছিলো। তার সম্রাট-সূর্য পুরন্ত লালিমায় আসমানের এক কোণাকে একেবারে বশ করে ফেলেছিলো।

নীরব ছোবলানিতে দলিত মর্দিত হয়ে জনতা অমোঘভাবে এগিয়ে আসছে। শরীর আর যুত পায় না, পা আর উঠতে চায় না। শুধু নাসিমার পরিপুষ্ট স্তন চোখের সামনে পরিষ্কার রেখায় ভেসে ওঠে। যেন তাতে সমস্ত পিপাসার সমাধান, মোক্ষম এক শান্তি।

পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। চালককে ভদ্র ও সদাশয় মনে হয়। মরিয়া হয়ে তার সামনে শেষ প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে যুবকটি গাড়িটাকে থামায়। চালককে আশু আবেদনের সমস্ত আর্তি দিয়ে বলেঃ আমাকে একটু উঠতে দেন, নইলে ও লোকরা আমাকে খামাখাই মেরে ফেলবে। বিশ্বাস করুন, আমার কোনই দোষ নেই। আমাকে না বাঁচালে আমার মা-বাপ বড় কষ্ট পাবে।

হুঙ্কার দিয়ে জনতা ছুটে আসছে।

চালকের পাশে বসা তরুণী সহোদরার মমতায় বলে,—নাও না তুলে, দোষ যদি কিছু করে থাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হবে।

—পাগল হয়েছো! তাহলে ওরা আমাদেরকেও পিটিয়ে শেষ করে দিবে।

যুবকটি গাড়িটা দ্রুত চলে যেতে দেখে আর এই প্রথমবারের মত পিঠে কার যেন স্পর্শ লাগে। তার পরেই জনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে।

যখন তার শরীরের উপর দিয়ে এক এক করে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটে যায় তখন যুবকটি চরম• বোধনের অপ্রাসঙ্গিকতায় ভাবে...

ব্রিফ কেসটা ছিঁড়ে তছনছ হয়ে গেছে, যুবকের মগজের কিছুটা কিন্তু নাসিমার দুমড়ানো প্রতিকৃতির সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব পেয়েছে।

—এ যে দেখছি মেয়ের এক ছবি, টাকা কই? জনতার এক-জনের আর্ত জিজ্ঞাসা। আর একজন অনেকটা অনিশ্চিত ধরনে মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলেঃ শালা কারে পাকড়াও করলাম কে জানে। শালার বিচিটা যখন ছিঁড়ে দিচ্ছিলাম বাবু বলে কিঃ ছেড়ে দাও ভাই, বড় ব্যথা লাগে। আরে আমি শালা ওর ভাই হলে তার ওই জিনিসটা ছিঁড়তে যাই নাকি? বেটা অগারাম কোথাকার!

বিকল্প বেহেস্ত

বেশ নুরানী চেহারা শুকুর সাহেবের। ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও শরীরে এখনও জোয়ানীর তাকত্ রয়ে গেছে। হেকিমী হালুয়া না খেয়েও শরীরের সব সাধ-আহলাদ ফুরিয়ে যায়নি। তাই ওদিক থেকে আজকাল বেশ বিপাকে পড়তে হয় ভদ্রলোককে। বেগম এখনও বেঁচে রয়েছেন বটে তবে ডায়াবেটিস ও ব্লাডপ্রেসারে পঞ্চাশ বছর বয়সে একেবারে চুমসিয়ে গেছেন। কোন খায়েশ জাগাতে পারেন না। আর পঁয়ত্রিশ বছর পরে একই পাত্রে বীর্য রাখলে কোন পাত্রকেই আর তত মনোলোভা ঠেকে না।

ঘরে অন্য সুযোগ আছে। পুরানো বাঁদীদের যুবতী মেয়ে দু'একটা এখনও ঘরের কাজ করে। বেগম যখন বিছানায় শুয়ে সৌরভময় অতীতের কথা ভাবেন তখন তাদেরকে মওলানা সাহেব যদি একটু আদর আপ্যায়ন করে দেন মনে তাদের যাই প্রতিক্রিয়া হোক অটুট সম্ভ্রমে মুখে তারা রা-টি করবে না। মওলানা সাহেবের আদর গ্রহণ না করলে দোজখের দরজা দরাজভাবে খুলে তাদের গিলে খাবে। আর এখনও পটু মনে হয় তাঁকে।

পাড়া-পড়শীরা মওলানা সাহেবকে এই আকালের যুগেও খাতির করে। খাঁটি সর্ষের তেল চেলে এক ভক্ত নিজে গিয়ে ঘানি থেকে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। আর সকলের পোঁদে আঙুল দিবো কিন্তু মওলানা সাহেবকে সে-দলে ফেলা যায় না। হয়ত শালার কিছুই হবে না তবে খোদাপন্থীর একটা মাধ্যম হাতে রাখতে হয়।

ভক্ত ও মুরীদের সংখ্যাও কম নয়। আপদে বিপদে সলাহ্ পরামর্শের জন্য আসে। দোওয়া তাবিজ অনেক জানেন মওলানা

সাহেব। অনেক সময় কাজেও দেয়, তাতে ভক্তদের ভক্তি অটুট থেকে যায়।

বাইরের জগৎ থেকে এখন কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও মওলানা সাহেবের সাংসারিক ও জাগতিক জ্ঞান বেশ প্রখর রয়ে গেছে। তিনি ছিলেন মাদ্রাসার হেড মৌলভী কিন্তু সংসারে কখনও অকুলান হয় নি। তখনও বেশ কিছু ভক্ত ছিল্লো যারা পরামর্শের জন্য এলে চাল ঘি মুরগী নিয়ে আসতো। এক টাকা দু'টাকা নজরানা রেখে যেতো। হাবিজাবির মধ্যে তিনি ছিলেন না কিন্তু বাজারদর সম্বন্ধে প্রায় অতি-প্রাকৃত এক জ্ঞান থাকায় সওদার বেচাকেনা করে তিনি বেশ দু'পয়সা করেছিলেন। মেয়েদের বিয়ে দিতে বা একমাত্র ছেলেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াতে ও পরে বিদেশে পাঠাতে তাই কোনদিন কোন অসুবিধা হয় নি।

বড় জামাই এখন ভাল ব্যবসা করছে। ধানমণ্ডিতে সুন্দর একটা বাড়ি কেমন করে যেন নিজের করে নিয়েছে। নতুন ডাটসান গাড়িতে জামাই মাঝে মাঝে শাশুড়ীর খোঁজখবর করতে আসে আর শ্বশুরের শরণাপন্ন হয় যখন তার ছেলেমেয়েরা মাঝারি ধরনের অসুখে পড়ে। দোয়া তাবিজের জন্য শ্বশুরকে নজরানা দিতে হয় না।

দু'একজন ভক্ত মওলানা সাহেবকে রাজনীতিতে যোগ দেবার জন্য তাদের আর্জি পেশ করে। কিন্তু ও ব্যাপারেও ভদ্রলোকের বুদ্ধি টনটনে।

দেশের যা অবস্থা মওলানা সাহেব আপনাদের মত লোক এগিয়ে না এলে আমাদের তো অসুবিধা ঘুচবে না। এক ভক্ত উকিল প্রারম্ভিক প্রস্তাবের ধরনে বলেন।

এগিয়ে আসা মানে ?

এখন মওলানা সাহেব অপোজিসন বলতে কিছু নেই। সরকারও চান একটা বলিষ্ঠ অপোজিসন গড়ে উঠুক। আপনি একটা যুৎসই পার্টিতে যোগ দিলে অনেক লোকই ভরসা পাবে।

তাই নাকি? তবে আমি ত রাজনীতির কিছু বুঝি না উকিল সাহেব। আল্লারই এবাদৎ করবার কিছুটা চেষ্টা করি, তাতে যদি দশজনের ফায়েদা হয়।

তা হয় কিন্তু বিশেষ অবস্থায় দুনিয়ার কথাও ত আলেমদের ভাবা দরকার।

তা যাঁরা আছেন ভালোই ভাবছেন। ও-পথ আমাদের নয়। আল্লার রাস্তায় যারা চলতে চায় তাদের কোন দল থাকে না।

অথচ, সত্যি বলতে গেলে, দেশের কথা ভেবে মওলানা সাহেবও মাঝে মাঝে বড় বিমর্ষ বোধ করেন। অতীতের সঙ্গে খামাখাই অনেক কিছুর তুলনা করতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই প্রবণতা একবার লক্ষ্য করে বড় জামাই বেশ বিজ্ঞতার সঙ্গে বলেছিলোঃ ও পথ মাড়িয়ে লাভ নেই আব্বা। বড় ঘোরালো জিনিস। এমনিতেই তো আমরা বেশ আছি। আপনারই বা অভাব কিসের?

বস্তুত, মওলানা সাহেবের নিজের সংসারে অভাব বলতে তেমন কিছু নেই। বাড়িটা পুরনো জমানার হলেও নতুন চুনকামে কিছুটা খোলতাই হয়েছে। আসবাবপত্র সুঠাম না হলেও আরামদায়ক। নতুন জমানার স্বাক্ষর হিসেবে টিভি, ফ্রিজ ও সোনিও ট্রানজিস্টারও আছে। একটা দামী জার্মান ক্যামেরা শখ করে কিনে সেগুন কাঠের তৈরী আলমারির উপরের তাকে সযতনে রেখে দিয়েছেন।

বেগম বেশীর ভাগ সময়ই বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকেন। বাঁদীর মেয়েরা পরিচর্যা করে। বিছানাটা পরিপুষ্ট তোষকে ও সাদা তকতকে চাদরে খুবই আরামের। বিছানাতেও ধোপ-দুরস্ত হয়ে থাকেন বেগম। চুলে এখনও রোজ লক্ষ্মীবিলাস তেল পড়ে। চড়া দরে টাকার বাড়তি বাজারে কেনা। নাকে হীরার দুলটা এখনও অম্লানভাবে দ্যুতি ছড়ায়। ছোট্ট রূপার পানদানে পান সুপুরী চুন খয়ের পরিপাটি ভাবে সাজানো থাকে। ভিজে ন্যাকড়াটাও রোজ ধোওয়া হয়। মওলানা সাহেব এ-সব ব্যাপারে বাঁদীর মেয়েদের সব সময় নজর রাখতে বলেছেন। বিছানা ছেড়ে মাঝে মাঝে উঠে বেগম সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজন তদারক করতে গিয়ে দেখেন প্রায় সব-কিছুই আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। তখন আবার কিছুটা নিরুদ্যম হয়ে তিনি বিছানায় স্বস্তিতে ফিরে আসেন।

মওলানা সাহেব দিনে একবার প্রায় আধ ঘণ্টার মত বেগমের বিছানার পাশে এসে বসেন। মৃদু ও নিরুত্তাপ ধরনে সংসারের ও

দুনিয়ার হাল-হকিকতের কিছু কথা হয়। আবেগ আসে শুধু যখন ছেলের বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে।

ছেলের বউ-এর জন্য আরও কিছু গয়নাগাটি কিনে রাখলে হয়।

ছেলের বউ হয়ে নিক্ আগে। ছেলে বিদেশ থেকে ফেরেন কখন তাই দেখো।

একসময় তো ফিরবেই। ওদিকে সোনার দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এখনই কিছু গয়না তৈরী করে না রাখলে ওতে আর হাত দেওয়া যাবে না। অন্তত ডজনখানেক শাড়িও কিনে রাখতে হয়। যে ভাবে হু হু করে সব জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। আমার চোখের সামনে প্রায় ভাসতে থাকে ছেলেটা ঘিয়া রঙের আচকান-পাগড়ি পরে বিয়ে করতে চলেছে, ততদিন বেঁচে থাকলে হয়।

ঘিয়া রঙের আচকানে তোমার ছেলেকে ততটা মানাবে না' তোমার ধবধবে রঙ তো পায় নি। সাদা আচকানেই মানাবে বেশী।

বেগমের শেষ উক্তি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা মওলানা সাহেব তেমন দরকার মনে করেন না।

ছেলেটা ফিরে আসে কিনা বা এলেও কখন, সে অনিশ্চয়তা বেগমের মত মওলানা সাহেবের মনকেও বেশ দোলানি দেয়। ফিরে এলেও বিদেশিনী সঙ্গে নিয়ে যদি ফেরে! সেই সম্ভাবনার কথা মনে হওয়াতে মওলানা সাহেব নিজের কামরার একান্ত ও নিভৃত পরিবেশে ফিরে গিয়ে কিছুটা এবাদতের চেষ্টা করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মওলানা সাহেবের মনে ঘোর ধরে যায়। পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত খুঁটিনাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি অনেকাংশে আত্মস্থ হয়ে নিজের ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করেন। মনে হয়, নিজের স্রষ্টার কাছে পৌঁছাতে হলে যে কোটি কোটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় তার একটা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মুদিত চোখের পরিসর আশ্চর্য সব রওশনীতে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে। চেতনা পরিশ্রুতির পটভূমি রচনা করে। ছেলের জন্য বিশেষ করে দোওয়া চান। সে যেন সহি-সালামতে থাকে। দেশে ফিরে আসার প্রার্থনাটা উহ্য রাখেন, খোলসাভাবে তা উচ্চারণ করলে তার নতিজা কি হয় কে জানে। আল্লা বুঝবে। যেটা ভাল তাই হোক। বেগমের রোগমুক্তির জন্যও দোয়া চান আর অবাক

হয়ে লক্ষ্য করেন সে দোয়া চাইবার সময় মন অনির্দেশ্য কত মহৎ আকুতিতে ভরে যায়। তবে নিজের ভেতরটা পরিষ্কার দেখে করুণ বিলাপের সঙ্গে আবিষ্কার করেন আম বলে আর কিছু নেই শুধু আছে আঁঠি। তা দিয়ে যদি নতুন এক ভেঁপু তৈরী করা যায়।

সন্ধ্যায় নিউমার্কেট-এর এক পরিচিত দোকানে জবাকুসুম তেল কিনতে গিয়ে অন্য কোন চিন্তার কথা উদয় হয় নি তবে বেরিয়ে এসে এক ট্যাকসীওয়ালার দিকে চেয়েই অঘটনের সূচনাটা হল।

রাস্তায় আলো থাকলেও সে বিশেষ জায়গাটায় আবছা অন্ধকার। মওলানা সাহেব দেখলেন সামনের ট্যাকসীতে কমলারঙের শাড়ি পরা দুজন তরুণী সলাজ কুণ্ঠার ভঙ্গীতে তরুণ ড্রাইভারের সঙ্গে ফিসফিস করে কি কথা বলা আরম্ভ করে দিলো।

হঠাৎ কিছু চিন্তা না করেই ভদ্রলোক পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন আধা-ময়লা রুমালে মোড়া টাকার তোড়াটা ঠিকই আছে। জবাকুসুম তেল কিনবার পরেও তিনশ' আটাইশ টাকা থাকবার কথা। কোথাও বেরুলেই রুমালে বেঁধে বেশ কিছু টাকা নিয়ে যাওয়া তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। কখনো কোন ঠেকায় পড়লে টাকার অভাবে জিল্লতি হবার ভয় যেন না থাকে।

পরে এক বন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় আগে-পিছে কিছু না ভেবেই বহুদিনের সংস্কার এক অপরিহার্য মুহূর্তে ভুলে দ্বিতীয় ট্যাকসীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তিনি ড্রাইভারের মুখোমুখি হন।

ট্যাকসী খালি ?

খালি, কোথায় যাবেন ?

চলো, বলছি। বলে মওলানা সাহেব নিজের শরীরের কাঁপুনিকে থামাতে না পেরে বিচলিত দ্রুততায় ট্যাকসীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েন, তারপর সেখানকার অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে নিরাপদ বোধ করেন।

কোথায় যাবেন ? মওলানা সাহেবের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে ড্রাইভার কিছুটা অপ্রসন্ন স্বরে আবার জিজ্ঞেস করে।

যেখানে তোমার খুশী, ভাল জিনিস যেখানে পাওয়া যায়। উত্তেজনায় ভদ্রলোকের কথাটা বেশ অসংলগ্ন হয়ে যায়।

এইবার ড্রাইভার মিষ্টিমিষ্টি হাসে, সখ্যতার ধরনে মওলানা সাহেবের দিকে চেয়ে বলেঃ ভাল জিনিস পেতে হলে ভাল টাকা খরচা করতে হবে।

তা করবো, কচি জিনিস পাওয়া যাবে তো।

তালকুরের মত কচি। বেশী রাত থাকলে দু শ' টাকা লাগবে আর আমার বকশিস পঁচিশ টাকা। বলে ড্রাইভার ভদ্রলোকের জবাবের অপেক্ষা না করে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। কারণ, সে জানে ভদ্রলোক এখন তার আওতায়।

মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেন না, কারণ তাঁর মধ্যে ততক্ষণে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। না, খবিস কোন মেয়ের কাছে না যাওয়াই ভাল। আর সবশুদ্ধ বলে কিনা দু শ' পঁচিশ টাকা লাগবে! তাদের ছাত্রাবস্থায়ও শেফালি বকুল যুঁই চামেলির অভাব ছিলো না কিন্তু তাদের দর তো আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত ছিলো। এখন হাঁকে দু শ' টাকা।

ড্রাইভার বেটা তাকে চিনলো নাকি, তাহলেই তো সর্বনাশ। সব ফাঁস হয়ে যাবে। ভক্ত ও মুরীদরা জেনে যাবে একেবারে থ। বেগমের প্রথমে কথাটা একেবারে বিশ্বাসই হবে না, তবে পরে সব বৃত্তান্ত শুনে তার নৈর্বিন্দিন শীতল ভাবতরঙ্গে বৈদ্যুতিক এক ধাক্কা লাগবে।

পাগল হয়েছো, হাজার কচি হলেও এত টাকা খরচ করা যাবে না। তোমার গাড়ি থামাও, তোমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে দি। রফা করবার সুরে মওলানা সাহেব কথাগুলি বলেন।

মালটা একবার দেখে নেন দাদু, তার পরে পছন্দ না হলে ফিরে আসবেন। গেলেই যে বসতে হবে এমন কোন কথা নেই দাদু। লোকটা তার সব কয়টা ময়লা দাঁত বের করে হাসে।

আরে তাঁকে লোকটা 'দাদু' বলছে কেন? হিন্দু নাকি? হলে এক হিসেবে ভালই হয়। ভক্ত বা মুরিদ হবার ভয় থাকে না, জিনিসটাও—যদি শেষ পর্যন্ত তা ঘটে—জানাজানি হবার সম্ভাবনা কমে যাবে। লোকটা যখন বলছে দেখেই আসি না কেন।

বেশী দূর যেতে হয় না। ধানমণ্ডিরই এক রাস্তার একটু ভিতরের দিকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন এক একতালা দালান। নারকেল গাছের

সারিতে বাসাটাকে কেমন যেন ভদ্র শান্ত মনে হয়। ভেতরে একটা কামরায় বাতি জ্বলছে, বাকী কয়টা অন্ধকার। গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখে ড্রাইভার একা বাসার দিকে এগিয়ে যায়ঃ সব কিছু খোলাসা আছে কিনা দেখে আসি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছুটা হাসিমুখে সে ফিরে আসেঃ ঠিক আছে, এবার আপনি যান। বকশিসটা দিয়ে যাবেন।

এখন আর পেছপাও হবার উপায় নেই। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করলেও সব-কিছু জানাজানি হয়ে যেতে পারে। লোক জড়ো হবে, তখন কেলেঙ্কারীর একশেষ। তবে খুব ফিসফিসিয়ে হলেও বকশিসের ব্যাপারে বিশ টাকায় ফয়সালা হয়। ধড়পড়ে বুকে মওলানা সাহেব গেট দিয়ে ঢুকে সামনে দরজার দিকে এগিয়ে যান। পথচারী এখনও নজরে পড়েনি। দেখি ভিতরে ঢুকে কি হয়। মেয়েটা অনাবশ্যক গোলমাল নিশ্চয় বাধাবে না। সজ্জন হলেও তিনি বোঝেন এদের পেশার গরজ মোটে খারাপ।

মেয়েটিই দরজা খুলে দেয় তারপর মওলানা সাহেবকে এক ঝলক দেখে পেছন ঘুরে একটু ভেতরের দিকে গিয়ে ডান দিকের এক ছোট কামরায় ভদ্রলোককে ঢুকতে আহ্বান জানায়। কোন দ্বিধা না করে বলেঃ আপনি ওখানে তৈরী হ'ন, আমি এখুনি আসছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মেয়েটা ফিরে এসে বিনা ভনিতায় বলেঃ এক ঘণ্টার বেশী থাকলে দুশ' টাকা, এক ঘণ্টা হলে দেড়শ'। দরাদরি নেই। নিশ্চয় জেনেই এসেছেন।

মেয়েটাকে দেখে মওলানা সাহেবের ঘোর ধরে যায়। বয়স কুড়ির বেশী হবে না, সাজে উন্নত রুচির পরিচয়। পুরুষদের সঙ্গে হরদম কারবার করে এক পরিপক্ব আত্মনির্ভরতা এসেছে। গ্রাহক বুড়ো দেখেও কোন রকমের প্রতিক্রিয়া হয় না। যেন বয়স এ-ব্যাপারে অতি অপ্রাসঙ্গিক এক ব্যাপার। মওলানা সাহেব নিজেকে বলতে শোনেনঃ এক ঘণ্টা থাকবো।

মেয়েটা তাড়া দেয় না। ধীরে সুস্থে কাপড় ছাড়ে। সাদা সেমিজে দেখা যায় লতাফুলের কাজ। মেয়েটার নাভিটা একটু বেশী ফোলা। পেটে কিছুটা মেদ জমে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। আরও নীচে এক ঝলক চেয়ে মওলানা সাহেব অনেক দিনের অভ্যাসের দরুন চোখ একটু উপরের দিকে নিয়ে যান।

স্তনটা এখনো তেমন ঝুলে পড়ে নি। ঠোঁট বলতে বিশেষ কিছু নেই। তবে চোখ মুখ নাকে সত্যি এখনো কচি ভাব রয়ে গেছে।

ঠিক এ-অবস্থার মুখোমুখি কখনও না হলেও জিনিসটা কি হতে যাচ্ছে তা না জানবার মত অনভিজ্ঞ ভদ্রলোক ঠিক ন'ন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পটুতাও একেবারে উবে যাবার কথা নয়। যদিও গত দশ বছর ধরে দীর্ঘ দিনের ব্যবধান কিছুটা গোলমাল ঘটাতে পারে।

তারপর মওলানা সাহেবের আর কিছু খেয়াল থাকে না। পুরো নগ্ন হয়ে বিছানার এক পাশে বসে তিনি নিজের ব্যগ্র মুখ মেয়েটার ডান স্তনে চেপে ধরেন। বুকের সমস্ত মাংসল পেশী মুখের ভেতর টেনে নিয়ে অসাধারণ এক পুলক অনুভব করেন যতক্ষণ না ঠাস করে মেয়েটা তার বা গালে এক চড় বসিয়ে দেয়ঃ সাবধানে; কামড়াবেন না খবরদার!

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে পূর্ণ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ থেকে বুকটা আলগা করে তার বোঁটায় নরমভাবে চুমা খান। মেয়েটা তখন আর কিছু বলে না। শুধু দুষ্টুমির এক ঝিলিক এনে কিছুটা হাসে।

এবার টুপী পরেন।

আমার টুপী পরা লাগবে না, আমি একদম সাফ।

তাহলে বেরিয়ে যান। সকলেই টুপী পরে আর খালুজান বলেন আমি একেবারে সাফ।

টুপী পরতে হয়।

কিন্তু মওলানা সাহেব তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করেন টুপী পরে তাঁর আগেকার পটুতা পুরোপুরি ফিরে আসে। অবশ্য মেয়ের হয়ে বলতে হয় সে ইচ্ছে করে হেলেদুলে জিনিসটাকে ত্বরান্বিত করতে চায় না। যত সময় যায় ভদ্রলোকের ততই পটুতা বাড়তে থাকে আর মেয়েটা একেবারে চুপ মেরে থাকলেও তার চোখ থেকে বোঝা যায় কিছুটা বিস্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিসটা কিছুটা উপভোগও করছে। নাক কাঁপতে থাকে, শ্বাস জোরে জোরে গরম হাওয়ার মত পড়ে, পাছাটায় তরঙ্গের পর তরঙ্গ স্পর্শ হয়ে ফিরে আসে।

আর কতক্ষণ, এবার নামেন।

তারপরেও পাঁচ মিনিট ভদ্রলোক নামেন না। মেয়েটার বিস্ময়ের ঘোর বাড়িয়ে অবশেষে মস্ত এক শব্দ করে মেয়েটার বুকে ঢলে পড়েন।

মেয়েটা কিছু বলে না, শুধু তাঁর দিকে কৌতূহল ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই শায়িত অবস্থায় তাঁর গলাটা একটু যেন কাৎলা মাছের মত মনে হয়।

মেয়েটা উঠে কামরার সঙ্গে লাগা বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে আবার ফিরে আসে। তারপর সাজগোজ করে চুল আঁচড়ে মওলানা সাহেবকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বলেঃ এই বয়সে এতটা শক্তি আসে কোত্থেকে?

মওলানা সাহেব অপ্রস্তুত বোধ করেন না, উল্টো প্রশ্ন করেনঃ বয়স কত বলুন ত?

মেয়েটা গ্রাহকের মন রাখবার ভঙ্গিতে বলেঃ তা পঁয়তাল্লিশ খানিক হবে বোধ হয়।

সত্তর।

মেয়েটা এবার তার আমোদিত চোখ অবিশ্বাসের প্রলেপ মেখে মওলানা সাহেবের দিকে তুলে ধরে।

তাকত আসলে আরও বেশী। অভ্যাসটা এখন শুধু কমে গেছে। সেই মুহূর্তে কোন রকমের গঞ্জনা বোধ না করে মেয়েটার আমোদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মওলানা সাহেব বললেন।

মওলানা সাহেবের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে মেয়েটা ফিক করে হেসে বলেঃ আবার এসেন খালুজান।

দিনের বেলা এলে হয় না? মওলানা সাহেব অভাবনীয় এক প্রশ্ন করেন।

হয়, তবে দুপুর একটা থেকে দু'টার মধ্যে। শুক্কুর আর রোববার ছাড়া। পঞ্চাশ টাকা বেশী লাগবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে মাওলানা সাহেব আশ্চর্য হাল্কা বোধ করেন। অনেকদিনের গ্লানি, অনেকদিনের শ্রান্তি যেন ধুয়ে মুছে গেছে। মেয়েটার প্রতি অনির্দেশ্য এক মমতা জাগে। নিজেকে কিভাবে দিলো বয়সের সব ব্যবধান তুচ্ছ করে।

পরদিন ভোরে বেগমের বিছানার পাশে বসবার সময় কিছু সাধারণ কথাবার্তার পর বেগম হঠাৎ জিজ্ঞেস করেনঃ কালকে রাতে নিউমার্কেট থেকে ফিরতে যে এত দেরী হোল।

ভেতরটা একটু চমকালেও বাইরে যাতে মুখের ভাব খুব বেশী না বদলায় সে-চেষ্টা করে মওলানা সাহেব জবাব দেন ঃ রহিম মৌলভীর কাছে গিয়েছিলাম। বহুদিন দেখা হয় নি।

আসলে বেগম ও প্রশ্নটা করতেন না যদি একসঙ্গে খেতে বসবার সময় মওলানা সাহেবের চুলটা একটু অবিন্যস্ত, চোখটা একটু ত্রস্ত না দেখতেন আর স্বামীর শরীর থেকে একটা অনভ্যস্ত সুবাস মৃদুভাবে না বেরিয়ে আসতো। তিনি খান্দানী ঘরের মেয়ে হলেও জানেন প্রত্যেক পুরুষই কম বেশী ফস্টিনস্টি করবেই। তবে এই বয়সে তাঁর স্বামী ও পথ মাড়াবেন সে সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে কখনও জাগে নি। নিজে অবশ্য তিনি এখন বলতে গেলে কিছুই দিতে পারেন না তবুও অনেকদিনের স্ত্রী হিসেবে তিনি জিনিসটা অনুমান করে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে যান এবং সহসা তাঁর মনে হয় স্বামী তাঁদের জন্য কোন দুর্বিপাক ডেকে আনবেন।

মাঝখানে একদিন বাদ দিয়ে মাওলানা সাহেব দুপুর বেলায় 'ভাগ্নীর' দরজায় ধর্না দিতে গিয়ে দেখেন দরজার পেছনে এক পঁচিশ-তিরিশ বছরের যুবকের হৃষ্টপুষ্ট মুখ। বিস্ময়ের ধাক্কাটা নিপুণভাবে সামলিয়ে নিয়ে বলেন ঃ উনি বুঝি ব্যস্ত।

মওলানা সাহেবকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত অবলোকন করে যুবকটা বলে ঃ খুবই ব্যস্ত। ও কে।

বাবা, স্বামী নাকি। মওলানা সাহেব আর কিছু না বলে সতর্কতার সঙ্গে পিছপাও হন।

কিন্তু ঘোর গভীরতর হওয়ার দরুন যেন এই অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ না করে কিছুতেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না, মওলানা সাহেব আবার দুপুর বেলা দেখে পরের বার সফলকাম হন।

সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললে মেয়েটা মুখে কুণ্ঠার কিছু ভাব ফুটিয়ে বলে ঃ স্বামী না ছাই। হারামজাদাটা আমাকে বিছানায় বেঁধে রেখে কি মজাটাই না লুটলো। আপনি ঢুকে পড়লেন না কেন, তাহলে তো এ দুর্ভোগ আমাকে পোহাতে হোত না।

সেদিনকার প্রচেষ্টাও খুব দীর্ঘস্থায়ী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। মাহেন্দ্র-ক্ষণে মওলানা নিজেকে বলতে শোনেন ঃ আপনার দেহটা এবার থেকে সম্পূর্ণ আমার।

মেয়েটা নতুনভাবে বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চায়, না ঠিক পাগল মনে হয় নাঃ আমার দেহটা আমারই। আর কারুর নয়।

আচ্ছা, আপনার নাম কি?

লতিফা। আর আপনার?

বেশ নাম। শুধু আমার নাম কেন সব কথাই একদিন বলবো।

মেয়েটাকে দু'শ টাকা দিতে গেলে সে কিন্তু পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দেয়।

পরে আরও অনেকবার সংযোগ হয়। টাকার পরিমাণ ঠিকই থাকে তবে হাসি-তামাসা বাড়তে থাকে। মেয়েটাও যেন কিসের একটা অবলম্বন হাতড়ে বেড়ায়। একদিন সফল ক্রিয়া শেষে আমোদে উচ্ছলিত হয়ে ভদ্রলোক মেয়েটার নগ্ন বুকে দরাজভাবে পাউডার ছিতরিয়ে দেন, মেয়েটাও তখন তাঁর হাত থেকে পাউডারের কৌটাটা কেড়ে তাঁর মাথায় অনেক পাউডার এক সংঙ্গে ঢেলে দেয়।

ভদ্রলোক বালকের মত খুশিতে হেসে ওঠেন।

শেষের ঘটনাটা কিন্তু পুরোপুরি আবর্তিত হতে পারে না।

মেয়েটা টুপী পরতে বলে না। বেজায় খুশী ভদ্রলোক। মিলনটা আরও অন্তরঙ্গ আরও পিচ্ছিল হয়।

সেই মুহূর্ত এলে মেয়েটার ঠোঁটে প্রচণ্ডভাবে চুমো খেয়ে মওলানা সাহেব কি যেন গভীরভাবে হৃদয়ের সমস্ত আর্তি দিয়ে খুঁজতে থাকেন, তারপর ফিসফিসিয়ে বলেনঃ আমার ছোট্ট গোপন বউ। এইত আমার বাড়ী, এর পরে এই পথটা ছেড়ে দিও। বলে আর সব বারের মত এবারও মেয়েটার বুকে মুখ রেখে থুপড়ে পড়েন। মেয়েটা প্রতিবাদ করে না, তবে অনেকক্ষণ পরেও আর কোন সাড়া না পেয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে কিন্তু কিছুটা মমতার সঙ্গে বলেঃ আর কত রঙ্গ করবে খালুজান। এবার নেমে এসো। পথ ছাড়তে বলছো, দিব ছেড়ে। খালুজান কথা বলেন না, মুখটা শুধু তার স্তনচ্যুত হয়ে একদিকে ঢলে পড়ে।

পরের দিন ঢাকার প্রত্যেক দৈনিকে খবরটা বেরোয়ঃ মওলানা আবদুস শুকুর সাহেব গতদিন দ্বিপ্রহরে নিজের কায়েৎতুলীর বাসভবনে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। গত কয়েক

সপ্তাহ ধরিয়াই তাঁহাকে একটু পরিশ্রান্ত লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গতকাল জোহরের নামাজের পরে এবাদৎ করিবার সময় মওলানা সাহেবের শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু ডাক্তার আসিবার আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি এন্তেকাল করেন।

মওলানা সাহেব মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র, নাতি-নাতনী এবং সারা বাংলাদেশে তাঁর অগণিত ভক্ত ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। এমন ধর্মভীরু ও নিষ্কাম ব্যক্তি আজকাল আর সচরাচর দেখা যায় না।

পাবনা-রাজশাহী এক্সপ্রেস

এক্সপ্রেসটা রওয়ানা হওয়ার জন্য উসখুস করছে তবে ড্রাইভারের পায়তারা এখনও শেষ হয় নি। গাড়িটা দমে আছে, কিন্তু আরও আরোহীর অপেক্ষায় ড্রাইভার একটু ব্রেক ছেড়ে আবার কষছে। তাতে উঠতি আরোহীরা ছাড়া—থামার সংঘাতে অনেকটা অধৈর্য হয়ে উঠছে অথচ হয়ত এখুনি ছাড়বে সে আশায় বিরক্তিটা ঠিক প্রকাশ করা সমীচীন মনে করছে না। বাসের যাত্রী হয়ে বাসের ড্রাইভারকে নারাজ করা খুব বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়।

এক্সপ্রেসটা বেশ প্রাচীন যোদ্ধা। অনেক অভিযানের ক্ষত নির্বিকারে গায়ে মেখে আছে। ড্রাইভারের সীটের সামনে লাল কাল সবুজ অনেক তার বেগাল হয়ে ঝুলছে। কোন আবরণ নেই যাতে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা হয়। ছাদে পেটানো টিনের অংশ বিশেষের দু'একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে যাওয়াতে ফাঁক অবশ্য খুব মারাত্মক হয় নি তবে বাতাসের তোড় বাড়লেই তা বেশ কিছুটা শব্দ করে বাজতে থাকে আর টিনেল এক সঙ্গীত পরিবেশন করে। 'ফি আমানুল্লাহ্', 'খোদা হাফেজ' বা 'মারজিহা ও মারশাহা' জাতীয় কোন প্রার্থনা নেই, তবে চালকের সীটের সামনে ডান দিকের উপরের কোণে এক পুণ্যাত্মার মাজারের বাঁধানো ছবি। চালক সাহেব অসর্তক হলে তাই আল্লাহ্ ছাড়া গতি নেই। প্রায় মিনিট দশ পায়তারা করে ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত গাড়ি ছাড়া মনস্থ করল। দুই মিনিট পরে বাজারের উত্তর দিকের পুল পেরিয়ে এক সৌখীন রেস্তোরাঁর কাছে আবার থেমে পড়লো। দেখা গেলো গুম্ফবিলাসী এক সতেজ যুবক। পরণে সাদা-বাদামী রঙের দামী এক হাওয়াই শার্ট ও জাপানী টেট্রনের

প্যাণ্ট, স্কুটারে চালিত হয়ে অপেক্ষমাণ বাসের কাছে নেমে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে পড়লো।

ড্রাইভার দেখা গেল এখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করছে। বসবার জায়গা নেই দেখে যুবকটা ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে কিন্তু প্রসন্ন মেজাজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না ডান দিকের এক মাঝারি সীট থেকে এক তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জায়গা যুবককে ছেড়ে দিল। তারপরে তরুণটা দরজার কাছে কণ্ডাক্টারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

—টান দেন।

—এক্সপ্রেস, কিন্তু কি কুটকুট করে চলছে।

দংশিত ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার জোর করে ব্রেক কষলো।

—সাবধান, এই সাইকেলওয়ালা সাবধান।

যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত অথচ শেষ পর্যন্ত ঘটল না তারই স্বস্তিতে ও আনন্দে আরোহীদের সঙ্গে ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ও তার সহকর্মী সকলকেই খুব প্রফুল্ল দেখাল। কণ্ডাক্টার চলন্ত বাসের দরজা খুলে পাশে ঘুরে অনেকক্ষণ সেই সাইকেলওয়ালার দিকে চেয়ে রইল যতক্ষণ না পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হল যে সে সত্যিই কোন আঘাত পায় নি।

নারকেল গাছ খেজুর গাছ কৃষ্ণচূড়া ও ফলনে আনত আমগাছ বাতাসে নানা বিন্যাসে আন্দোলিত হয়ে যেন 'বাঙলাদেশ' 'বাঙলাদেশ' ধ্বনি তুলছে। এক কিশোরী নিজের আনত শরীরে আসন্ন নারীত্বের ফিসফিসানি বহন করে, একটা গরুকে ক্ষেতের ধারে ঘাসের আওতায় খুঁটিতে বাঁধছে। চলন্ত বাসের দিকে একবার চোখ তুলেও তাকাল না। আধা মাটি ও আধা কঞ্চির দেয়ালের এক বাসার তকতকে মেঝে নীল শাড়ী-পরা এক যুবতী গিন্নি তার দামাল শিশুকে স্তন দিচ্ছে। পুরন্ত ঝাঁপির ভারে ঈষৎ দুমড়ানো এক প্রৌঢ়া নিজের আর কি হবে স্তনকে ঢাকবার কোন চেষ্টাই করছে না।

ড্রাইভারের ঠিক বিপরীত বসবার জায়গায় তিনজন তরুণী। একজন পরিষ্কারভাবে বিবাহিতা। কোলে ছেলে, ফর্সা কপালে লাল টিপ, পরণে তিন রঙা এক শাড়ী। সাদা কাল লাল। বগলের কোণে লাল স্যাটিনের ব্লাউজটা বেশ দ্রষ্টব্য ভাবে ভিজে গেছে।

সুডৌল মুখে নাকের মাঝখানটা একটু অমসৃণ তবে সারা শরীরে যৌবনের ঢল নেমেছে। পাবনায় বাসে অপেক্ষমাণ থাকবার সময় স্বামীর কাছে শিশুকে বেশ গর্বিতা হয়ে প্রদর্শন করছিল। তখন তার মুখের হাসিটা ছিল পরিবেশ-ভোলা।

কোনায় বসা তরুণীটি শ্যামাঙ্গিনী এবং তার গায়ের চামড়ায় কমনীয়তার কিছুটা অভাব। তবে চোখ দু'টিতে বেশ পরিপাটি এক রহস্যের ভাব উচ্চারিত। যেন সে শেষ মুহূর্তের বিজয়িনী। তরুণীটি ক্রীড়ারত শিশুর দিকে সস্নেহ আমাদের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তবে মায়ের কাছ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। শিশুর মা মাঝে মাঝে অন্যত্র বসা তার দেওরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে নিজের এক মানসিক ব্যাস সৃষ্টি করে।

—কুথায় যাবেন, কুথায় নামবেন। ও বড় ভাই ও চাচা।

বাঁ দিকের দুই সীটের আসনে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের এক বলবান মরদ ও এক ডাগডাক তরুণ দিব্যি ঘুমোচ্ছিল। মরদের মাথা সামনের সীটের হাতলে রাখা। বাসের দোলানিতেও স্থানচ্যুত হচ্ছে না বা আঘাত পাচ্ছে না। তবে তরুণটাই ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে। ঝিমানো অবস্থায় তার মাথাটা ঠক্ করে একবার পেছনের সীটের হাতলে পড়ছে আর একবার ঠাস্ করে সামনের সীটের হাতলে তার ভ্রূ দু'টা ঘর্ষিত হচ্ছে। অথচ মাঝে মাঝে তার চোখ খুললে সে নির্বিকার ভাবে সামনের দিকে একটু চেয়ে নেয় তারপর আবার ঝিমুতে থাকে।

দয়াপরবশ হয়ে কণ্ডাকটার তখন সে সময়ে আর তাদেরকে ভাড়ার জন্য উত্যক্ত করল না। ততক্ষণ বাইরের পরিমণ্ডলটা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্ষেতে মাঠে মেয়েমানুষদের আর তেমন দেখা যায় না। পুরুষরাই ক্ষেত নড়ছে। ইরি ধানের তদারক করছে, আর নাগজন ফাঁকে ফাঁকে হুক্কায় একটা টান দিচ্ছে। এমন কি ঢেউ-খেলানো নতুন টিনের মওশনদার বাসার সামনের পতিত জমিতে হাল দিচ্ছে। দেশী-বিদেশী ওষুধের দোকানে ও চায়ের স্টলে তাদেরই আধিপত্য। এক ময়রার দোকানে হাতে নোলাপরা এক প্রৌঢ় বৈরাগী কিস্তী-টুপী পরা এক বৃদ্ধ খদ্দেরকে কিছু ধর্মকথা শোনাচ্ছে।

বড়াইগ্রাম অনির্ধারিত ভাবে বাসটা থামল। জায়গাটায় বর্দ্ধিষ্ণু এক গঞ্জের ভাব। পেট্রোল স্টেশান আছে আর কৃষি উন্নয়ন সংস্থা আর পরিবার পরিকল্পনার রঙীন বিজ্ঞাপন।

—টিকিট দেখান বড় ভাই।

—পাছে আছে।

—একটু দেখান না বড় ভাই।

—দু'হাতে বুঝা। বাসে টিকিট দেখাইছি ত।

—এই দেখেন চাচা। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এর জন্যই আমাদের খিটিমিটি হয়।

বলে কি এক্সপ্রেস কুটকুট করে চলে কিন্তু টিকিটটা না করে কেমন ভাবে নেমে গেল।

—হটেন, একটু হটেন।

এক প্রৌঢ়া আরোহিণী ভীড় ঠেলে বাসের ভেতর নিজের একটু জায়গা করে নিতে চান। চাউনিতে অভিজ্ঞা স্কুল মাস্টারনীর আত্মবিশ্বাস। তাঁকে আর রুখবে কে। নূতন আরোহীদের মধ্যে এক বুড়ো দম্পতিও।

কণ্ডাকটার বলে ঃ চাপেন, ভিতরে চাপেন।

পথে দাঁড়ানো এক যুবককে সেই রহস্য-মথিত চোখের অধিকারিণী সম্বোধন করে বলছে, কণ্ঠস্বরে এক জটিল দুর্ভেদ্য রাগিণী ঃ তুমি এখানে অপেক্ষা করবে আশা করি নি। এসছ ত। আমি বাসাতেই থাকব।

যুবতী মাতার দৃষ্টিটাও তখন কুতূহলী হয়ে ওঠে আর কিছুটা নৈকট্যের চাউনিতে সে শ্যামাঙ্গিনীর দিকে তাকায়। সারা বাসটা মুহূর্তের রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরে যায়।

বাস ছেড়ে দেয়।

—আপনি রাজশাহী যাচ্ছেন? নূতন ওঠা বৃদ্ধ আরোহী পেছনের সীটে বসা এক স্মিত-বদন যুবককে জিজ্ঞেস করেন।

—জ্বী।

—ওখানেই বাড়ী?

—জ্বী হাঁ।

—কোন পাড়ায়?

—মালোপাড়ায়।

—আপনার নাম?

—মহিবুল হক।

—পিতার নাম?

—মাহমুদুল হক।

—তাই বলেন। এক সময় এক সঙ্গে ওকালতি করেছি। বেশ সার্প মাইণ্ড। দু'একটা ক্রিমিনাল কেসে সীতাংশু ব্যানার্জীকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিতেন। খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আমি পঁয়তাল্লিশ বছর প্র্যাকটিস করে এখন অবসর গ্রহণ করেছি। অরিজিনালি মুর্শিদাবাদ থেকে। সালারে আদি বাড়ী। সালারে বেশ কয়েকজন এ্যরিস্টোক্র্যাটিক মুসলিম ফ্যামিলি ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে রাজশাহীতে আছি। বড় ছেলেও এডভোকেট। এখন ঢাকায় সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করে। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বড়াইগ্রামের এক খুব রেসপেকটেবল ফ্যামিলিতে। জামাই কণ্ট্রাকটার। মেয়েটার বয়স কচি বলে তাকে প্রায়ই দেখতে যাই। ওখান থেকেই ফিরছি।

—ঢাকাতে বড় ছেলের কাছে যান না?

জবাবটা দেন উকিল সাহেবের স্ত্রী: আমরা তেমন যাই না। ওরাই আসে। উনার আবার একটা এ্যকসিডেণ্টের মত হয়েছিল ত।

—আর বলবেন না। একদিন রাজশাহীতে কাচারীর কাছে রাস্তা পার হচ্ছিলাম। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সামনের দিক থেকে এক রিক্সা এসে ধাক্কা দিল। কমজোর চোখ রিক্সাওয়ালার কাণ্ডতে তক্ষুণি পড়ে গিয়ে পা মচকাল। বাসায় যখন আমায় আনা হল আমাকে দেখে আমার ওয়াইফ একেবারে সেন্স্‌লেস। হার পাল্স কেম ডাউন টু থার্টিফোর। কথা শেষ করে ভদ্রলোক পরম মমতায় নিজের হাতে স্ত্রীর কাঁধকে বেষ্টন করে রাখলেন। আর স্বামীকে রোদ থেকে বাঁচাবার জন্য ভদ্রমহিলা, সাদা অর্গাণ্ডীর এক নীল পেড়ে শাড়ী পরনে, হলুদ রঙের এক তোয়ালা দিয়ে তাঁর কেশ বিরল টেকো মাথা ঢেকে দিলেন। বাইরে তখন আম-বনের প্রাধান্য আর এ্যবড়া থ্যবড়া মাটি। হঠাৎ এক দীঘির ঝলক নদীর পরিপুষ্টি নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গরুর পালের মধ্যে দু'একটা ছাগল। কান্তিহীনা কয়েকজন অনির্দেশ্য ধরনের নারী।

আর ভেতরে শ্যামাঙ্গিনী এক কোণে বসে নিজের মনের ঘোরের সঙ্গে মোকাবিলা করছে। হঠাৎ কি যেন রত্ন পেয়ে গেছে সে।

বাসের ভেতরটা, প্রায় সব জানলা খোলা থাকলেও ঘাম ও বদ হজমের গন্ধে এখন বেশ-কিছুটা আক্রান্ত। অথচ কোন যাত্রীকেই

তেমন গলহিজ দেখাচ্ছে না। তবে আর্দ্র আবহাওয়া ও ভেজাল খাদ্যের সংমিশ্রণ ভব্যতার তেমন ধার ধারে না।

—আপনার বাড়ী কোথায়? বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার ঘুরে পেছনের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করেন।

—বুললাম যে। মালোপাড়া।

—ওঃ।

নাটোরে যুবতী মাতা দেওরের সঙ্গে নেমে গেল। বাইরে তার সমস্ত শরীরে সূর্যের আলো পুরো পড়াতে তার গলাজুড়ে এক চক্রের মত দাগ ও নাকের মাঝখানের থ্যাবড়ানিটা নির্দয়ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখের নীচেও ক্লান্তির রেখা। ঠিক 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বলে তার মুখাবয়ব আর মনে হল না বা 'পাখীর নীড়ের মত' তার চোখ। তবুও সারা এক্সপ্রেসকে বেশ কিছুটা রস ও শোভা থেকে বঞ্চিত করে একই রিক্সায় দেওরের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে বসে যুবতী-মাতা তার নিজস্ব মনজিলে চলে গেল।

উঠল নবীন এক যুবা সঙ্গে এক বন্ধুকে নিয়ে। পরনে ছাপ-মারা ও বিজ্ঞাপন-নন্দিত এক সাদা-কাল হাওয়াই শার্ট। ভিকি লেদার ড্রেসিং দ্য জেনস্ মিলার মডেল বডিস। যেখানে তারা বসল শ্যামাঙ্গিনীকে সেখান থেকে ভব্যতার খোলস বজায় রেখেই অবলোকন করা যায়।

বাস ছাড়তেই তাদের ফিসফিসানি শুরু হয়ে যায়।

নবীন যুবা তার বক্তব্য রাখল ঃ ঈশ্বরদি গিয়েছিলাম। হ্যাড এ নাইস্ টাইম। মেয়েটি বলে তার চৌদ্দ বছর বয়স। তা টোয়েনটির বেশী হবে না। বলে কি তার পানি পড়তে সময় লাগে। কোন কোন মাতাল ঘণ্টাখানেক থেকে ভালভাবে লুজক লাগিয়ে যায়। তখন নাকি মেয়েটার খদ্দেরকে চিমটি কাটতে দাঁত দিয়ে কামড় দিতে কুস্তী করে চিৎপাত করে দিতে ইচ্ছে করে। আমি কিন্তু দশ মিনিটেই মেয়েটার পানি নামিয়ে দিয়েছিলাম। ড্যাম চিপ। মাত্র পনেরো টাকা। দু'টা দশ টাকার নোট দিবার পর মেয়েটা হেসে বলে বাকিটা আর ফেরত দিবে না। তাহলে 'আর আসব না' বলে শাসানোতে মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে 'না এলে আমার কি, বয়স আর খাড়া বুক যতদিন আছে খদ্দরের কি আর অভাব হবে।' কিন্তু ছোট্ট টিনের

বাক্স খুলে দশ টাকার এই দুটো নোট রেখে পাঁচ টাকার এক নোট বের করে দেয়। তারপর আঁচলের কোণে চাবিটা লাগিয়ে টিনের বাক্সের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন সেটাই তার সমস্ত সংসার।

ঘুমন্ত দুই যাত্রীর মধ্যে বড়টা ততক্ষণে জেগে উঠেছে।

—কুথায় যাবেন চাচা?

—রাজশাহী। পাবনাতে সারা রাত মশার কামড়ে ঘুমতে পারি নি। শাহজাদপুর ছেলের বিয়ে সেরে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। মিস্ত্রীর কাজ করি। ছেলেও জোগান দেয়। মতিহারে মেয়েদের জন্য বড় এক খেলবার জায়গা তৈরী হবে। ছয় মাস আর কাজের অভাব নেই। তাই ছেলের বিয়ে করায় আনলাম। ছেলে ত চার রাত ঘমায় নি তাই এখন বেহুশের মত ঘুমুচ্ছে। রাজশাহীর ভাড়া কত ভাই।

—সাড়ে সাত টাকা।

—তাই দিবোনে। এখন চোখ আর তেমন ভারী লাগে না। ঘুমের যা ব্যাঘাত হইছিল না। ছেলেটার জন্যই বেশী মায়া হয়। তেরো বছরের তাজা বউ ছেড়ে চলি আইসতে হল।

বাইরে তখন বেশ কয়েকটা ইটের পাঁজরা দেখা যাছে। চোঙ্গা থেকে ধোঁয়া উঠছে আর স্তপাকারে নুতন তৈরী ইট আর মাটির ঢেলা। তৈরী করবার শাহী আয়োজন। অতর্কিতে এক নিটোল পানির বিস্তার আর গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে তিনটা মহিষের পূর্ণ অবগাহন। কিছু দূরে কদমাক্ত ডোবায় শুয়োরের রোমন্থন। আর ভেতরের দিকে এক ছোট্ট পুকুরে সাদা বাদামী হাঁসের নিশ্চিন্ত পরিভ্রমণ। রাস্তার ধারে এক অন্ধ মেয়ে তার কনিষ্ঠা এক সহচরীর সমস্ত মুখে আঙ্গুল বুলিয়ে পুরন্ত মমতায় তাকে আদর করছে।

—দিস্ ইজ রুরাল বেঙ্গল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ এক রায় দেওয়া দরকার মনে করেন।

ড্রাইভার ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক মাতব্বর গোছের লোককে সমীহের সঙ্গে সম্বোধন করে ঃ একটু খেয়াল করে কয়ে দিবেন। আর একটু হলেই চাকার তলায় পইড়তো। সাবধান করে দিবেন। চাকার তলায় পইড়লে কি আর রক্ষে আছে। আমাদের জান নিয়ে টানাটানি।

—লোকটার সামাজিক সচেতনতা আছে। ধোপ-দুরস্ত হাওয়াই শার্ট-পরা রমণ-বিশারদ নবীন যুবা শ্যামাঙ্গিনীর দিকে সতর্ক পটুতায় তাকিয়ে বলে।

শ্যামাঙ্গিনীর ঠোঁটের কোণে এক হাসির ঝিলিক খেলে যায় তবে চোখে যেন দীঘির গাঢ়তা। এক্সপ্রেসটা ঝনঝনিয়ে এগিয়ে চলেছে। পথ ফুরাতে আর দেরী নেই। তারপরে নূতন এক কাহিনী'